রূপমঞ্জরী

নারায়ণ সান্যাল

২

রূপমঞ্জরী

২য় খণ্ড

নারায়ণ সান্যাল

RUPAMANJARI. Part II
Rs. 80/-
NARAYAN SANYAL

Published by :
Sudhangshu Sekhar Dey
Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street
Calcutta—700 073

রচনাকাল : 1992-1996

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা, মাঘ ১৪০৪
জানুয়ারি 1998

গ্রন্থক্রমিক : 115

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাব্‌লিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা—700 073

অলঙ্করণ : সুধীর মৈত্র, লেখক

প্রচ্ছদ : গৌতম দাশগুপ্ত, আলোকচিত্র : বিপুল বসু

ISBN-81-7612-268-8

শব্দসজ্জা :
লেজার ইম্প্রেশন্‌স্‌, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা —700 004

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা—700 073

প্রুফ নিরীক্ষা : অনুপম ঘোষ

© সবিতা সান্যাল

দাম : ৮০ টাকা

pathagar.net

উৎসর্গ

করুণাসাগর
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
শ্রীচরণারবিন্দেষু,

নারীজাতিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা করতে তুমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছিলে—তাদের শিক্ষিত করতে, স্বনির্ভর হতে, বৈধব্যযোগের অপরিসীম সামাজিক নির্যাতন থেকে তাদের মুক্তি দিতে। প্রতিদানে সমাজ তোমাকে নানাভাবে অসম্মান করেছে। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করেছে।

শেষ জীবনে তুমি সাঁওতাল-পরগণার কার্মাটারে অন্ত্যেবাসীর একান্তচারী জীবন বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলে।

একশ বছর স্বর্গবাসের পর তুমি কি আমাদের ক্ষমা করতে পেরেছ ?

তাহলে

ধূলিধূসরিত বিদ্যাসাগরী চটির প্রান্তে এই অর্ঘ্যটি সমর্পণের সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না।

শ্রদ্ধাবিনম্র

pathagar.net

নারায়ণ সান্যালের প্রকাশিত গ্রন্থ (পুজা, 1997 পর্যন্ত)

[প্রকাশের ক্রম অনুসারে সজ্জিত। A-R গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূচক। নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে : (A) শিশু ও কিশোর সাহিত্য; (B) সদ্যসাক্ষর; (C) না-মানুষ আশ্রয়ী; (D) বিজ্ঞান-আশ্রয়ী; (E) চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য; (F) ভ্রমণ; (G) স্মৃতিচারণধর্মী (H) মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী; (I) প্রয়োগ বিজ্ঞান; (J) গোয়েন্দা; (K) গবেষণাধর্মী; (L) উদ্বাস্তু-সমস্যা সংক্রান্ত; (M) ইতিহাস-আশ্রয়ী; (N) জীবনী-আশ্রয়ী; (O) দেবদাসী-সম্পৃক্ত; (P) নাটক; (Q) সামাজিক উপন্যাস; (R) প্রবন্ধ/কাহিনী সংকলন * তারকা-চিহ্নের নির্দেশ—পাওয়া যায় না; লেখকের ইচ্ছানুসারে পুনর্মুদ্রিত হবে না। ψ চিহ্নিত বই যুক্তাক্ষরবর্জিত, নিতান্ত শিশুদের জন্য।]

1. মুশকিল আসান, P
2. বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প, L
3. বল্মীক, L
4. গ্রাম্যবস্তু, B
5. পরিকল্পিত পরিবার, B
6. বাস্তুবিজ্ঞান, I
7. ব্রাত্য, Q
8. দশেমিলি, B
9. মনাসী, H, Q
10. অরণ্যদণ্ডক, L/Q
11. দণ্ডকশবরী, F/Q
12. Handbook on Estimating, I
13. অলকনন্দা, Q
14. মহাকালের মন্দির, M/Q
15. নীলিমায় নীল, Q
16. পথের মহাপ্রস্থান, F/K
17. সত্যকাম, Q
18. অন্তর্লীনা, H/Q
19. অজন্তা অপরূপা, E/F/K
20. তাজের স্বপ্ন, Q/H
21. নাগচম্পা, J/Q
22. নেতাজী রহস্য সন্ধানে, K/F
23. আমি নেতাজীকে দেখেছি, N
24. পাষণ্ড পণ্ডিত, Q
25. কালোকালো, A
26. শার্লক হোবো, A
27. জাপান থেকে ফিরে, F/M/K
28. আবার যদি ইচ্ছা কর, Q/N
29. কারুতীর্থ কলিঙ্গ, E
30. গজমুক্তা, C/Q/K
31. আমি রাসবিহারীকে দেখেছি, N/Q
32. বিশ্বাসঘাতক, D/Q/K
33. হে হংসবলাকা, D/K
34. সোনার কাঁটা, J
35. মাছের কাঁটা, J
36. অশ্লীলতার দায়ে, Q/K
37. লালত্রিকোণ, Q/K
38. আজি হতে শত বর্ষ পরে, D
39. অবাক পৃথিবী, D/Q
40. নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা, D/Q
41. পঞ্চাশোর্ধ্বে, G/R
42. পথের কাঁটা, J
43. চীন-ভারত লণ্ডমার্চ, K/M
44. হংসেশ্বরী, M/N/Q
45. পারাবোলা স্যার, Q
46. ঘড়ির কাঁটা, J
47. কূলের কাঁটা, Q
48. আনন্দ-স্বপ্নদর্শিণী, M/N/Q
49. লিস্ডওয়াল, N/M/Q
50. ডিম-তিমিঙ্গিল, C/K/Q
51. কিশোর অমনিবাস, A
52. ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন, E/K
53. গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা, I
54. গ্রামের বাড়ি, I
55. অরিগামি, A
56. লা-জবাব দেহলী, E/K

pathagar.net

57. না-মানুষের পাঁচালী, C/A
58. সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম, O/K
59. সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয়, O/Q
60. রাস্কেল, A/C
61. Immortal Ajanta, E/F/K
*62. Erotica in Indian Temples E/K
63. রোদ্যাঁ, N/M/E/K
64. ষাট-একষট্টি, G
65. মিলনান্তক, Q
66. নাক উঁচু, A
67. ভিজনেল্যান্ড, A/F
68. উলের কাঁটা, J
69. লাডলিবেগম, M/N/Q
70. পূরবৈয়াঁ, F/N/Q
71. প্রবঞ্চক, F/N/Q
72. অ-আ-ক-খ্নের কাঁটা, J
73. পয়োমুখম, K/F
74. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'-এক, C/K/D/A
75. অচ্ছেদ্যবন্ধন, Q
76. না-মানুষের কাহিনী, A/C
77. সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা, J
78. ছয়তানের ছাওয়াল, Q
ψ 79. হাতি আর হাতি, A
80. আবার সে এসেছে ফিরিয়া, G/K
81. ছোঁবল, Q
82. রূপমঞ্জরী—এক, Q/N/K
83. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'—দুই, C/K/D/A
84. কাঁটায়-কাঁটায়, এক, J
85. কাঁটায় কাঁটায়, দুই, J
ψ 86. গাছ-মা, A
87. মান মানে কচু, Q
88. আম্রপালী, Q
89. স্বর্গীয় নরকের দ্বার, R/K/E
90. লেঅনার্দোর নোটবই, R/K/E
91. এমনটা তো হয়েই থাকে, Q/M
92. রিস্তেদারের কাঁটা, J
93. কৌতূহলী কনের কাঁটা, J
94. যাদু এ তো বড় রঙ্গের কাঁটা, J
95. অভি-নী-অল-এর কাঁটা, J
96. ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা, J
97. দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা, J
98. যমদুয়ারে পাড়ল কাঁটা, J
99. বাস্তুশিল্প, I
100. এক, দুই.. তিন..., P/K
101. রানী হওয়া, Q
102. হিন্দু না ওরা মুসলিম, Q/K
103. কাঁটায়-কাঁটায়-তিন, J
104. বিষের কাঁটা, J
105. স্বনির্বাচিত সেরা গল্প, R
106. খোলামনে, R
107. 'বুলডোজার লেডি', K/R/N/Q
108. খাণ্ডবদাহন, G/K
109. দেবদাসী সুতনুকা, O
ψ110. সবাই ভাল, A
ψ111. কড়ুরয় ও খুকুমা A
112.

pathagar.net

কৈফিয়ৎ

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি : অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। এই দ্বিতীয়খণ্ডটা প্রকাশ করতে প্রচুর দেরি হয়ে গেল। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল নব্বই সালে— আটবছর আগে। প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ-ক্রমিক সংখ্যা ছিল বিরাশি; তারপর খানত্রিশেক বই ছাপা হয়ে গেছে — রূপমঞ্জরীর দ্বিতীয় খণ্ডটা প্রকাশিত হয়নি। অমার্জনীয় অপরাধ। তবে একথাও বলব, এজন্য শাস্তিও বড় কম পাইনি। পথেঘাটে যত্রতত্র এ জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। প্রথম ধমক খেয়েছিলাম পুত্রের কাছে। বইটা তাকে 'বুকপোস্টে' পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পড়ে সে জবাবে লিখেছিল, "তুমি তো আচ্ছা মানুষ! পাঠকের কাছ থেকে নগদ আশিটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে অম্লানবদনে বলেছ: পড়ুন, পড়ুন! অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন। আর গল্পটা? সেটা পরে বলব!— ডিউ-পার্ট-এ।"

ইদানীং পথে-ঘাটে কত লোক যে তাগাদা দিয়েছে তার আর লেখাজোখা নেই। আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি, 'দেখুন, হটি বা হট্ট বিদ্যালঙ্কার, অর্থাৎ বাস্তব রূপমঞ্জরীর জীবনে কী ঘটেছিল সেটুকু তো আমি প্রথমখণ্ডেই জানিয়ে দিয়েছি'। এ মেয়েটি তো আমার আত্মজা—

শ্রোতা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ধমকে উঠেছে, সেই অধিকারে গল্পটা আপনি শেষ করবেন না? এটা কেমন যুক্তি?

কেউ জানতে চেয়েছেন : 'আমাদের জিজ্ঞাস্য রূপমঞ্জরী কোন সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন? 'রূপমতী'র মতো আত্মহননের পথ, না কি সত্যবতীর মতো স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ধর্ষিতা হওয়া?

কেউ বললেন, ব্যাসকাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী হটী বিদ্যালঙ্কারকে হঠাৎ ও-কথা বললেন কেন?

'জীবাত্মাকে বন্দী করে রাখতে নেই— মুক্ত নীলাকাশের দিকে, পরমাত্মার দিকে মিলিত হবার সাধনা তার। ক্যা রে বেটি? কুছ সমঝি?'

হটীর অধিকারে সেই দুর্লভ বিপরীতবর্ত শঙ্খটাই বা এল যেমন করে? কী তার অর্থ, তা তো এখনো অনুক্ত?

আবার একজন পাঠক প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রথম খণ্ডের কৈফিয়তে আপনি লিখেছিলেন, "ঐতিহাসিক চরিত্রের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি তা গ্রন্থমধ্যেই স্বীকার করা গেছে। যেমন ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাধার প্রথম সাক্ষাৎ, রামপ্রসাদের বাগানের বেড়াবাঁধার প্রসঙ্গ, অথবা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পরিবারে সতীদাহ।"— এই শেষোক্ত বিষয়টি গ্রন্থমধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না কিন্তু

সবিনয়ে অপরাধ স্বীকার করছি। কৈফিয়তে আমি আরও বলেছিলাম "আলোকচিত্রগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত সে বিষয়ে গ্রন্থশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা গেছে।" দুর্ভাগ্যবশত তা বাস্তবে করা হয়নি। আমি এছাড়াও লিখেছিলাম, অষ্টাদশ শতাব্দীর নারায়ণদাসের আত্মজা

pathagar.net

হট্ট এবং সোঞাই গাঁয়ের হটী বিদ্যালঙ্কারের পূর্ণপরিচয় পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা গেছে, যাতে ঐ দুইজন অসামান্যার বাস্তবজীবনের উপাদানের মিশ্রণে এই বিংশশতাব্দীর নারায়ণদাসের মানসকন্যার জীবনীটা আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।" সে প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা যায়নি। কিন্তু কেন যায়নি তাও আমি জানিয়ে দিলাম—"ডিসেম্বরের (1989) প্রথম সপ্তাহে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। দ্বিতীয়বার নার্সিং হোম থেকে ফিরে আসার পর সিদ্ধান্ত নিতে হল— আপাতত 'অসমাপ্ত গানে'ই থামতে হবে।"

দ্বিতীয় খণ্ডের কৈফিয়তে যতদূর সম্ভব পাপস্খালন করি:

ব্যাসকাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী বিপরীতবর্ত দুর্লভ শঙ্খের প্রসঙ্গ কেন তুলেছিলেন সে-কথা এখনো অনুক্তই রইল। যেটা তৃতীয় খণ্ডে বোঝা যাবে। তবে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পরিবারে সতীদাহর কথা কেন বলেছিলাম তা এবার নিশ্চয় বোঝা যাবে। হটী এবং হট্ট বিদ্যালঙ্কারের তথ্যনির্ভর বাস্তব জীবনী এবার পরিশিষ্টে দিলাম। সেটুকুই প্রামাণ্য ইতিহাস। প্রথম খণ্ডের আলোকচিত্রগুলি ইস্টার্ন রেলওয়ে কর্তৃক চল্লিশের দশকে প্রকাশিত 'বাঙ্গলায় ভ্রমণ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত; শুধু দুটি মাত্র আলোকচিত্র—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ধ্যানে পাওয়া জগদ্ধাত্রী-মূর্তি' (পৃ: 263) এবং 'কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পূজামণ্ডপে জগদ্ধাত্রী (পৃ: 265) আমাকে সরবরাহ করেছে বাল্যবন্ধু, কৃষ্ণনগরের সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়।

প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলাম এবারও তাদের সহৃদয় সাহায্য পেয়েছি। তদুপরি দুজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রথমজন ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দ প্রামাণিক। তার গবেষণা-গ্রন্থ অবলম্বন করেই শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন রেখা ধরে রূপেন্দ্রনাথকে শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত শ্রীমান অনুপম ঘোষ—যত্ন নিয়ে সে প্রুফ দেখেছে এবং বইটি সাজিয়েছে। তার সাহায্য না পেলে হয়তো এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে আরও বিলম্ব ঘটত।

আমি মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত: দ্বিতীয় খণ্ডে রূপমঞ্জরীর কাহিনীটি সমাপ্ত করতে পারলাম না। দোষ আমার নয়— দোষ ওঁদের দুজনের। প্রথমত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় ঘনশ্যাম সার্বভৌম। দ্বিতীয়ত সোঞাই গাঁয়ের সেই মেয়েটি: পীতু-ঠাকুরের কন্যা মৃন্ময়ী। যে মেয়েটি আগবাড়িয়ে রূপেন্দ্রনাথের বিয়েতে ঘটকালি করেছিল। এঁদের দুজনের কথা বলতে বলতে এতই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে, কালের মাপে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায়নি। পরিকল্পনা ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তত রূপমঞ্জরীর পিতৃবিয়োগ পর্যন্ত অগ্রসর হব; অর্থাৎ তার বিবাহ ও বৈধব্যযোগ পার করে দেব। হল না। বেটির বিয়েটা পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারলাম না এবার।

বয়ঃজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদে আর বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রার্থনায় যদি আরও বছর পাঁচেক টিকে থাকতে পারি তাহলে নিশ্চিত তৃতীয় খণ্ডে কাহিনীর যবনিকা টানব। উইথ নো রিগ্রেটস, অ্যান্ড নো ডিউ পার্ট!

জানুয়ারি 1998

রূপমঞ্জরী

pathagar.net

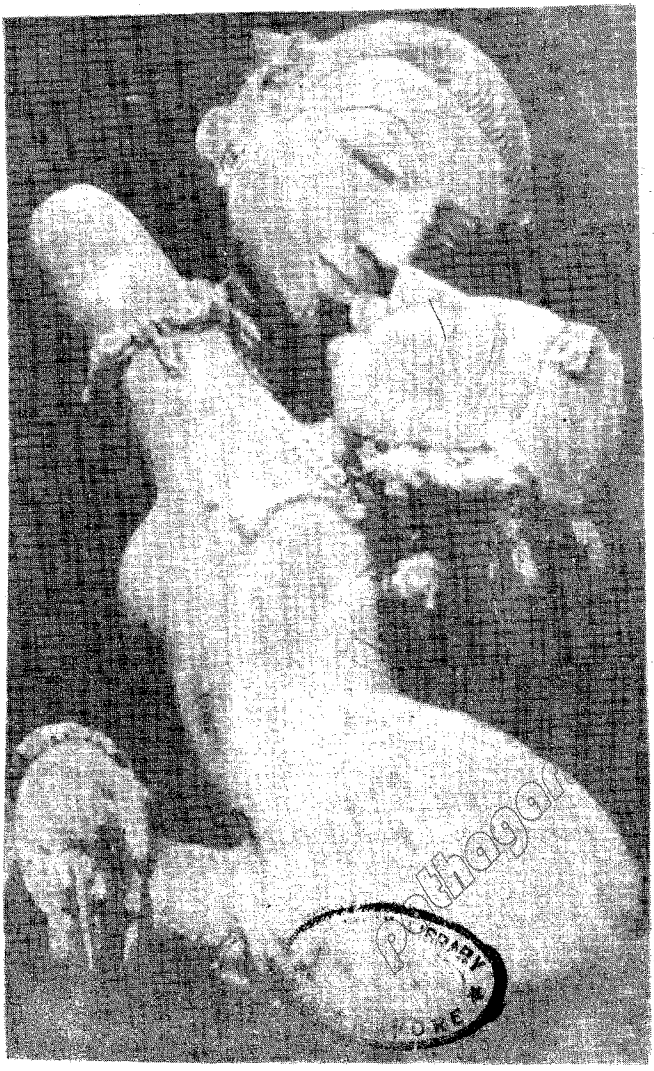

LIBRARY
DUKE

রূপমঞ্জরীর সন্ধানে

1744

সপ্তম পর্ব

দ্যাখ না-দ্যাখ আমি যদি লোটাকম্বল কাঁধে নিয়ে রূপমঞ্জরীর সন্ধানে রওনা হয়ে পড়ি তাহলে আপনাদের আপত্তি করার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে, — বিশেষ যাঁরা প্রথম খণ্ড 'রূপমঞ্জরী' এখনো পড়েননি। আমি আশা করব : 'পেরথম ভাগ' শেষ করে তারপর আপনারা 'দ্বিতীয় ভাগ' বা 'কথামালায়' হাত দেবেন। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে যদি তা না হয় তাহলে সেই ব্যতিক্রম পাঠক-পাঠিকাকে গল্পের ধরতাইটা আমাকেই ধরিয়ে দিতে হবে।

প্রথম প্রশ্ন: 'রূপমঞ্জরী' লোকটা কে ? তার দুটি উত্তর। প্রথমত, এটা যদি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হতো তাহলে বলতে পারতাম — 'রূপমঞ্জরী আমার দিদিমার দিদিমার-দিদিমা টু দ্য পাওয়ার টেন' — অর্থাৎ 'দশম-নারী' পর্যন্ত উজানে গেলে তাঁকে পাবেন। সে হিসাবে রূপমঞ্জরী হচ্ছেন উত্তর-শ্রীচৈতন্য ও প্রাক্-শ্রীরামমোহন যুগের প্রথম নারী বিদ্রোহিণী।

দু-দুটি ঐতিহাসিক নারী গতদশকের শেষাশেষি আমার রাত্রের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে কালের ব্যবধান বা ভৌগোলিক দূরত্ব তবু কিছুটা আছে, কিন্তু নাম, রূপ ও চরিত্রে বিশেষ ফারাক নেই। দুজনেই অসামান্যা বিদুষী, দুজনেই পুরুষশাসিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় সমাজকে নস্যাৎকরেছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্যে মৌলবাদী ধর্মান্ধদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে তসলিমা নাসরিন যে ভাবে তাঁর স্কন্ধস্থিত মাথাটি নিয়েই ইউরোপে চলে গেছেন, হটী বিদ্যালঙ্কারও প্রায় সেইভাবে গৌড়মণ্ডলকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন কাশীধাম। হটী বিদ্যালঙ্কার (1743—1810) চিতাভ্রষ্টা অবস্থায় কাশীধামে উপস্থিত হয়ে এক মহাপণ্ডিতের ভদ্রাসনে আশ্রয় পান। তাঁরই পালিতাকন্যারূপে ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারিণী হন। কাশীর পণ্ডিতসমাজ যখন তাঁকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি প্রদান করেন তখনো রাধানগরে শ্রীরামমোহনের আবির্ভাব হতে প্রায় এক দশক বাকি ! তদানীন্তন কাশীর কট্টর পণ্ডিতেরা — ঠিক এই দু-আড়াই'শ বছর পরে পুরীর ধর্মান্ধ 'শঙ্করাচার্য' যেমন নিদান হেঁকেছেন — বলেন স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে একটি বিচারসভায় এ নিয়ে তর্ক হয়। হটী বিদ্যালঙ্কার

প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করে প্রমাণ করেন, স্ত্রীলোকের বেদপাঠের অধিকার হিন্দুধর্মে স্বীকৃত। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন কাশীর চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাদান করেছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন তার পরের বছর হটী কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। প্রথম যুগে — আন্দাজ করা যায় — অধ্যাপিকা এবং ছাত্ররা প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন! তিনি প্রকাশ্যে পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতেন এবং পণ্ডিতদের প্রাপ্য দক্ষিণাও গ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয়া, হটু বিদ্যালঙ্কার — বয়সে হটী অপেক্ষা তিন দশকের অনুজা। জন্ম : কলাইঝুটি, বর্ধমান (আঃ 1775—1875)। পিতা পরম বৈষ্ণব নারায়ণ দাস। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় লাভ করে তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার নির্দেশে আত্মজার বাল্যবিবাহ দানে অস্বীকৃত হন। পরিবর্তে তাকে নানান বিদ্যাচর্চায় শিক্ষিতা করে তোলেন : ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়, নব্যন্যায় এবং আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যা। এঁর ডাকনাম হটু; কিন্তু পোশাকী নাম : রূপমঞ্জরী!

হটু তরুণী বয়সে সরগ্রামনিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের গুরুগৃহে বাস করে সাহিত্য এবং চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি চিরকুমারী। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, ইনি পুরুষদের মতো মস্তকমুণ্ডন, শিখাধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। সমাজ তা মেনে নিয়েছিল।

এই দুই অলোকসামান্যা মহিলার সন্ধান পাই আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চটি বইতে: সাহিত্যসাধক চরিতমালা সিরিজের প্রামাণিক সূত্রে: *চতুষ্পাঠীর বিদুষী মহিলা।*

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, বিগত দশকে এঁরা দুজন আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন যখন হামাগুড়ি দিতে শেখেননি, তখন কোনও পিতৃহীন বাঙালি বালবিধবা চিতাশ্রষ্টা পরিচয়ে বারাণসীধামে উপনীত হয়ে অন্তিমে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি গ্রহণ করছেন, অথবা বিচারসভায় পুরুষ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করছেন — লেখকের কল্পনায় নয়, বাস্তবে — এটা প্রণিধান করে গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছিল। কিংবা রামমোহনের প্রায় সমবয়সী একটি বাঙালি মহিলা আজীবন অবিবাহিতা থেকে পুরুষের বেশে সগ্রামে নর-নারী নির্বিশেষে চিকিৎসা করছেন; ছাত্রদের শারীরবিদ্যা শেখাচ্ছেন, এটা কি কম বড় কথা?

রূপমঞ্জরীর দ্বিতীয় পরিচয়: তিনি আমার দিদিমার-দিদিমার-দিদিমার দিদিমা...নন। সে আমার কন্যা! তাকে আমি নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম আমার উপন্যাসের পাতায়। ওই দুই অসামান্যা — হটী আর হটু'র সংমিশ্রণে।

রচনা কিছুটা অগ্রসর হবার পর — গত দশকের শেষ বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে—কিছু 'চিত্তচাঞ্চল্য' অনুভব করি। একটি নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এক কালো মুখোশধারীর সঙ্গে আমার কিছু তকরার হয় — একটি প্রত্যঙ্গের দখলদারী নিয়ে। সওয়া তিনকুড়ি বছরের স্বত্বাধিকার আগ্রাহ্য করে সে আমার হৃদপিণ্ডটা জবরদখল করতে চাইছিল। অনেক লড়াই করে বাড়ি ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যে আমার সেই মেয়েটি হারিয়ে

গেছে। 'বামি'র হাতের প্রদীপশিখাটির মতো।

তাই এই: 'রূপমঞ্জরীর সন্ধানে'!

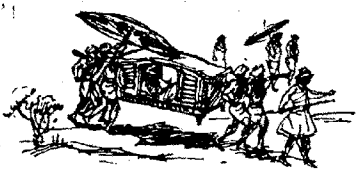

কিন্তু ওটা তো আত্মনেপদী কৈফিয়ৎ। আপনাদের গল্পের ধরতাইটা সংক্ষেপে ধরিয়ে দিই: পরস্মৈপদী কৈফিয়ৎটা : ইংরেজি 1744 খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ক্রান্তিকারী পলাশীযুদ্ধের পূর্বদশকে, সদ্যোবিবাহিত একটি দম্পতি — হবু-রূপমঞ্জরীর পিতা ভেষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা মঞ্জরী নৌকাযোগে তীর্থদর্শনে বার হয়ে পড়েন। রূপেন্দ্রনাথের পৈত্রিক নিবাস বর্ধমানের সোঞ্রাই গ্রামে, দামোদরের তীরে। ওঁরা কিছুটা পদব্রজে, কিছুটা নদীপথে এসে ভাগীরথীর দুই তীরে সেকালীন বর্ধিষ্ণু জনপদগুলির — রনার ঘাটি, চক্রদহ, প্রদ্যুম্ননগর, ত্রিবেণী, বংশবাটি, সপ্তগ্রাম, ওলন্দাজনগর, মূলাজোড়, বৈদ্যবাটি প্রভৃতির— বিভিন্ন মন্দিরে দেবদর্শন করছিলেন ক্রমে ক্রমে। পথে পড়ল 'মাহেশ' — সেখানে বাস করতেন শ্রীভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়, রূপেন্দ্রের পিসশ্বশুর। অগত্যা সেখানে আশ্রয় নিতে হল কদিনের জন্য। এ-ঘটনা রূপেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় দেড়বছর পরে। মুশকিল হল এই যে, মঞ্জরীর পিসিমার অভিজ্ঞ চোখে ব্যাপারটা আর গোপন রইল না। রূপেন্দ্র জানতে পারলেন, তাঁর স্ত্রী পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পিসশ্বশুর ওঁদের যৌথ তীর্থভ্রমণ বন্ধ করে দিলেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে গৃহের বাহিরে যাওয়াটাই অনুমোদনযোগ্য নয়। অগত্যা রূপেন্দ্র একলাই ভাগীরথীর দুই তীরে তদানীন্তন গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতিতে কী যেন একটা খুঁজে বেড়াতে থাকেন।

তিনি কী খুঁজছিলেন জানতে হলে রূপেন্দ্রনাথের চরিত্রটাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করতে হবে।

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পিছনে কী যেন একটা উপাধি ছিল; কিন্তু এখন আর তার কোন নিশানা নেই। রঘুনাথ শিরোমণি; বাসুদেব সার্বভৌম অথবা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল না বটে, কিন্তু ওঁর গ্রামখানিকে কেন্দ্রবিন্দু করে পঁচিশ ক্রোশ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত টানলে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে দেখা যেত সে-আমলে তিনি সুপরিচিত: রূপেন্দ্রনাথ নামে নয় : দুটি পৃথক অভিধায় : 'একবগ্গা ঠাকুর' আর 'ধন্বন্তরি'।

প্রথম উপাধিটা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কারণ সমকালের ধারণায় তিনি এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক আধুনিকমনা প্রগতিবাদী। প্রতিটি শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি নিজের বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে গ্রহণ করতেন। তা বেদবাক্য হলেও।

দ্বিতীয় উপাধিটা তাঁর অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য। বাল্যকালে তিনি চলে যান ত্রিবেণী। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, ন্যায়, নব্যন্যায়, দর্শন ইত্যাদি শেষ করে তিনি চলে আসেন সরগ্রামনিবাসী স্বনামধন্য কবিরাজ আচার্য গোকুলানন্দের পিতামহের কাছে। দীর্ঘ সাত বছর আয়ুর্বেদশাস্ত্র, চরক, সুশ্রুত ও নিদান আয়ত্ত করেন। গোকুলানন্দের নির্দেশে তিনি স্ত্রীরোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন — যা নাকি সমকালে এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। তবে কোনও রোগিণীর দেহস্পর্শ করার সময় গুরুর আদেশে একটি শর্ত তিনি আরোপ করতেন — ওই সময় প্রাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় একটি রমণীর উপস্থিতি আবশ্যিক।

'মধুচন্দ্রিমা' শব্দটা তখনও অভিধানে ওঠেনি! ওমা! কী বোকার মতো বলছি! বাংলা 'অভিধান' বস্তুটাই তো তখনও জন্মায়নি।* মোট কথা, যে-আমলের কথা, তখন সদ্যোবিবাহিতাকে নিয়ে 'হনিমুন' তো ছাড়, প্রচলিত নির্দেশটি ছিল : পথি নারী বিবর্জিতা।

তবে ওই! একবগ্গা-ঠাকুর ছিলেন ব্যতিক্রম। তাই বছর না-ঘুরতেই সহধর্মিণীর শাঁখাপরা হাতটি ধরে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন পিতৃমাতৃহীন রূপেন্দ্রনাথ। সোঞাই গ্রামের বাড়িতে পড়ে রইলেন বৃদ্ধা পিসিমা জগুঠাকরুন, এক পিসতুতো বোন কাত্যায়নী আর তার ঘরজামাই স্বামী।

বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে উনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করেছিলেন ভাগীরথীর দুই কিনারে। নদীমাতৃক বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এই ভাগীরথীর দুই তীর। গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত 'গঙ্গারিডি' যথার্থ গঙ্গাহ্রদি। জননী তাঁর স্তনভাণ্ডারের নির্মল ধারায়, পলিমাটির আশীর্বাদে, নাব্য স্রোতধারায় এ-দেশকে দিয়েছেন পানীয়, শস্য, পরিবহনের সুযোগ। তাই ভাগীরথীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে বঙ্গ-সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রগুলি : নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, মূলাজোড়, কালীঘাট।

গঙ্গাতীরের অযুত-নিযুত মন্দিরে 'পেন্নাম' ঠুকতে নয়, তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন একটি 'পরশপাথর'।

আকৈশোর তিনি যে একটা স্বপ্ন দেখে আসছেন :

'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' 'তাঁর' যে আবার আসার কথা!

ঠিক যেমন অদ্বৈতাচার্য প্রতীক্ষা করেছিলেন নবদ্বীপে প্রায় তিনশো বছর আগে। তিনি আবার আসবেন, তাঁকে আসতেই হবে! এই অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে ধরে আবার তিনি একটা ঝাঁকি দেবেন। এটাই ভারত-সংস্কৃতির ট্র্যাডিশন। শাক্যসিংহ এভাবে সমাজকে ধরে নাড়া দিয়েছিলেন দু-আড়াই হাজার বছর আগে। দিয়েছেন আদি শঙ্করাচার্য। দিয়েছেন সম্প্রতি চৈতন্যদেব। রূপেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, সেই তিনি আবার ওঁর

---

* প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিই : রূপমঞ্জরীর (বাস্তব হলী বিদ্যালঙ্কারের) জন্মের পূর্ব বৎসর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং 'বাঙলা ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়েছিল পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে — মানোএল-দা আসুম্পসাঁও-এর প্রচেষ্টায়।

pathagar.net

সমকালে আবির্ভূত হয়েছেন — এখনও প্রকট হননি, এই যা! তাহলে তিনি লুকিয়ে আছেন এই ভাগীরথী-বিধৌত কোনও একটি পুণ্যতীর্থে। শাক্যসিংহ ছিলেন রাজপরিবারভুক্ত — রানী ভবানী বা কৃষ্ণচন্দ্রও তাই। আদি শঙ্করাচার্য বা নিমাই পণ্ডিত শৈশবে সোনার ঝিনুকে দুধ খাননি — যেমন তা করেননি বুনো রামনাথ বা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। এঁদের মধ্যে কে এগিয়ে আসবেন রূপেন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক হতে?

ভারতীয় সংস্কৃতি আজ ভগ্নপক্ষ সম্পাতির মতো ধুঁকছে।

কিন্তু কেন?

রূপেন্দ্রনাথের ধারণা, তার দুইটি হেতু।

প্রথমত, ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা চাপিয়ে দিয়েছে তার পিঠে এক জগদ্দল বোঝা। তা পিঠে নিয়ে আকাশে ওড়া মহাশক্তিমান গরুড়-এর পক্ষেও সম্ভবপর হচ্ছে না। সেই বোঝা অবহেলিত, উপেক্ষিত একদল শক্তিমান মানুষ — টুলো-পণ্ডিত সমাজের নিয়ন্ত্রকদের মতে যারা অচ্ছুত, জল-অচল, শূদ্র।

দ্বিতীয় বাধা, বিহঙ্গমের একটি পাখা বিদীর্ণ করা হয়েছে। করেছেন, ওই মহামহা পণ্ডিত তথা কূপমণ্ডুকের দল: নারী-সমাজ। অশিক্ষায়, অবজ্ঞায়, অন্ধকারে, অত্যাচারে নারীসমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাকে 'নরকের দ্বার' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য! চৈতন্যদেব যবন হরিদাসকে বুকে টেনে নিলেন। আচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, কিন্তু হতভাগী বিধবাদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি! রূপেন্দ্রনাথ ভাগীরথীর দুই তীরের নানান জনপদে সন্ধান করে ফিরছেন সেই পরশপাথরটি—

রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি, সেই মহাপুরুষটি তখনও অজাত।

রাধানগরে তাঁর আবির্ভাব হতে তখনও তিন দশক বাকি।

দীর্ঘ তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত করে রূপেন্দ্রনাথ যেদিন মাহেশে ফিরে এলেন, ঘটনাচক্রে সেদিনই মঞ্জরীর প্রসব-বেদনা উঠেছে। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়-মশায়ের গোশালার পাশে নবনির্মিত একটি সূতিকাগারে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মঞ্জরী।

দুর্ভাগ্য একেই বলে! সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে প্রাণ দিল মঞ্জরী। 'মৃত্যু'টা ট্র্যাজেডি নয় — মৃত্যু তো ছায়ার মতো ঘুরছে জীবনের পিছু পিছু। মঞ্জরী প্রাণ দিল মাত্র বিশ বছর বয়সে — সেটাও বেদনার সূচীমুখ নয় — চরম ট্র্যাজেডি হল: সূতিকাগারে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না আচার্য গোকুলানন্দের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে, — প্রসূতিবিদ্যায় যাঁকে 'ধন্বন্তরি' আখ্যা দিয়েছিল গাঁয়ের মানুষ। রূপেন্দ্রনাথ — জীবনে যিনি কখনও মাথা নিচু করেননি, তাঁর শ্বশুরালয়ের প্রতিটি মানুষের কাছে করজোড়ে মিনতি করেও অনুমতি পাননি — ওই

সূতিকাগৃহে প্রবেশের। অথচ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নিজে হাতে প্রসব করাতে পারলে তিনি সন্তান ও জননীকে বাঁচাতে পারতেন। জটিলতাটা কী তিনি বুঝেছেন, কিন্তু সেটা বুঝতে বা শুনতে রাজি হল না বৃদ্ধা ধাত্রী!

— কী অসৈরণ কতা গো! আঁতুড়ে বেটাছেলে!

প্রসূতির কী জাতীয় জটিলতা হচ্ছে, কেন সে মর্মান্তিক কাতরাচ্ছে তা কানে শুনতে হল অশিক্ষিতা ধাত্রীর কাছে। আন্দাজে বিধান দিতে গেলেন। তাও সে শুনলো না। বললে, ছেলে বিইয়ে বিইয়ে চুলগুলো সব সনের দড়ি হয়ি গেল, ওই একফোঁটা লেড়াডার কাছে বিধান নিতি হবে? ক্যানে গো? গলায় দড়ি জোটে না মোর!

নিষ্ফল আক্রোশে শৃঙ্খলাবদ্ধ শার্দূলের মতো ত্রিযামারাত্রি পায়চারি করে ফিরেছেন তারাভরা আকাশের নিচে — সূতিকাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে। দ্বিতল বাড়ি। পুরুষেরা যে-যার শয়নকক্ষে নিদ্রাগত। আজ রাত্রে অনেকেই শয্যাসঙ্গিনীবঞ্চিত। কারণ মহিলাদের অধিকাংশই সূতিকাগৃহের আনাচে-কানাচে। বর্ষীয়সী কয়েকজন আর পরিবারের তিনকাল-গিয়ে-এককাল-ঠেকা এক বৃদ্ধা ধাত্রী রয়েছে সূতিকাগারের অভ্যন্তরে। গোয়ালঘরের পাশে এটি একটি নবনির্মিত সাময়িক আচ্ছাদন — বুকা-পিঠা মুলিবাঁশের চৌখুপি দেওয়াল, বেনাঘাসের একচালা। প্রতিবারই পরিবারে কোনও স্বামীসোহাগিনীর সন্তানবতী হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে এখানে সাময়িক খড়ো-চালা নির্মিত হয়। পাকা প্রসূতি-আগার নাকি নিয়ম-বহির্ভূত। ঠিক জানা নেই — হয়তো স্বয়ং মনুর বিধান। হবেও বা — স্বয়ং জগত্রাতা যীশুখ্রিস্টকেও তাই আবির্ভূত হতে হয়েছিল অশ্বাবাসের একান্তে।

দ্বার রুদ্ধ। গৃহাভ্যন্তরে কী ঘটছে জানতে পারছেন না। দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু মাঝে মাঝে স্বকর্ণে শুনছেন ধর্মপত্নীর মর্মান্তিক আর্তনাদ। সে আর্তনাদ — মনে হচ্ছিল রূপেন্দ্রনাথের — শুধু দৈহিক যন্ত্রণায় নয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুকদের এই নৃশংস ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যেন এক জান্তব প্রতিবাদ!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক'মাস আগেকার কথা। এই বাড়িরই ওই উপরের ঘরে। যেদিন মশারি-ফেলা জনান্তিকে একপ্রহর রাত্রে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে কুসুমমঞ্জরী প্রথম স্বীকার করেছিল যে, সে মা হতে চলেছে। রূপেন্দ্র ওকে বুকে টেনে নিয়ে মুখচুম্বন করে বলেছিলেন, তুমি আমাকে সন্তান দিয়েছ, তোমার একটা পুরস্কার পাওনা! বল মঞ্জু, কী নিয়ে আসব তোমার জন্য এবার, তীর্থ থেকে ফেরার সময়?

ভারি সুন্দর জবাবটি দিয়েছিল মঞ্জু। বলেছিল, তুমি না ফুলশয্যার রাতেই আমাকে বলেছিলে : স্বামী আর স্ত্রীর সমান অধিকার! তাহলে ও-কথা বলছ কেন? কে কাকে উপহার দিল তার তো হিসেব নেই!

তা বটে। তবু রূপেন্দ্রনাথ ওকে বলেছিলেন কিছু চাইতে। আজকের এই রাত্রিটি, এই বিশেষ মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে একটা স্মারকচিহ্ন দিতে চান তিনি।

কুসুমমঞ্জরী বলেছিল, তাহলে আমি যা চাইব তাই দেবে?

—দেব, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়।

—আমার বড় সাধ লেখাপড়া শেখার। তুমি আমাকে শেখাবে? লুকিয়ে লুকিয়ে?

রূপেন্দ্র শয্যাপ্রান্তে উঠে বসেছিলেন। এমন একটি গোপন বাসনা যে কুসুমমঞ্জরীর অন্তরের গভীরে সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে তা আন্দাজ করতে পারেননি। যে-কালের কাহিনী সে-কালের প্রচলিত সংস্কার ছিল স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় হলে তার বৈধব্যযোগ অনিবার্য! তাই রূপেন্দ্র অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী বলছো মঞ্জু? তোমার ভয় হয় না? লোকে বলে, লেখাপড়া শিখলে...

মঞ্জু তার শাঁখা-পরা হাতটা বাড়িয়ে ওঁর মুখে চাপা দিয়েছিল। বলেছিল, ও-কথা বলো না! তুমিই তো বলেছো সেটা ভুল, সেটা মূর্খদের কুসংস্কার!

তা বলেছেন। গার্গী-মৈত্রেয়ীর কাহিনী শুনিয়েছেন ধর্মপত্নীকে। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, তাই হবে, মঞ্জু। শেখাব, তোমাকে বাঙলা পড়তে, লিখতে শেখাব। সংস্কৃতও শেখাব। কিন্তু এখানে তো তা সম্ভবপর নয়। এখানে সুযোগ হবে না। জানাজানি হয়ে যাবে। তোমার পিসিমা বা পিসেমশাই যদি একবার নিষেধ করে বসেন —

—না, না, এখানে নয়। সোঞাই ফিরে গিয়ে।

—সেই ভাল, কথা দিচ্ছি ওর হাতেখড়ি দেবে ওর মা, বাবা নয়। অক্ষর পরিচয়ও করাবে তার মা। ঠিক যেমন পৌরাণিক যুগে কাশীর রাজমহিষী মদালসা শিক্ষিত করেছিলেন, দীক্ষা দিয়েছিলেন রাজপুত্র অলর্কের।

মঞ্জু বুদ্ধিমতী। বুঝেছিল ঠিকই, তবু দুষ্টুমি করে শুনতে চেয়েছিল, কার কথা বলছ তুমি?

—আত্মদীপের।

মঞ্জু সলজ্জে মুখ লুকিয়েছিল ওঁর বুকে।

আত্মদীপ! নামটা রূপেন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বেই স্থির হয়ে আছে। নামকরণ করেছিলেন রূপেন্দ্রনাথের বয়স্য, সমকালীন বঙ্গ-সরস্বতীর প্রিয়তম সেবক — অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

বিবাহের পূর্বে রূপেন্দ্রনাথ বিশেষ কারণে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কবিগৃহে। কবি একাই থাকতেন — প্রোষিতপত্নীক; অতিথি রূপেন্দ্রনাথ অবিবাহিত। যদিও বিবাহের দিন ও পাত্রী নির্বাচন তার পূর্বেই হয়েছিল। বিদায়ের দিনে রূপেন্দ্র বন্ধুবর ভারতচন্দ্রকে সুসংবাদটি জ্ঞাপন করেন এবং বিবাহরাত্রে সোঞাইগ্রামে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন।

কবিবর বলেছিলেন, রূপেন্দ্র, তোমার আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম; কিন্তু বুঝতেই পারছ, এত দূরের পথে আমার পক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। হয়তো তোমাতে-আমাতে আর কখনও দেখাই হবে না। তাই — তুমি যদি অনুমতি দাও — আমি তোমার-আমার বন্ধুত্বের একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিতে ইচ্ছুক, যাতে আমার কথা তোমার বারে বারে মনে পড়ে যায়। তোমার শুভবিবাহে এই দীন কবি আর কী উপহার দিতে পারে বল?

—কী উপহার? শুনি আগে — জানতে চেয়েছিলেন রূপেন্দ্র।

—মদনারিরিপুর আশীর্বাদে তোমাদের মিলন সার্থক হবেই। সেই অনাগত মানবশিশুটির নামকরণ আমি করে দেব। তাকে যতবার ডাকবে ওই সূত্রে ততবারই এই দীন কবির কথা তোমার স্মরণ হবে।

রূপেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। প্রশ্ন করেন, বল? কী নাম?

—তোমার পুত্রের নাম দিও: আত্মদীপ।

—আত্মদীপ?

—হ্যাঁ। বিবেকনির্দেশে জীবনে পথ খুঁজে এগিয়ে যাওয়াই তোমার ব্রত। কোনও শাস্ত্রবাক্যকেই বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করো না। শোন, মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ যখন কুশীনগরে শেষশয্যায় শায়িত, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য আনন্দ। তিনি জানতে চেয়েছিলেন : 'আপনার মহাপরিনির্বাণের পর আমরা কার কাছে যাব পথনির্দেশ যাচ্ঞা করতে?' জীবনের শেষনিশ্বাসের সঙ্গে পরমকারুণিক তথা পরমবুদ্ধ অন্তিম নির্দেশ দিয়েছিলেন:

'আত্মদীপো ভব!
আত্মশরণো ভবো!
অনন্যশরণো ভব!'

নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালাও। কারও কাছে পথের সন্ধান চাইতে যেও না। নিজের বিবেকের আলোয় জীবনের পথ পরিক্রমা করো।

রূপেন্দ্র হেসে বলেছিলেন, বন্ধু! তুমি অপূর্ব নামকরণটি করেছ। আমার পুত্রসন্তান হলে নিশ্চয় তার নাম দেব : 'আত্মদীপ', কিন্তু তুমি কট্টর স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো এ-পরামর্শ দিলে; কিছু মনে করো না বন্ধু, ঠিক — কবির মতো নয়!

—কবির মতো নয়? কেন, কী ত্রুটি হল আমার?

—তুমি কবি হিসেবে বিস্মৃত হয়েছো — এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগতের অধিকার একা পুরুষের নয়। এ-বিবাহ সার্থক হলে পুত্রের পরিবর্তে আমার প্রথমে কন্যা-সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, তাই নয়?

ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, ঠিকই বলেছ বন্ধু! পুত্রের নামকরণ করেছিল কট্টর বামুনপণ্ডিত; এবার কন্যার নামকরণ করবে: 'কবি'। রূপেন্দ্রনাথ আর কুসুমমঞ্জরীর যৌথ মনসিজ-সাধনার ফলশ্রুতি যদি কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়, তবে তার নাম হোক : রূপমঞ্জরী!

সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল রূপেন্দ্রনাথের। সূতিকাগৃহের অভ্যন্তর থেকে ভেসে এল এক মিলিত ক্রন্দনরোল!

শেষ হয়ে গেল! সব শেষ হয়ে গেল! আত্মদীপ নয়, রূপমঞ্জরী নয় — কেউই এল না। অকালে বিদায় নিল তাদের মা! বিনা চিকিৎসায়! কুসংস্কারের বলির পশু! সূতিকাগারের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করে সম্মিলিত নারীকণ্ঠের ক্রন্দনরোল তারই প্রমাণ।

রূপেন্দ্রনাথ বাঁশের খুঁটিটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন। মাথার ভিতর টলে উঠেছিল

pathagar.net

তাঁর। পরমুহূর্তেই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। অপরিসীম নির্বেদে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর। মুহূর্তে জীবনের অর্থটাই যেন হারিয়ে গেল। আশঙ্কা হল এখনি হয়তো শ্বশুরবাড়ির গুরুজনেরা — যাঁরা কুসংস্কারের কৈঙ্কর্যে আদরের মেয়েটাকে বাঁচতে দিলেন না — তাঁরা সহানুভূতি জানাতে হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসবেন। সেটা সহ্য হবে না ওঁর। সম্মোহিতের মতো পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এলেন বাহিরে। তারায় ভরা আকাশের নিচে। টুপ-টুপ করে শেষ রাতের শিশির ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। এক আকাশ কৌতূহলী তারা। পূব আকাশটা সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। পাখ-পাখালির কিচিমিচি এখনো শুরু হয়নি বনে-বনান্তরে। ধীরে ধীরে সমুখপানে মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে চললেন রূপেন্দ্রনাথ — নগ্ন গাত্রে, নগ্ন পদে, কৃপর্দকহীন অবস্থায়। চেতনাহীন সম্মোহিতের মতো।

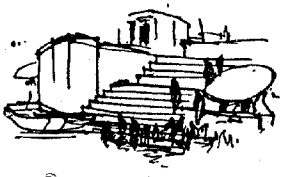

নিজেকে আবিষ্কার করলেন পুণ্যতোয়া মা গঙ্গার তীরে। একপ্রহর বেলায়। ছয় ক্রোশ দূরে। ফ্রেডরিক নগরের পারানিঘাটের একান্তে এক বিশাল বটবৃক্ষের নিচে বসে আছেন তিনি। সামনে দিয়ে লোকজন চলেছে গঙ্গাস্নানে। গঙ্গায় সারি সারি নৌকা — ছিপ, পান্সি, মাছমারাদের নৌকা, বজরা। মাঝ-গাঙে ভাসছে এক বিচিত্র জলযান — অর্ণবপোত।

মাহেশ আর রাধাবল্লভপুর — দুখানি পাশাপাশি গ্রাম। রাধাবল্লভপুরে আছে রুদ্রপণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের অপূর্ব মূর্তি; আর মাহেশের রথ তো সুবিখ্যাত। মনে আছে নিশ্চয়, বঙ্কিমের মানসকন্যা রাধারাণীও হারিয়ে গেছিল এই মাহেশের রথযাত্রার মেলাতেই। আমরা অবশ্য এখন আছি বঙ্কিম-জন্মের প্রায় একশ বছর আগে। এই দুই বর্ধিষ্ণু গ্রামের গঙ্গাতীরে ফ্রেডরিক নগর। তোমরা বোধকরি ও-নামে চিনবে না। তাই বলি, তার বর্তমান নাম: শ্রীরামপুর। সেকালে তা ছিল দিনেমারদের ঘাঁটি। অদূরেই, কাহিনী-বর্ণিত স্থানকালের পরবর্তী যুগে, এখানে কবরস্থ হবেন: মার্শম্যান, ওয়ার্ড আর কেরীসাহেব। বাঙলা ছাপাখানায় প্রথম সংবাদপত্রটি যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন: 'সমাচারদর্পণ'।

রূপেন্দ্রনাথ নিশ্চুপ বসে রইলেন ঘাটের কিনারে। অস্নাত, অভুক্ত। কী করবেন স্থির করে উঠতে পারছেন না। স্বপ্ন ছিল তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত করে সপুত্র, সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তন করবেন পৈত্রিক ভিটেতে — সোঞাই গ্রামে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। না, ভুল হল, ভাগ্য নয়, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিছু পণ্ডিতম্মন্যের সংস্কারের কৈঙ্কর্যে! গ্রামে ফিরে পুনরায় কবিরাজ বৃত্তি গ্রহণের বাসনা নেই। সে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন এক প্রিয় শিষ্যকে।

হঠাৎ নজর পড়ল মাঝগঙ্গায় ভাসমান সুবিশাল অর্ণবপোতটির উপর। ফ্রেডরিক নগরের বন্দরে আরও দু-তিনটি সমুদ্রগামী বড়জাতের জাহাজ ভাসছে। আকারে ওটি তাদের সমতুল;

boiRboi.net

কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় মাস্তুলের উপরিস্থিত অভিজ্ঞান।

তিন-তিনটি মাস্তুলে পাঁচ স্তরে পনেরোটি পাল। যুদ্ধজাহাজ নয়, কামান নজরে পড়ছে না। যাত্রীবাহী বা মালবাহী জাহাজ। কেন্দ্রীয় বৃহত্তম মাস্তুলের উপরে একটি ধাতব চক্রচিহ্ন — সূর্যালোকে ঝলমল করছে এবং তৎসংলগ্ন ত্রিকোণাকৃতি গরুড়-ধ্বজা বলে দেয় এটি ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ বা দিনেমারদের জাহাজ নয়। বাঙালির জাহাজ এবং হিন্দুর — যা বহু-বহুদিন নজরে পড়েনি রূপেন্দ্রের। বঙ্গোপসাগর আছে আজ কয়েক শতাব্দী বিদেশীদের কব্জায় — বিজয়সিংহ, চাঁদসদাগর, লক্ষিন্দর, ধনপতিদের কীর্তি ও কাহিনী ক্রমশ চলে গেছে মহাকালের নেপথ্যে টিকে আছে শুধু মঙ্গলকাব্যের পুঁথিতে।

বঙ্গোপসাগরে বিদেশীদের আগমন ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি — গৌড়েশ্বর মামুদ শাহের আমলে। তারা ছিল পর্তুগীজ। তারা ঘাঁটি গেড়েছিল প্রধানত মগের মুলুকে — চট্টগ্রামে: ক্রমে ভাগীরথী বেয়ে হুগলি-ব্যান্ডেলে। তারপর এল দিনেমারেরা। ওদের ঘাঁটি ছিল ওলন্দাজনগর, যার বর্তমান অভিধা: চুঁচুড়া। সবশেষে এসেছে ইংরেজ আর ফরাসী। প্রথমজন ইজারা নিয়েছে সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কালীঘাট অঞ্চল; ফরাসীরা চন্দননগর। দু-আড়াইশো বছরে নিঃশেষ হয়ে গেছে বাঙালি বণিকদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি, সিংহল থেকে চম্পানগর পর্যন্ত ছিল যাদের বিচরণভূমি, বিজয়সিংহের স্মৃতিবাহী: মধুকর, সপ্তডিঙা, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি অর্ণবপোত।

তাই অস্নাত, অভুক্ত ক্লান্ত মানুষটি উদাসনেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন ওই বিচিত্র জলযানটিকে। কার জাহাজ? কোথায় চলেছে? কোন ভরসায় চলেছে বোম্বেটে-অধ্যুষিত বঙ্গোপসাগরে?

হঠাৎ লক্ষ্য হল, ওই বিশাল জলযান থেকে একটি ডিঙি নৌকো জলে ভাসানো হল। দুজন মাঝি দাঁড় বেয়ে ঘাটের দিকে নিয়ে আসছে একমাত্র আরোহীটিকে। লোকটার মাথায় শামলা ধরনের শিরস্ত্রাণ, পরিধানে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে পিরাণ ও উত্তরীয়। নৌকাটি ঘাটে এসে ভিড়ল। মাঝি দুজন সাহায্য করল বাবুমশাইকে ঘাটে নামতে। জুতো-জোড়া হাতে নিয়ে তিনি জল ছপছপ করতে করতে ঘাটে উঠে এলেন। রূপেন্দ্রের মনে হল লোকটি ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। উনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। কাছাকাছি এসে লোকটি পদস্পর্শ করে ওঁকে প্রণাম জানিয়ে বললে, ঠাকুরমশাই, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম বলে মার্জনা চাইছি। কর্তার নির্দেশে আপনার কাছে একটি প্রশ্নের প্রত্যুত্তর জানতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন...

রূপেন্দ্র প্রতিনমস্কার করে বলেন, কর্তা বলতে?

—আজ্ঞে, ওই জলযানটা যিনি ভাড়া নিয়েছেন। আমার নিয়োগকর্তা — বঙ্গাধিপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের অধীনস্থ নায়েব কানুনগো — বর্ধমানভুক্তির ইজারাদার বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত! আমি তাঁরই গোমস্তামাত্র।

[এইখানে বোধহয় বলে রাখা ভালো যে, ওই 'বঙ্গাধিপতি' শব্দটা একটা উপাধিমাত্র। আমাদের কাহিনীর কালে বাস্তবে বঙ্গাধিপতি সিরাজ-উদ্দৌলার দাদামশাই নবাব আলিবর্দি খাঁ।]

রূপেন্দ্র বলেন, আপনাদের কর্তা কী করে জানলেন যে, আমি এখানে বিশ্রাম করছি ?

—আজ্ঞে, দূরবীনের সাহায্যে।

—বুঝলাম। কী তাঁর প্রশ্ন ?

—মহাশয় কি বর্ধমান সোঞাই গাঁয়ের ধন্বন্তরি কবিরাজমশাই ?

রূপেন্দ্র বললেন, আজ্ঞে হাঁ, আমার পৈত্রিক নিবাস সোঞাই গ্রাম এবং পেশায় আমি কবিরাজ বটে ; তবে — উপাধি ঐ যেটা বললেন, তার কোনও ভিত্তি নাই।

—তাহলে মহাশয়কে অনুগ্রহ করে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। কর্তামশাই আপনার সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

হঠাৎ স্মরণ হল রূপেন্দ্রের। হ্যাঁ, নগেন দত্তের আমন্ত্রণে তিনি দত্তমশায়ের স্ত্রীর চিকিৎসা করতে বছর দেড়েক পূর্বে বর্ধমান শহরে গিয়েছিলেন বটে। রোগিণীকে পরীক্ষা করেছিলেন, ঔষধের ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চিকিৎসকের প্রাপ্য সম্মানমর্যাদা গ্রহণ করেননি — এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ে গেল।

রূপেন্দ্র সম্মত হলেন। গোমস্তামশাই ওঁকে ডিঙিনৌকায় তুলে ওই অর্ণবপোতের দিকে নিয়ে চলেন।

একে একে সব কথা মনে পড়ছে। নগেন দত্ত টাকার কুমির। বর্ধমান মহারাজের পরেই গোটা বর্ধমানভুক্তিতে ধনিকশ্রেষ্ঠ। বয়স আড়াইকুড়ি কিন্তু শরীর মজবুত। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়স বিশ-বাইশ। মূর্ছারোগে ভুগছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসকেরা বলেছেন রোগটার নাম: মৃগী।

কুমারী অবস্থায় কোনও উপসর্গ ছিল না। বিবাহের পর প্রথম ছয়মাসও উপসর্গ ছিল এখন ঘন ঘন মূর্ছা হয়। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, তাবিজ-কবচ, হাকিমী-কবিরাজীর হদ্দমুদ্দ করে নগেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠিয়ে 'ধন্বন্তরি'কে পাকড়াও করে এনেছিলেন সোঞাই গ্রাম থেকে।

রূপেন্দ্র প্রথামতো দ্বিতীয়া মহিলার উপস্থিতিতে রোগিণীকে পরীক্ষা করার পর নগেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, কী বুঝলেন বলুন, কোবরেজমশাই। আমার স্ত্রীর ওই ভুতুড়ে অসুখ সারবে ?

রূপেন্দ্র বলেছিলেন, সারবে। যদি আপনার সামর্থ্যে কুলায়।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ধনকুবের: মানে ?

—আর সবাইকে চলে যেতে বলুন। কথাটা গোপন। জনান্তিকে বলতে চাই।

ঘর নির্জন করে গৃহস্বামী বললেন, এবার বলুন ?

—আপনার স্ত্রীর অসুখটা দৈহিক নয়, মানসিক। রোগের মূল হেতু — যেহেতু তিনি আপনার কাছ থেকে যথাপ্রত্যাশিত স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছেন না।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন নগেন দত্ত। বলেন, কী বলছেন আপনি ? স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছে না ! সে তো যা চায়, তাই পায়।

—না, পান না। নিশ্চয় জানেন, চিকিৎসকের কাছে কোন কিছু গোপন করতে নেই ? এবার বলুন তো দত্তমশাই — আপনি কতদিন পূর্বে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেছেন ? কবে আপনার স্ত্রীর মর্যাদা শেষবার মিটিয়েছেন ?

pathagar.net

নগেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠল। রুদ্ধস্বরে বললেন, আপনার স্পর্ধার তো একটা সীমা থাকবে, কোবরেজমশাই? কতদিন আগে আমি স্ত্রীকে নিয়ে এক শয্যায় শয়ন করেছি, এই অশ্লীল প্রশ্নটা করতে আপনার বাধল না?

—প্রশ্ন করতে আমার বাধেনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন, উত্তর দিতেই না বাধছে আপনার? শুনুন, ক্ষুৎপিপাসা-নিদ্রার মতো এও এক জৈবিক বৃত্তি। শুধু পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকেরও! আমি জানি না, আপনার বাগানবাড়ির আয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি এই বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেছেন। আমি পরীক্ষা করে দেখিনি, কিন্তু আমার আশঙ্কা আপনার স্ত্রী অক্ষতযোনি!

—চোপরাও বেয়াদপ! — গর্জন করে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দূলের মতো বার-কয়েক কক্ষমধ্যে পায়চারি করে ফিরে এসে ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যথেষ্ট হয়েছে! আমার স্ত্রীর চিকিৎসা আপনাকে আর করতে হবে না। কী বৈদ্যবিদায় দিতে হবে বলুন?

রূপেন্দ্রনাথও আসনত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। শান্ত স্বরে বলেছিলেন, আমি আপনার দেউড়ির বাইরে গিয়ে সড়কের উপর অপেক্ষা করছি। আমার জিনিসপত্র সব লোক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিন।

নির্গমনদ্বারের দিকে রূপেন্দ্রনাথ চলতে শুরু করামাত্র নগেন্দ্রনাথ ছুটে আসেন। যেন সম্বিত ফিরে পান। কবিরাজমশায়ের দুটি হাত ধরে বলেন, আমার মাথার ঠিক ছিল না। অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না...

রূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, না, আমি কিছু মনে করিনি। আপনি প্রচুর অর্থের মালিক। শিক্ষাদীক্ষা বোধকরি কিছু জোটেনি। আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারবেন না, এ তো প্রত্যাশিত।

এত বড় অপমান ধনকুবেরকে ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তবু তিনি সেটা গায়ে না মেখে বলেছিলেন, আমি আপনার হাত ধরে মার্জনা ভিক্ষা করছি ভেষগাচার্য! ঠিকই বলেছেন আপনি! শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ আমার হয়নি। বলুন, ক্ষমা করেছেন?

—করেছি!

দুজনেই উপবেশন করেছিলেন অতঃপর। নগেন্দ্রনাথ বলেন, এবার বলুন, কী চিকিৎসা করতে চান? ঔষধপত্রের ব্যবস্থা...

—চিকিৎসার প্রয়োজন তো আপনার স্ত্রীর নয়, আপনার। মদ্যপান রাতারাতি ত্যাগ করতে বলছি না, ধীরে ধীরে কমান। কিন্তু সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। সাত দিন ওই ওষুধই চলবে। গৃহাবরোধে পরিমিতি মেনে মদ্যপান। অষ্টম দিনে তাঁর কাছে গিয়ে বলতে হবে, এইমাত্র আমাকে যা বললেন।

—বুঝলাম না। কাকে কী বলতে হবে?

—বলবেন আপনার ধর্মপত্নীকে। যেকথা এখনি আমাকে বলেছেন: 'আমি তোমার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি। বল, ক্ষমা করেছো।'

pathagar.net

নগেন্দ্রনাথ নতনেত্রে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর জানতে চাইলেন, শুধুমাত্র এতেই ও ভালো হয়ে যাবে?

—আমার তাই ধারণা। বাগানবাড়ি, বাঈজী বা উপপত্নীকে যে আপনি একেবারে ত্যাগ করতে পারবেন এতটা আশা করি না। কিন্তু আপনার স্নেহ, প্রেম, সোহাগ না পেলে কোনও ওষুধে ওঁর এই মূর্ছারোগ সারবে না।

নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমি চেষ্টা করে দেখব। ক্ষমা যখন করেছেন এবার বলুন, কী বৈদ্যবিদায় দেব?

—আজ নয়, দত্তমশাই। আমাকে বৈদ্যবিদায় দেবার অধিকার আপনাকে অর্জন করতে হবে। আত্মসংযমের মাধ্যমে। আমি যে ব্যবস্থা দিয়ে গেলাম তা যদি যথাযথ পালন করতে পারেন, আপনার ধর্মপত্নীকে সুস্থ করে নবজীবন দান করতে পারেন, তাঁকে সন্তানবতী করে তুলতে পারেন, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমি বৈদ্যবিদায় নিয়ে যাব।

—কিন্তু বৈদ্যের কাছে পরামর্শ নিয়ে বৈদ্যবিদায় না দিলে যে নরকদর্শন করতে হয়।

—একথা আয়ুর্বেদে কোথায় লেখা আছে তা আমার জানা নেই; কিন্তু জনমানসে এমন একটা সংস্কার যে আছে, তা জানি। বেশ তো, অন্তত সেই আতঙ্কেই আপনি যদি আপনার জীবনযাত্রার ছকটা পালটাতে পারেন, তাহলেই আমি খুশি।

সেই ওঁদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।

উড়ি নৌকাটা জলযানের গায়ে এসে ভিড়ল।

গঙ্গার জলতল থেকে অর্ণবপোতের পাটাতনের সমতল এক-মানুষ উঁচুতে। দড়ির মই বেয়ে জাহাজে উঠতে হল। রূপেন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জলযানের অভ্যর্থনাকক্ষে। উপরের ডেক-এ। নগেন দত্ত বসেছিলেন একটি আরামকেদারায়। সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন আগন্তুককে। নগেনের বয়স রূপেন্দ্রের দ্বিগুণ; কিন্তু এটাই ছিল সেকালের শিষ্টাচার। সোৎসাহে দত্তজা বলে ওঠেন, আমার দূরবীন তাহলে মিছে বলেনি! আপনি যথার্থই ধন্বন্তরি কোবরেজ মশাই! তা সারাটা সকাল গঙ্গাতীরে অমন নিশ্চুপ বসেছিলেন কেন? স্নানাহার তো কিছুই হয়নি আপনার। চেহারাটাই বা এমন বাউণ্ডুলের মতো হল কেন?

রূপেন্দ্র প্রতিনমস্কার করে বললেন, আমার রোগিণী কোথায়?

—কোথায় আবার? বর্ধমানে, তাঁর অন্দরমহলে। 'পথি নারী বিবর্জিতা' শোলোকটা নিশ্চয় আপনার জানা আছে, কোবরেজমশাই। আপনিও তো দেখছি ধর্মপত্নীকে বাড়িতে রেখে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে এসেছিলেন।

রূপেন্দ্র ম্লান হাসলেন। নিজ ধর্মপত্নীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, এখন শারীরিক কেমন আছেন দত্তগৃহিণী?

—ভালো, খুব ভাল। অতিশয় ভাল। মূর্ছা আর হয় না। এখন তো তিনি শুধুমাত্র আমার স্ত্রী নন, মাসখানেক হল আমার খোকনের মা! আমার প্রতি তাঁর নজরই পড়ে না।

এবার তৃপ্তির হাসি হাসলেন রূপেন্দ্র। ঘর ফাঁকা হলে নগেন্দ্র স্বীকার করেন, মদ্যপান একেবারে ত্যাগ করতে পারিনি, বুয়েছেন না? তবে পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছি। উপপত্নীটিকেও তাড়িয়ে দিতে মন সরেনি। বেচারি যাবে কোথায়? তবে আপনার বিধান আমি যে মেনে নিয়েছি, সেকথা ইতিপূর্বেই বলেচি। এবার বলুন, আপনাকে মূলতুবি বৈদ্যবিদায়টা দিয়ে ঋণমুক্ত হতে পারি কি না?

সরাসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রূপেন্দ্র বলেন, এই বিশাল অর্ণবপোত নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সিংহল, না কি চম্পানগর?

—বলব, সব বলব। তার পূর্বে আপনার স্নানাহার হোক।

রূপেন্দ্রর মনে পড়ে গেল মাহেশে ওরা বোধহয় এতক্ষণে স্থিরনিশ্চয় বুঝেছে যে, রূপেন্দ্র নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করেছেন। ফলে শববাহীরা তাঁর অনুপস্থিতিটাকে মেনে নিয়ে এতক্ষণে শ্মশানের দিকে যাত্রা করেছে। এমন অবস্থায় স্নানাহারে রুচি হল না ওঁর। বললেন, আমার একটি ব্রত আছে আজ, দত্তমশাই। সমস্ত দিন উপবাস। সন্ধ্যার পর হয়তো কিছু ফলাহার করব। আপনি সব কথা খুলে বলুন। এ নৌকায় কারা আছেন, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন?

নগেন দত্ত ধীরে ধীরে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। অর্ণবপোতটি চলেছে দক্ষিণাভিমুখে। ফ্রেডরিক নগর থেকে পানিহাটি, সোদপুর, পীরের থান, উতোরপাড়া, ঘুসুড়ি হয়ে কালীঘাট। তারপর আরও দক্ষিণে হীরকবন্দর, সাগরদ্বীপ হয়ে কপিল মুনির আশ্রম। সেখানে ওঁরা গৈরিকবর্ণা গঙ্গাকে পিছনে ফেলে আশ্রয় নেবেন নীলাম্বুরাশির কোলে: বঙ্গোপসাগর। যাবেন দক্ষিণ-পশ্চিমে। বুড়িবালামের মোহনায় বালেশ্বর অতিক্রম করে মহানদীর ব-দ্বীপে। তারপর মহানদীর 'বড়গঙ্গা' ধরে কটক। সেখান থেকে পদব্রজে একাম্রকানন। সাক্ষীগোপাল-কমলপুর-আঠারোনালা হয়ে নীলাচলের শ্রীক্ষেত্র। ওঁদের গন্তব্যস্থল সেই: আদি অকৃত্রিম-সর্বতীর্থসার: পুরুষোত্তমক্ষেত্র।

রূপেন্দ্র জানতে চাইলেন, সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়েই যখন যাচ্ছেন তখন আংশিক তীর্থপথ পদব্রজে যেতে হচ্ছে কেন? কেন সরাসরি পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই জাহাজ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না?

জবাবে দত্তজা বুঝিয়ে বললেন, পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরী সমুদ্রতীরে বটে, কিন্তু সেখানে কোনও বন্দর নেই। বেলাভূমি থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ সমুদ্রের ভিতরে ছাড়া জাহাজ নোঙর

করা যায় না। জাহাজের তলদেশ আটকে যায়। এজন্য তাম্রলিপ্তি বা কটকের বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো ছাড়া উপায় নেই। যাত্রীরা বাকি পথ যখন পদব্রজে যাবে ও আসবে ততক্ষণ বন্দরে জাহাজকে প্রত্যাবর্তন যাত্রার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রঙ ফেরাতে হবে। টুকটাক মেরামত করতে হবে। বহু পূর্বযুগে — বাঙলার বাণিজ্য যখন মধ্যগগনে, তখন এভাবেই গৌড়বাসী শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যেত। পরে এ-পথ পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে বন্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য কাটোয়া-শান্তিপুর থেকে যাত্রা শুরু করে গঙ্গাঘাট থেকে ভাগীরথী ত্যাগ করে মেদিনীপুরের অরণ্যপথে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন।

রূপেন্দ্র বললেন, জানি। একসময়ে আমার গুরুদেব শ্রীমৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীচৈতন্যদেবের পদরেখা ধরে জগন্নাথধামে পদব্রজে যাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমার গুরুদেবের পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশও শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্নরেখা ধরেই শ্রীক্ষেত্রে তীর্থদর্শনে যান। তাঁর শ্বশুরমশাইও যান এবং স্বপ্নাদেশ পান যে, তাঁর কন্যার গর্ভে এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্রের জন্ম হবে। বস্তুত, স্বয়ং জগন্নাথ স্বপ্নাদেশে আমার গুরুদেবের নামকরণ করেছিলেন: জগন্নাথ। সে যাই হোক, গুরুদেবের নির্দেশে সে-সময় আমি বিভিন্ন গ্রন্থ বিচার করে শ্রীচৈতন্যদেবের পথ পরিক্রমার একটি সম্ভাব্য মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলাম।

নগেন দত্ত বলেন, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা! ঠিক ওই কাজটিই যে বর্তমানে করানো হচ্ছে জগৎশেঠের অর্থানুকূল্যে। রাজা জগৎ শেঠ সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পদচিহ্নলাঞ্ছিত তীর্থপথটি সংস্কার করাতে চান। আপনি এ-বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন?

রূপেন্দ্র বলেন, এ-বিষয়ে আমার আদৌ কোনও উৎসাহ নেই। শ্রীচৈতন্যদেব যে-পথে জগন্নাথধামে গিয়েছিলেন সেই পথরেখা ধরে একটি রাজপথ নির্মিত হলে আমি খুশিই হব; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হব দেখলে যে, ধনকুবের জগৎশেঠ উৎসাহী হয়েছেন অন্য একটি সামাজিক পথের সংস্কার করতে যে-পথে যুগাবতার যেতে পারেননি; কিন্তু যে-পথে যেতে পারলে খুশি হতেন।

নগেন দত্ত বলেন, বুঝলাম না।

—স্বাভাবিক। এ-বক্তব্যের গূঢ়ার্থ সহজে বোঝা যায় না দত্ত-মশাই। তবে আপনি যে-পথের সন্ধান করছেন, তার ইঙ্গিত পাবেন কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোঁসাই, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এবং মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি পুঁথিতে সন্ধান করলে। মোটামুটি আমার স্মৃতিপটেও আছে — তাম্রলিপ্তি থেকে মেদিনীপুর অতিক্রম করে উনি নারায়ণগড়, দন্তপুর, জলেশ্বর, রেমুণা হয়ে ভদ্রক জনপদে এসেছিলেন। তারপর যাজপুর-পুরুষোত্তমপুর-চৌদ্বার হয়ে শহর কটক। বাকি পথ তো আপনারাই পরিক্রমা করবেন: একাম্রকানন, সাক্ষীগোপাল, আঠারোনালা হয়ে শ্রীক্ষেত্র।

নগেন দত্ত ওঁর হাত দুটি ধরে বলেন, পথের বর্ণনা তো দেখছি আপনার মুখস্থ। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যাবেন? আমাদের জলযানে একশো বাইশজন নরনারী-

pathagar.net

–অধিকাংশ বর্ধমানভুক্তির। সঙ্গে কোনও কবিরাজ নেই! আপনার যদি উপস্থিত কোনও আরব্ধ কাজ না থাকে...

রূপেন্দ্র বললেন, কিন্তু আমি যে বর্তমানে কপর্দকহীন, একবস্ত্রে নগ্নপদে গঙ্গাতীরে বিশ্রাম করছিলাম, এ তো আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন!

নগেন দত্ত বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আজ্ঞে না কবিরাজমশাই! আপনি আদৌ কপর্দকহীন নন। আমাকে ঋণমুক্ত হবার অনুমতি দিলে আমি স্বয়ং এ-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। যাত্রীদলের সকলে আপনার প্রতি আমৃত্যু কৃতার্থ হয়ে থাকবে। যেহেতু আমাদের দলে একজনও চিকিৎসক নেই। ঘটনাচক্রে আপনাদের সোঞাই গ্রামের একজন বৃদ্ধও চলেছেন আমাদের সঙ্গে। গ্রাম সম্পর্কে আপনার খুড়ামশাই — শ্রীদুর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণা। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ গাঙ্গুলীমশায়ের চতুর্থপক্ষটির কথা — রূপেন্দ্রের বাল্যসহচরী মৃন্ময়ী — মীনু। রূপেন্দ্রের চেয়ে নয় বছরের ছোট, প্রতিবেশী পীতাম্বর মুখুজ্জের কন্যা। গুরুগৃহ থেকে বাৎসরিক একমাসের জন্য প্রত্যাবর্তনের নিয়ম ছিল জগন্নাথ পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে — শারদীয় অকালবোধনের সময়। নাহলে পিতামাতা, পরিবার থেকে ছাত্র মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে — এই ছিল ত্রিবেণীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের অভিমত। তাই রূপেন্দ্রও বছরে একবার করে সোঞাই গ্রামে ফিরে আসতেন। বছরে বছরে দেখেছেন মীনুকে — বালিকা থেকে কিশোরীতে রূপান্তরিতা হতে।

"পহিলে বদরিসম, পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে অনঙ্গ আবরিল অঙ্গ"। দুজনের অন্তরের অন্তস্তলে যে রঙ ধরেছিল সেটা উপলব্ধি করা গেল বড় বিলম্বে। উপাধি নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে রূপেন্দ্র দেখেছিলেন নয় বছরের অনুজা মীনু ইতিমধ্যে হয়ে গেছে ওঁর খুড়িমা! রূপেন্দ্র যখন সস্ত্রীক তীর্থ পরিক্রমায় যাত্রা করেন, তখন দুর্গা গাঙ্গুলীর ওই চতুর্থপক্ষের পত্নীটি ছিলেন সন্তানসম্ভবা।

সে-কথাই মনে পড়ে গেল। তাই বললেন, গাঙ্গুলীখুড়ো তীর্থে চলেছেন? এ তো বড় অদ্ভুত সংবাদ। তিনি তো তাঁর তেজারতি কারবার নিয়েই মেতে ছিলেন তিনকুড়ি বছর —কোনদিন গাঁয়ের বাইরে যাননি।

নগেন দত্ত বলেন, জানি। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। সেই আঘাতেই বৃদ্ধ কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন। ডাকব তাঁকে? কথা বলবেন?

রূপেন্দ্র শিউরে উঠেছিলেন মৃন্ময়ীর মৃত্যুসংবাদে। কোনক্রমে বললেন, না! না! না!

নগেন্দ্র সে-আর্তনাদে রীতিমত অবাক হয়ে যান। তিনি তো জানেন না, ওই যুবকটি একই দিনে পেল দু-দুটি নারীর মৃত্যুসংবাদ, যারা-দুজনই ওকে প্রাণাধিক ভালবেসেছিল!

pathagar.net

রূপেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হয়েছেন। এই তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে জগন্নাথক্ষেত্রে যাবেন তিনি। হেতুটা যে কী, তা আন্দাজ করতে পারেননি নগেন্দ্র। এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন মানসিকভাবে রূপেন্দ্র পীড়িত। কী একটা অন্তর্লীন বেদনা গোপনে বহে বেড়াচ্ছেন। সে এমন একটি আঘাত যার ক্ষতচিহ্ন নীরবে নিভৃতে লুকিয়ে রাখতে হয়। সর্বদাই আত্মমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। পূর্বের মতো প্রাত্যহিক পূজা-অর্চনাদি করেন না তিনি — কিন্তু ধ্যান করেন। কথাবার্তা বড় একটা বলেন না কারও সঙ্গে। কখনও কখনও লক্ষ্য করেছেন নগেন্দ্র — ঐ নিঃসঙ্গ নায়কটি মধ্যরাত্রে একা বসে আছেন পদ্মাসনে নৌকার গলুইয়ে। নগেন দত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। হেতুটা জানতে চাননি। ব্রাহ্মণকে আত্মস্থ থাকতে দিয়েছেন। এমনকি তিনি প্রথম দিন যেভাবে দুর্গাচরণের সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন, তাতে সংবাদটা তিনি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছেও গোপন রেখেছেন। কবিরাজমশায়ের যাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জীবনযাপনের উপকরণ লোক পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছেন — ধুতি, পিরাণ, পাদুকা ইত্যাদি।

রূপেন্দ্র জগন্নাথক্ষেত্রে যেতে স্বীকৃত হলেন এ-কারণে নয় যে, পত্নী-বিয়োগে তীর্থ তাঁকে আকর্ষণ করছিল ; এ-কারণে নয় যে, এই নৌকার শতাধিক নর-নারীর অসুখ-বিসুখে তিনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করার নেই। তিনি মনস্থির করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন হেতুতে:

তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। কুসুমমঞ্জরী তাঁকে মুক্তি দিয়ে গেছে। মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁকে পথের ইঙ্গিতও দিয়ে গেছে। যুগাবতার এসেছেন, এখনও প্রকট হননি, এই বিশ্বাসে আজীবন পরশপাথর খুঁজে মরার কোনও অর্থ হয় না। যেটুকু ওঁর ক্ষমতার ভিতর সেটুকুই করবেন। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'! সমাজের দু-দুটি হিমালয়াস্তিক ত্রুটি সম্বন্ধে ব্যথিত হয়েছেন উনি। কিন্তু হিন্দু-সমাজের ওই বিরাট অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ — যাদের জল-অচল, অচ্ছুৎ করে সরিয়ে রেখেছে কূপমণ্ডুক ব্রাহ্মণ্যসমাজ, তাদের নিয়ে আন্দোলন একা-হাতে করা যায় না। অপর ক্ষতটার নিরাময়ের চেষ্টা তিনি নিজেই করতে পারেন। অন্তত শুরু করতে পারেন। নির্যাতিতা নারীসমাজকে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মৈত্রেয়ী গার্গীর যুগ চলে গেছে। বৈদিকযুগের স্ত্রীশিক্ষার দ্বিধারা — ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোদ্বাহা — অবলুপ্ত হয়ে গেছে বহু বহু যুগ অতীতে। বস্তুত, আর্যাবর্তে মুসলমান আগমনের পর থেকেই। তার পূর্বযুগে বৈদিক ও উপনিষদের যুগে পুরুষের মতো স্ত্রীলোকদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ছিল। তাঁদের উপনয়ন হতো, তাঁদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো। যাঁরা আজীবন দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় নিরত থাকার সঙ্কল্প করতেন, তাঁদের বলা হতো 'ব্রহ্মবাদিনী'। তাঁদের পক্ষে আশ্রমিক, চিরকুমারী বা বিগতভর্তা হবার কোনও আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল না। অনেকেই সীমন্তিনী। সংসারধর্ম পালনের অবকাশে তাঁরা

যোগসাধনা করতে পারতেন। রাজবৈভব যেমন রাজর্ষি জনকের সাধনমার্গে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি, ঠিক তেমনি কাশীরাজ-মহিষী মদালসাও স্বামী-সংসার-পুত্র-কলত্র-দাসদাসী পরিবেষ্টিতা হয়েও রাজান্তঃপুরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হতে পেরেছিলেন। পঙ্কসরোবরে ভাসমান রাজহংসীর মতো মহারানী মদালসা রাজবৈভবের মধ্যেও ছিলেন নিষ্কলঙ্ক। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। সীমন্তিনী হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মচারিণী!

এছাড়া ছিল আর এক শ্রেণীর ছাত্রী। তারা ঈশ্বরতত্ত্বের সন্ধানী নয়। তাদের অক্ষর-পরিচয় হতো, কিছুটা ব্যাকরণ, এবং অলঙ্কার, নানা শ্রেণীর কাব্য। সচরাচর প্রাগ্‌বিবাহ কালেই বিদ্যাচর্চার আয়োজন হতো বটে, তবু প্রথম যুগে বিবাহিতা ও বিগতভর্তা অবস্থাতেও কেউ কেউ এ-জাতীয় বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। তাঁদের বলা হতো; 'সদ্যোদ্বাহা'!

এই দু-শ্রেণীর বিদ্যোৎসাহিনী মহিলার দলই প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো নিঃশেষে অবলুপ্ত।

রূপেন্দ্র স্থির করলেন: সেই পরিবেশটি উনি ফিরিয়ে আনবেন। ধর্মপত্নীর কাছে উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কুসুমমঞ্জরীকে ছিনিয়ে নিয়েছেন মহাকাল, কূপমণ্ডূক সমাজপতিদের সাহায্য পেয়ে। তাই রূপেন্দ্র স্থির করলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণ করবেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সোঞাই প্রত্যাবর্তন করে তিনি শুধুমাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। অনেক অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তিনি চিকিৎসক হিসাবে অপরিসীম শ্রদ্ধার মানুষ। 'একবগ্গা ঠাকুর'কে সবাই ভালবাসে। জমিদার ভাদুড়ীমশাই ওঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বিদ্যায়তনটি শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য হবে না, যুবতী এবং বিবাহিতা, বিধবাদের জন্যও! বুদ্ধিমান রূপেন্দ্রনাথ বুঝেছেন, ওঁর এই প্রচেষ্টায় মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামবাসী গোপনে সহানুভূতি জানালেও তাঁকে কূপমণ্ডূক স্মার্তপণ্ডিতদের করতলগত বিরাট সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। তারা যুক্তি বোঝে না, নিজেদের মঙ্গল বোঝে না, সমাজের উন্নতি বোঝে না — বোঝে অর্কফলার আন্দোলন, বোঝে শাস্ত্রবাক্য: 'তট-তট-তট-তোটয়'!

তাই উনি স্বীকৃত হয়েছেন এই তীর্থযাত্রীদলের সহযাত্রীরূপে জগন্নাথধামে যেতে। ওঁর লক্ষ্যস্থল পুরীমন্দিরের সেই ত্রিমূর্তি নয়, সমুদ্রতীরে গোবর্ধন মঠের মঠাধীশ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য।

শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য দশনামী সম্প্রদায়কে একসূত্রে আবদ্ধ করে ভারতবর্ষের চারপ্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। বহুধারায় বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্মকে দশনামী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করার সেই প্রথম প্রয়াস:

দ্বারকাশ্রমে সামবেদাশ্রয়ী সারদামঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: পশ্চিমখণ্ড: সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা এবং কাথিয়াবাড়।

বদরীকাশ্রমে অথর্ববেদাশ্রয়ী যোশীমঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: উত্তরখণ্ড: কুরু, পাঞ্চাল, পঞ্জাব, কাশ্মীর, কম্বোজ এবং গঙ্গা-যমুনার অববাহিকার মধ্যবর্তী আর্যাবর্তের ভূভাগ।

রামেশ্বরমাশ্রমে যজুর্বেদাশ্রয়ী শৃঙ্গেরীমঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: দক্ষিণখণ্ড: অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ঋকবেদাশ্রয়ী গোবর্ধন মঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: পূর্বখণ্ড: অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও পূর্বাঞ্চল।

pathagar.net

ভেষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য গোবর্ধন-মঠাধ্যক্ষ পূর্বাঞ্চলের শঙ্করাচার্য। আদি শঙ্করাচার্য বিধান দিয়ে গেছেন এই চার ধামের চার মঠাধ্যক্ষ সমস্ত ভারতবর্ষে অতঃপর হবেন হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অভিভাবক। ফলে অন্তত পূর্বাঞ্চলে — অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে — হিন্দুসমাজের কাছে 'নিদান' হাঁকার অধিকার গোবর্ধনমঠের শঙ্করাচার্যের। তিনি যদি রূপেন্দ্রনাথকে ভূর্জপত্রে এক স্বীকৃতিপত্র লিখে দেন যে, হিন্দুধর্মে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধ নাই তবে সেই সনদটিই হবে রূপেন্দ্রনাথের অধিকারপত্র। কূপমণ্ডুক সমাজপতি-জোঁকের মুখে ঐ সনদটি হবে লবণের মতো। গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি নিঃসংশয় যে, ভূম্যধিকারী আধুনিকমনা ভাদুড়ীমশাই ওঁকে সমর্থন করবেন। এই বিদ্যায়তনটি হবে স্ত্রীশিক্ষাসদন। শুধু বালিকা নয়, কিশোরী, যুবতী, বিবাহিতা, বিগতভর্তার দলও এসে অনায়াসে ভর্তি হতে পারবে তাঁর স্ত্রীশিক্ষাসদনে। তারা শিখবে প্রাচীন বাংলা হরফ, দেবনাগরী হরফ; পড়বে কৃত্তিবাস থেকে কালিদাস। কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ — না, দর্শন আবশ্যিক পাঠ্য নয়, কিন্তু অঙ্ক, সুদকষা, হিসাবরাখা, এবং সন্তানপালনের আদিপাঠ হবে আবশ্যিক। সোঞ্রাই গ্রামে ওই জয়ধ্বজাটি প্রোথিত করে রূপেন্দ্র যাবেন দিগ্‌বিজয়ে। আদি শঙ্করাচার্য করেছিলেন ভারতবিজয়, উনি করবেন বঙ্গবিজয়। প্রথমে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে। নদীয়ারাজ ওঁর পৃষ্ঠপোষক। জনশ্রুতি তিনি প্রাচীনপন্থী, কিন্তু নিঃসন্দেহে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। রূপেন্দ্র নিশ্চয় পারবেন তাঁকে স্বমতে আনতে। নিশ্চয় তিনি গোয়াড়িতে, শান্তিপুরে, উলায়, নবদ্বীপধামে স্ত্রীশিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠা করবেন। তারপর বর্ধমানরাজ। উত্তরে নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায় (যাঁর দেহাবসানে রানী ভবানী পাঁচ বছরের ভিতরেই হবেন নাটোরের শাসনকর্ত্রী) — তারপর মুর্শিদাবাদে গিয়ে ধরবেন জগৎশেঠকে।

রূপেন্দ্রের মনোগত ইচ্ছা গোবর্ধনমঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক অনুমতিপত্রটি লাভ করার পরে তিনি তাঁর কাছে হিন্দুসমাজের আর একটি মারাত্মক কুপ্রথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন: সতীদাহ। এই নৃশংস লোকাচার তো মুসলমান সমাজে নেই, খ্রিস্টানদের ভিতর নেই। তাদের সমাজে তো বিগতভর্তার দল সসম্মানে টিকে আছে। সমাজের কাঠামো তো কই ভেঙে পড়েনি। তাহলে হিন্দুসমাজেই বা ওই নির্দয় প্রথাটিকে বাঁচিয়ে রাখার কী অর্থ? বৈদিক শাস্ত্রে তো নয়ই, এমনকি পৌরাণিক যুগেও সতীদাহের প্রসঙ্গ সামান্যই। সম্ভবত সেগুলি পরবর্তী যুগের কূপমণ্ডুকেরা সুকৌশলে পুঁথি অনুলিপিকালে যোগ করেছে। তাই প্রামাণিক কোনও শাস্ত্র এ-নির্দেশ দেয়নি যে, স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় তুলে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারতে হবে। এ-বিষয়ে রূপেন্দ্রের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এই কুপ্রথাটি রদ করার বিষয়েও তিনি আগ্রহী। গোবর্ধনমঠের শঙ্করাচার্য যদি উৎসাহ দেখান, তাহলে তিনি ওই প্রস্তাব নিয়ে ভারত-পরিক্রমা করবেন। চার মঠের শঙ্করাচার্য-চতুষ্টয়ের যৌথ সনদ নিয়ে দিল্লীশ্বরের কাছে দরবার করবেন। প্রয়োজনে ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে।

নগেন দত্ত এসব কিছু অনুমান করেননি। রূপেন্দ্রও তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করেননি। নগেন দত্ত ধনী, কিন্তু এসব সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার বিষয়ে

তত্ত্বকথা আলোচনা করার মতো শিক্ষা তাঁর নেই।

দুর্গা গাঙ্গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে; কিন্তু কী-জানি-কেন তিনি রূপেন্দ্রকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। সামান্য কুশল প্রশ্ন করেই অন্তরালে সরে গেছেন। রূপেন্দ্রর মনে হল, তিনি ওঁকে দেখে খুশি হতে পারেননি। দুর্গা যেন কী এক অপরাধবোধে ভুগছেন। কুসুমমঞ্জরীর প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করেননি। রূপেন্দ্র খুড়িমার প্রসঙ্গ তোলার উপক্রম করতেই দুর্গা গাঙ্গুলি বললেন, সে তো ভাগ্যবতী রূপেন — আমাকে ফেলে রেখে সতীলক্ষ্মী ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেল। আমারই ভবিতব্য—

বলেই পাশ কাটালেন।

মীনুর কথা মনে পড়ে। মীনু আর ওঁর পিসতুতো বোন কাত্যায়নী সমবয়সী, বান্ধবী। সেই সূত্রে বালিকা বয়স থেকেই পীতু মুখুজ্জের ওই মেয়েটি — মীনু —এ-বাড়ি আসতো। দিনরাত রূপেন্দ্রের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত। রুপোদার হাত ধরে রথের মেলায়, গাজনের সঙ দেখতে বা পীরপুরে মহরমের তাজিয়া দেখতে গেছে। ঘুমিয়ে পড়লে কোলে করে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। তখন মীনুর বয়স-পাঁচ-ছয়, তাহলে তার রুপোদার কত? চোদ্দ-পনের।

তারপর মীনু যখন মৃন্ময়ী, তখন? মনে পড়ছে আর একদিনের কথা। মীনু তখন একাদশবর্ষীয়া কিশোরী। রঙ-দোলের দিন। মীনু এসেছিল তার রুপোদার বাড়ি কাতুকে রঙ দিতে। কাতু কোথায় বুঝি লুকিয়ে বসেছিল ঘাপটি মেরে। মীনু আনাচে-কানাচে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল রুপোদার। রুপোদার হাতে একটা আবীরের পুঁটলি। দোর আগলে সে বলেছিল, এবার?

বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠেছিল কিশোরী মেয়েটির। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই! কী সর্বনাশ! এখন যদি ওই তালঢ্যাঙা ছেলেটা ওকে বুকে টেনে নেয়! ওর মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে...

দুরন্ত লজ্জায় থমকে থেমে দু-হাতে মুখ ঢেকে মীনু বলে উঠেছিল, ন-না!

রূপেন্দ্রনাথও থমকে থেমে গিয়েছিল। ওর আতঙ্কতাড়িত কচি মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। অবাক বিস্ময়ে জানতে চেয়েছিল, কী ব্যাপার রে মীনু? কাকে এত ভয়? আমাকে না আবীরকে?

মুখ থেকে হাত সরায়নি। ও শুধু পুনরুক্তি করেছিল : ন-না!

রূপেন্দ্রনাথ বলেছিল, দূর বোকা! আবীরের দাগ কি চিরকাল মুখে থাকে? ও তো ধুলেই উঠে যায়।

ছেড়ে দিয়েছিল মীনুকে।

আজ বুঝতে পারেন, মৃন্ময়ী হতাশ হয়েছিল তাতে। বোকা মেয়েটা আশা করেছিল —ঐ তালঢ্যাঙা ছেলেটা ওর আপত্তিতে কান দেবে না। জোর করে বুকে টেনে নিয়ে ওর মুখে, গলায়, বুকে... সেদিন তা বুঝতে পারেননি রূপেন্দ্র।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের — সেই বাল্যসহচরী মৃন্ময়ী — মীনু—আজ অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা।

pathagar.net

অর্ণবপোত ইতিমধ্যে দক্ষিণদিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ঘুসুড়ি, হাওড়া, কালীঘাট, উলুবেড়িয়া অতিক্রম করে রূপনারায়ণের মিলনস্থল। জাহাজের কর্ণধার এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। নদীপথে জাহাজ চালানোতে তার কোনও ভূমিকা নেই। জাহাজের দায়িত্বে আছে 'গাঙ-সারেঙ'। নদীপথে সব কিছু তার নখদর্পণে। সে জানে কোন্ দিকে, কোথায় চড়া পড়েছে, কোথায় ডুবো-চর, আর কোন্ দিকে বড়গঙ্গার গভীরতর খাদ। তার দুই সহকারী জলযানের দু'পাশে বসে ক্রমাগত জল মেপে যাচ্ছে : এক্কাম মে-লে-না; দু'ঝাম মে-লে-না!

রাতে জাহাজ চলে না। তার দক্ষিণাভিমুখে ভেসে-চলা শুধু দিবাভাগে। হাওয়া এখন দক্ষিণ দিক থেকে। ফলে পাল অকেজো। জোয়ারের সময় জাহাজ নোঙর করে রাখতে হয়। শুধুমাত্র ভাঁটার অমোঘ আকর্ষণে জাহাজ এগিয়ে চলে দক্ষিণাভিমুখে কপিলমুনির আশ্রমের দিকে।

জাহাজ যখন নোঙর করা থাকে, তখন শুরু হয় সমবেত হরিসংকীর্তন। যাত্রীদলের বৃকোদরভাগ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। খোল-করতাল সঙ্গে নিয়েই এসেছে তারা। নগেন দত্ত রূপেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন প্রতিদিন কিছু কিছু করে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে, যাতে যে-পথে ওরা যাচ্ছে বা যাবে, তার সম্বন্ধে কিছুটা পূর্ব-পরিচয় হয়ে থাকে। রূপেন্দ্রনাথ কথক নন, তবু তিনি যখন দেখলেন তাঁর শ্রোতার দল অত্যন্ত আগ্রহে তাঁকে বারে বারে অনুরোধ করছে, তখন তিনি স্বীকৃত হলেন। সূর্যাস্তের পর জাহাজ চালানো বিপদজনক। তাই সন্ধ্যায় গাঙ-সারেঙ লোহার নোঙর নামিয়ে দিত। জলযান স্থির হত। অল্প অল্প দুলত মা-গঙ্গার দোলুনিতে। রোজ ওরা দল বেঁধে এসে বসতো — সন্ধ্যার সময়। রূপেন্দ্রনাথ বর্ণনা করতেন শচীনন্দনের প্রথম নীলাচল অভিযানের কাহিনী :

তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর কয়েকজন প্রিয় শিষ্যসহ শান্তিপুর থেকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের তীর্থপথে যাত্রা করলেন। আচার্য অদ্বৈত শহরপ্রান্ত পর্যন্ত এসে প্রাণের ধন নিমাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। সাশ্রুলোচন শান্তিপুরবাসীদেরও ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

সঙ্গে চললেন কয়েকজন মাত্র শিষ্য। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখেছেন :

"নিত্যানন্দ গোঁসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ।।"

BanglaBook.org

ওই সঙ্গে যোগ দিতে হবে শ্রীগোবিন্দ দাস কর্মকারের নাম। কারণ নিজ কড়চায় গোবিন্দদাস লিখেছেন : "প্রভুর সহিত যাই নাচিতে নাচিতে।"

ভাগীরথীর পূর্ব-উপকূল ধরে দক্ষিণাভিমুখে চললেন ওঁরা। কোনও পাথেয় সঙ্গে নেবার অনুমতি ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি শুধু সন্ন্যাসদণ্ড, করঙ্গ, কৌপীন আর বহির্বাস। জীবনধারণের আর কী উপকরণ চাই? আহার?

"প্রভু যারে যে দিনে বা না লিখেন আহার।
রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার।।"

চরিতকারেরা শান্তিপুর এবং আঁটিসারার মধ্যবর্তী স্থানগুলির কোনও উল্লেখ করেননি।

এইখানে কিছু ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এ পথের সন্ধান কোথা থেকে কী করে পেলাম। সেটি পেয়েছি বর্তমান লেখকের অনুজপ্রতিম ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দের গ্রন্থে। অচ্যুতানন্দ অনুমান করেছেন ভাগীরথীর পূর্ব তীর দিয়ে "ত্রিবেণী, নৈহাটি, খড়দহ, পানিহাটি, চিত্রপুর, কালীঘাট, চূড়াঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রসা গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহীনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর পার হয়ে প্রভু বারুইপুর গ্রামের কাছে আঁটিসারায় এসে উপস্থিত হলেন।"

চৈতন্যভাগবত এসব স্থানের উল্লেখ করেননি। সংক্ষেপে বললেন, "উত্তরিলা আসি আঁটিসারা নগরেতে।"

আঁটিসারা গঙ্গাতীরের অতি প্রাচীন একটি গ্রাম। বর্তমান নাম আটঘরা। বারুইপুরের পুরনো বাজারের ভিতর দিয়ে দেড়-দু'মাইল এগিয়ে গেলে লুপ্তস্রোতা গঙ্গার মরা খাত এখনো দেখা যায়। তার পলিমাটির স্তরের নিচে এখানে প্রাচীন রোমক, মুদ্রা, মৌর্য ও কুষাণযুগের তৈজস ও পোড়ামাটির যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই আঁটিসারা গ্রামে প্রভু মিলিত হয়েছিলেন তাঁর পরমভক্ত অনন্তরাম পণ্ডিতের সঙ্গে। মিলনস্থলে একটি চৈতন্যমন্দির আজও বর্তমান। এখনও বৈশাখ মাসে সেই অনন্তরামের শ্রীপাটে পক্ষকালব্যাপী মেলা হয়, অষ্টপ্রহর চলে নামসঙ্কীর্তন।

শ্রীচৈতন্য অতঃপর গঙ্গার তীর ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে চলেছেন। পশ্চিম পাড় নয়, পূর্ব পাড়। চৈতন্যের সমকালীন গৌড়াধিপতি নবাব হুসেন শাহর রাজ্যের দক্ষিণতম সীমা ছিল 'ছত্রভোগ'। চৈতন্যদেব নামগান করতে করতে এগিয়ে চলেছেন সেই ছত্রভোগের

দিকে। পথে গঙ্গাতীরের যেসব জনপদ পড়ল, আজ তারা হুগলি নদী থেকে অনেকটা দূরে। কারণ ভাগীরথীর জলধারা সরে গেছে। গৌরসুন্দরের পদরজধন্য সেই সব জনপদের নাম : বারুইপুর, দক্ষিণ বারাসাত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটি। শেষ সীমান্ত : ছত্রভোগ।

"এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতূহলে।।"

সে-আমলে ছত্রভোগের জমিদার ছিলেন রাজা রামচন্দ্র খান। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় চৈতন্যদেব গঙ্গার ওপারে, অর্থাৎ পশ্চিমপারে যাবার চেষ্টা করলেন। কাজটি কঠিন। এখানে গঙ্গার বিস্তার ভয়ানক — ঢেউ প্রচণ্ড; কিন্তু আসল বিপদ রাজনৈতিক। গঙ্গার পশ্চিমপার উৎকলরাজের শাসনাধীন। চৈতন্যদেবের সমকালীন গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ্‌র সঙ্গে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত নেই। এপারের মানুষ ওপারে যায় না। ওপারের লোক এপারে আসে না।

তবু রাজা রামচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় একটি বড় নৌকার আয়োজন হল। স্থির হল রাতারাতি নৌকায় যাত্রীরা ওপারে যাবেন। শান্তিপুর থেকে আঁটিসারা পদযাত্রার বর্ণনা পদকর্তারা অধিকাংশই সংক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু এই গঙ্গা পারাপারের বর্ণনায় প্রায় সকল কবিই বাড়ায়।

বিভিন্ন কড়চা অন্বেষণ করে চৈতন্যসেবক অনুজপ্রতিম ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দ গঙ্গা পারাপারের যে বর্ণনাটি দিয়েছেন *(নীলাচল অভিসার)* তারই সংক্ষিপ্তসার এখানে লিপিবদ্ধ করি। ধরে নেওয়া যাক, নগেন দত্তের অর্ণবপোতে যাত্রীদলের কাছে আমাদের কাহিনীর নায়ক রূপেন্দ্রনাথও এই বর্ণনা দিয়েছিলেন :

ছত্রভোগের রাজা রামচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এক ভক্ত ব্রাহ্মণের ভদ্রাসনে সশিষ্য চৈতন্যদেবের আতিথ্যের ব্যবস্থা হয়েছে। ভক্তের ভিটায় ঘর মাত্র দুটি। এতগুলি শিষ্যের শয়নব্যবস্থা কী করে হবে? ওঁরা স্বামী-স্ত্রী বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেও। আহারের আয়োজনই বা কী করবেন? সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন নিত্যানন্দ। বিব্রত ভক্ত বৈষ্ণব দম্পতিকে অন্তরালে টেনে এনে বললেন, শয়নের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছেন কেন? আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। চাঁদের আলোয় আমরা তো সারারাত আপনার প্রাঙ্গণে নামগান করব। আপনি বরং তুলসীমূলে কিছু আলপনা দেবার ব্যবস্থা করুন। আর একটি কাংসপাত্রে কিছু বাতাসা — 'হরির লুট' দিতে হবে তো!

ব্রাহ্মণ প্রতিবাদে কী যেন বলতে গেলেন। বলা হল না। তার পূর্বেই ভেসে এল সমবেত নামগান :

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।

ব্রাহ্মণ তবু কিছু বলতে গেলেন। ফলে ধমক খেতে হল প্রভু নিত্যানন্দের কাছে : কেমনতর বৈষ্ণব আপনি? নামগান শুরু হয়ে গেছে — এখনও আহার-নিদ্রার কথা চিন্তা করছেন?

ব্রাহ্মণীর দিকে ফিরে বললেন, আপনি মা, ওই আলপনা আর বাতাসার ব্যবস্থাটুকু করে দিন শুধু। বাদবাকি দায়দায়িত্ব এই ছেলের উপর দিয়ে যান।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে সম্মতি জানিয়ে ব্রাহ্মণী ছুটলেন অন্দরে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এলেন রাজা রামচন্দ্র। পণ্ডিত জগদানন্দকে জনান্তিকে টেনে নিয়ে এসে বললেন, নৌকা প্রস্তুত। এই শেষ রাত্রিই প্রশস্ত সময়, সেই সময় উৎকলী প্রহরীদের একাগ্রতা স্বাভাবিকভাবেই শিথিল হয়ে যায়। ওরা নিদ্রা যায়। প্রভু সশিষ্য হয়তো অলক্ষিতে ওপারে পৌঁছে যেতে পারবেন।

পণ্ডিত জগদানন্দ হেসে বললেন : প্রভু জগন্নাথদর্শনে যাচ্ছেন — সেটা কোনও চৌরকার্য নয়। তবু শুধু হাতি-নারায়ণের কথা শুনলেই তো চলবে না, মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হবে। আমি প্রভুকে নিয়ে এখনি রওনা হব।

রাত্রির তৃতীয় যামে তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গা পার হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন : নৌকায় উঠেও প্রভুর সশিষ্য নামসঙ্কীর্তন থামতে চায় না। নৌকা উথাল-পাথাল দুলছে, যতটা ঢেউয়ের দাপটে তদোধিক যৌথ নর্তনকুর্দনে।

"অবুধ নাইয়া বোলে হইল সংশয়
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয়।।...
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই
তাবত নীরব হও সকল গোঁসাঞি।।"

চৈতন্যদেব যে ঘাট থেকে গঙ্গা পার হয়েছিলেন, তাকে কেউ বলেছেন 'প্রয়াগঘাট', কেউ 'গঙ্গাঘাট'। সম্ভবত সেটা বর্তমান কুলপির কাছাকাছি। গঙ্গাঘাট নামে একটা গ্রাম ওই অঞ্চলে এখনো আছে, কিন্তু ভাগীরথী সেখানে নেই। এর কাছাকাছি ছিল তিন-তিনটি নদীর সঙ্গম : সরস্বতী, দামোদর আর মন্ত্রেশ্বর (বর্তমান রূপনারায়ণ)। তাই এর আর এক নাম : প্রয়াগঘাট।

'তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য'-গ্রন্থের লেখক ভূপতিরঞ্জন দাস লিখছেন, "রেনেলের মানচিত্র দৃষ্টে মনে হয়, মহাপ্রভুর সময়ে ছত্রভোগের কাছ থেকে বেশ প্রশস্ত নাব্য একটি খাড়ি বর্তমান তারানগর ও গঙ্গাধরপুরের পাশ থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে কাকদ্বীপের সামান্য দক্ষিণে বুধোখালির কাছে মুড়িগঙ্গা বা বারাতলা নদীতে মিশেছিল ও সাগরদ্বীপের মাঝামাঝি ফুলডুবি খাল ছিল অতি প্রশস্ত। সম্ভবত মহাপ্রভুর নৌকা ছত্রভোগ থেকে এই পথে গিয়ে মেদিনীপুরের কন্টাই মহকুমার রসুলপুর নদীতে প্রবেশ করে।... তিন নদীর সঙ্গম বলে সম্ভবত বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই স্থানটিকে প্রয়াগঘাট বলেছেন।"

...প্রথম সন্ধ্যায় কথকঠাকুর রূপেন্দ্রনাথ এখানেই থামলেন — অর্থাৎ প্রভুকে উৎকলরাজ্যে নামিয়ে দিয়ে। সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে : জয় গৌর! জয় নিতাই!

তারপর শুরু হয়ে যায় খোল-করতাল সহযোগে নামসঙ্কীর্তন।

ইতিপূর্বে একদিন দেখেছিলেন। সন্দেহ ছিল। তাই রূপেন্দ্রনাথ পুনরায় তৃতীয় সারির সেই নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে দৃকপাত করলেন। দেখলেন এখন আর অবগুণ্ঠনবতীর মুখটি দেখা যাচ্ছে না।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে পড়েন। নিজের কক্ষে চলে যান। মেয়েটিকে — বলা উচিত 'মহিলাটি'কে — ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়নি। সচেতনভাবেই হোক অথবা ঘটনাচক্রেই, সে বসেছিল একটু পিছনে, তৃতীয় সারিতে, একটা আলো-আঁধারি পরিবেশে। শ্রীচৈতন্যের 'নীলাচল অভিসার' বর্ণনা করতে করতে উনি বারে বারেই শ্রোতৃবৃন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। অধিকাংশই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। দু-চারজন তরুণ-তরুণী। অনেকেরই নাকে রসকলি, মালা-চন্দনে বৈষ্ণব রূপটা প্রকটিত। দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওই সধবা মহিলাটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কথকের দিকে। চোখাচোখি হতেই অবগুণ্ঠন টেনে দেয়।

রূপেন্দ্র রীতিমত চমকে উঠেছেন। প্রথম দৃষ্টিভ্রমে ওঁর মনে হয়েছিল ও কুসুমমঞ্জরী! তাই ওঁর চমকটা বেশ জোরদার। মেয়েটি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ফেলার পরমুহূর্তেই ওঁর মনে হল — ও কুসুমমঞ্জরী নয়, হতে পারে না। তবে তার মুখের সঙ্গে ওই মেয়েটির মুখের আদলে কোথায় যেন মিল আছে — তাই এত চেনা-চেনা লাগছে। না, চিত্তচাঞ্চল্য কিছু হয়নি — রূপেন্দ্রনাথের আত্মসংযম অত লঘু নয়। তবে দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল : কে ওই মেয়েটি? কেন ওকে মনে হল এত চেনা-চেনা। রোগিণী হিসাবে কি কোথাও ওর চিকিৎসা করেছেন? মনে করতে পারলেন না।

উড়িষ্যায়, অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর জেলায়, প্রবেশ করে চৈতন্যদেব বুঝলেন, রাজপথ ধরে অগ্রসর হওয়ায় নানান জাতের অসুবিধা। গৌড় থেকে শ্রীক্ষেত্রে যাবার সে-কালীন ওই রাজপথের নাম ছিল 'জগন্নাথ সড়ক'। অসুবিধা দুই জাতের। প্রথমত এই সময় উৎকল-অধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের সঙ্গে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের যুদ্ধ চলছে। জগন্নাথ সড়কে অতর্কিতে দু-পক্ষের সৈন্যদলই মাঝে মাঝে এসে পড়ে। হাতি-ঘোড়া-পদাতিকের কোলাহল। তীর্থযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে অশ্বারোহী রাজপুরুষেরা ঘোড়া ছোটায়। দ্বিতীয়ত, এ-পথে 'দানীর' অত্যাচার। 'দানী' অর্থে উড়িষ্যা রাজার পক্ষে 'পথকর' আদায়কারী। পদকর্তারা অনেকেই এই 'দানী'দের অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐসব কারণে 'জগন্নাথ সড়ক' পরিহার করে চৈতন্যদেব অরণ্যপথে বা গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে চলতে থাকেন।

শিয়াখালা গ্রামের মধ্য দিয়ে ওঁরা এসে উপনীত হলেন রূপনারায়ণ নদের তীরে

তাম্রলিপ্তে। নদের তীরে কপালমোচন তীর্থে মায়ের মন্দির। বাহান্নপীঠের একপীঠ, 'বর্গভীমা' মায়ের মন্দির। তাম্রলিপ্তি অতি প্রাচীন বন্দর। খ্রিস্টপূর্ব প্রাগশোক যুগেও ছিল তার প্রসিদ্ধি। শোনা যায়, এই তাম্রলিপ্তি বন্দরে নির্মিত জাহাজ নিয়ে, এখান থেকেই বাংলার নৃপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সিংহলদ্বীপ জয় করেন। আন্দাজ করা হয়, সময়টা ভগবান বুদ্ধের

মহাপরিনির্বাণের সমকালীন। বিজয়সিংহের এই সিংহলবিজয় কাহিনীটি সবিস্তারে আঁকা আছে অজন্তার দ্বিতীয় গুহাবিহারে।

বর্গভীমা মূর্তিতে আছে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের দেবী উগ্রতারার ছাপ। হিন্দুদের তন্ত্রমতে, এই শক্তিপীঠে পতিত হয়েছিল সতীর বাম গুল্ফ। দেবীর নাম ভীমরূপা; ভৈরব : কপালী।

রায়গুণাকর কবি 'অন্নদামঙ্গল'-এ লিখেছেন:

"বিভাষেতে বাম গুল্ফ ফেলিলা কেশব
ভীমরূপা ভৈরবী আর কপালী ভৈরব।।"

শ্রীচৈতন্য যে শিয়াখালার পথে তমলুকে এসেছিলেন তার প্রমাণ শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায়:

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবনদ পার হৈঞা
উত্তরিলা তমোলিপ্তে সেয়াখালা দিয়া।।

এখানে 'দেবনদ' কিন্তু রূপানারায়ণ নয়, দামোদর। গোবিন্দদাসের কড়চায়, ওঁরা হাজিপুর গ্রামের পথে তমলুক থেকে এসে উপনীত হলেন মেদিনীপুর। কংসাবতী নদীর তীরে ধনবান বণিক কেশব সামন্ত চৈতন্যদেবের সঙ্গে কৌতুক করতে এসেছিল। গোবিন্দদাস বর্ণনা করেছেন, কীভাবে কেশব সামন্তকে প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়ে 'হরিনামসর্বস্ব' করে প্রভু শ্রীক্ষেত্রের পথে রওনা হলেন। নারায়ণগড়েও ঘটল একই ঘটনা: বীরেশ্বর আর ভবানীশঙ্কর নামে দুই মহাধনী সহোদর ভ্রাতা চতুর্দোলায় চেপে প্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁরাও কৃষ্ণপ্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ হলেন। চতুর্দোলা ফিরে গেল। ওঁরা আখড়ায় রয়ে গেলেন।

নারায়ণগড়ের পরবর্তী স্থান: দন্তপুর।

'দন্তপুর'-এর মহিমা অতিপ্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার 'দাঁতন' কড়চা-বর্ণিত 'দন্তপুর' হতে পারে; কিন্তু 'মহাভাষ্য' প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে যে 'দন্তপুর'-এর বর্ণনা আছে, এই দাঁতন বোধ হয় তা নয়।

আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকে মগধসম্রাট মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। তার পূর্ব যুগ থেকেই অর্থাৎ খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকেই কলিঙ্গের রাজধানী ছিল দন্তপুর। 'কুরুধম্ম জাতক' এবং 'মহাভাষ্যে' একথা বলা আছে। বুদ্ধশিষ্য ক্ষেম বুদ্ধদেবের চিতা থেকে সংগৃহীত একটি শ্বদন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত সেই দাঁতটির উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। সুদীর্ঘকাল ঐ স্তূপে বুদ্ধদেবের শ্ব-দন্তটি পূজিত হতে থাকে। কথিত আছে — ওই দন্তের প্রভাবে কলিঙ্গরাজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ ঘটতে থাকে। তাই দেখে মগধরাজ ওই শ্ব-দন্তটি স্বীয় রাজধানী পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। করদরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রতিবাদ করতে পারেননি। কাহিনী অনুসারে — কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন ধর্মমতে বৌদ্ধ। অথচ তাঁর সম্রাট মগধরাজ ছিলেন শৈব। ওই শ্ব-দন্তটি পাটলিপুত্রে নিয়ে আসার পর মগধসম্রাটের মতিগতির পরিবর্তন হতে থাকে। তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন হয়ে যান। ইতিমধ্যে ওই দন্ত-বিষয়ে নানান অলৌকিক কাণ্ডও ঘটতে থাকে। ফলে সম্রাটের ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সভাসদেরা দন্তটিকে বিদায় করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। কাহিনী মতে, কলিঙ্গরাজ গুহাশিবের কন্যা হেমবালা এবং জামাতা, উজ্জয়িনীর রাজপুত্র (তাঁর নামই হয়ে যায় দন্তকুমার), ওই অমূল্য শ্ব-দন্তটি সিংহলে পাচার করেন। তাঁরা ওই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন, যে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বোধিদ্রুমের চারা নিয়ে যান সিংহলে। এই কাহিনী অনুসারে সিংহলের অনুরাধাপুরের জগদ্বিখ্যাত স্তূপের ভিতরে রাখা আছে গৌতমবুদ্ধের সেই শ্ব-দন্তটি।

দন্তপুরের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কানিংহ্যামের মতে, গোদাবরী-তীরবর্তী রাজমহেন্দ্রী ছিল সেই প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী এবং দন্তপুর হচ্ছে নীলাচল বা পুরীধাম।

দন্তপুর থেকে জলেশ্বর, বাঁশদহ, রেমুণা, ভদ্রক হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব সশিষ্য এসে উপনীত হলেন যাজপুরে। বিরজাদেবীর পীঠস্থান এই যযাতিপুর। এখানে উপনীত হয়ে সকলে যখন রাত্রের মতো বিশ্রামের ঠাঁই খুঁজছেন তখন কাউকে কিছু না জানিয়ে চৈতন্যদেব সহসা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে প্রভুর দর্শন না পেয়ে ভক্তেরা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অন্তর্যামী। সঙ্গীদের ব্যাকুলতা দেখে তাঁদের বললেন — তোমরা ব্যাকুল হয়ো না। প্রভু আজ বিশেষ কারণে অপ্রকট হয়েছেন। আগামীকাল এখানেই আমরা তাঁকে পাব।

"আজি থাকি, কালি প্রভু আইব এথাই।।"

...এই পর্যন্ত বর্ণনা করে কথকঠাকুর — রূপেন্দ্রনাথ — সহসা থেমে গেলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল: অতঃপর ওদের সেই প্রশ্নটাই বাঙ্ময় হয়ে উঠল প্রথম সারিতে উপবিষ্ট নগেন দত্তমশায়ের কণ্ঠে: তারপর কী হল?

রূপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন, আজ এই পর্যন্তই! আগামী কাল আমরা এখানেই তাঁকে পাব — "আজি থাকি, কালি প্রভু আইব এথাই।।"

কথকের দৃষ্টি পতিত হল শ্রোতৃবৃন্দের একটি বিশেষ একান্তে। কপাটের আড়াল থেকে একজন বিশেষ শ্রোত্রী তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। তাঁর সর্ববিয়ব দরজার কপাটের আড়ালে, শুধু অনবগুণ্ঠিত মুখখানি দেখা যায়। তন্ময়তাজনিত কারণে তার অবগুণ্ঠন যে কখন খসে পড়েছে তা সে নিজেও জানতে পারেনি। রূপেন্দ্র দেখলেন, মেয়েটি সধবা, তার কপালে কুমকুমের টিপ, সিঁথিতে সিন্দুর, স্বর্ণমণ্ডিত কর্ণাভরণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা।

উনি নিশ্চিত: মহিলাটি ওঁর পরিচিত। সুপরিচিত। শুধু রোগিণী হিসাবেই ওর সান্নিধ্যে আসেননি।

নিঃসন্দেহ হলেন যখন সম্বিত ফিরে পেয়েই মেয়েটি অবগুণ্ঠনের আড়ালে আত্মগোপন করল। মহিলাটি ওঁর পূর্বপরিচিতা, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক সে আত্মপ্রকাশ করতে অনিচ্ছুক! আলো-আঁধারিতে প্রতিদিন সে এসে বসছে ইচ্ছা করেই — যাতে কথকঠাকুর তাকে চিনতে না পারেন! কেন?

পরদিন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল অভিসারের বর্ণনা করতে বসে রূপেন্দ্রনাথ দর্শকমণ্ডলীর ভেতর সেই বিশেষ মেয়েটিকে সনাক্ত করতে পারলেন না। প্রতিদিন সে ঠিক একই স্থানে এসে বসত। কপাটের আড়ালে। নিজে অন্ধকারে থেকে লক্ষ্য করত কথককে। গতকাল মহিলাটির অসতর্কতায় ক্ষণিকের জন্য হলেও চার চোখের মিলন হয়েছিল। আজ তাই সেখানে অন্য একজন অনবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া। মেয়েটি কি বুঝতে পেরেছে যে, উনি তাকে দর্শকদলে অন্বেষণ করেন? তাই যদি হয়, তাতে কুণ্ঠার কী আছে? যদি সে ওঁর পরিচিতা হয়, তাহলে এগিয়ে এসে সে তো স্বচ্ছন্দে ওঁকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিতে পারে। সর্বসমক্ষে সেটা করতে সঙ্কোচ হলে সে তার স্বামীকে বলতে পারে। আঠারো-বিশ বছরের একটি সধবা রমণী একা-একা তীর্থদর্শনে যাচ্ছে না নিশ্চয়! তাহলে?

—বলুন, কোবরেজ মশাই? ঠাকুর যাজপুরে এসে অপ্রকট হলেন কেন?

রূপেন্দ্র বললেন, সে-কথাই আজ বলব। আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, জীবনে এমন

একটা পর্যায় আসে যখন মানুষে আত্মগোপন করতে চায়। ধরুন, আপনি আমাকে চেনেন, খুব ভাল ভাবেই চেনেন। আপনাতে-আমাতে একদিন অনেক কথা হয়েছে, হয়তো প্রাণের কথাও। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, সর্বসমক্ষে আপনি সে-কথা স্বীকার করতে পারছেন না। তখন আপনি আড়ালে সরে যাবেন। একবারও ভেবে দেখবেন না, সেজন্য আমি কী পরিমাণে ব্যথিত হচ্ছি। হয়তো আমি আপনাকে চিনতেও পেরেছি, তাই আপনার ঐ দূরে সরে যাওয়া আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক হচ্ছে। আমি ভাবছি: লোকলজ্জাটাই বড় হল! আমাদের ভালবাসাটা নয়?

নগেন দত্ত বসেছিলেন সামনে। প্রশ্ন করেন, হঠাৎ এ-কথা বলছেন কেন, কোবরেজমশাই? ঠাকুরের কি তেমন কোনও সমস্যা হয়েছিল?

—আমি জানি না। কী কারণে যাজপুরে গৌরাঙ্গদেব প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন তার কোনও কৈফিয়ৎ নেই। পরদিন সকালে সত্যিই গোরাচাঁদ এসে হাজির। হারানো মানিক ফিরে পেয়ে সবাই হরিধ্বনি দিয়ে ওঠে। প্রভু নিত্যানন্দ বলেন, তোমরা দেখলে তো! আমি বলেছিলাম!

এই রহস্যময় সাময়িক অন্তর্ধানের কথা অনেকেই বলেছেন। স্পষ্ট না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছেন কৃষ্ণদাস গোঁসাই, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত বা গোবিন্দ দাস কর্মকার। কিন্তু কার্যকারণ-সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু লেখেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীজয়ানন্দ মিশ্রের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল':

"চৈতন্য গোঁসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেতে পলাইয়ে গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে।।
সেই বংশের পরম বৈষ্ণব কমললোচন নাম।
পূর্ব জন্মের তপে গোঁসাঞি তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।।"

জয়ানন্দ মিশ্র বয়সে চৈতন্যদেবের ছাব্বিশ বছরের অনুজ। তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ শিষ্য নন, অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি গৌরসুন্দরের স্নেহধন্য। বস্তুত, তাঁর পিতৃদত্ত নাম 'জয়ানন্দ' নয়, এ নাম চৈতন্যদেবের দেওয়া। জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে। কিন্তু তাঁর রচনা নানান ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি শ্রীচৈতন্যের সাময়িক আত্মগোপনের হেতুটি যথার্থ বর্ণনা করতে পেরেছিলেন:

গৌরাঙ্গদেবের পূর্বপুরুষেরা উৎকলখণ্ডের যাজপুরে বসবাস করতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের (যাঁর উপাধি ছিল ভ্রমর) অত্যাচারে পণ্ডিত মধুকর মিশ্র সপরিবারে যাজপুর থেকে পালিয়ে পূববাংলার শ্রীহট্টে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা উৎকলবাসী, মাত্র কয়েক পুরুষ তাঁরা শ্রীহট্টে এসে বাঙালি হয়েছেন। মধুকর মিশ্রের বংশধর, নিমাই পণ্ডিতের পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র আবার শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, নবদ্বীপে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর নিমাই পণ্ডিত শ্রীহট্টে গমন করেন এবং সেখানে কয়েকমাস পিতৃকুলের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যা বিতরণ করেন। সেখান

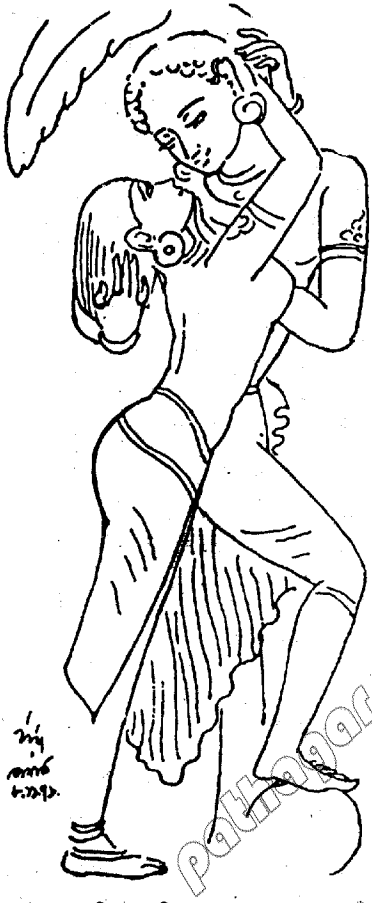

থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে নিমাই পণ্ডিত জানতে পারেন যে, তাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে।

পদকর্তা জয়ানন্দ জানাচ্ছেন যে, শ্রীচৈতন্যের জনককুলের এক জ্ঞাতিভ্রাতা পরমবৈষ্ণব

pathagar.net

কমললোচন মিশ্র যাজপুরেই বসবাস করতেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর সংসারাশ্রমের আত্মীয়তা স্বীকার করে লৌকিক সৌজন্য দেখানো নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি ? ঈশ্বরের অবতার পরমভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তেমনই এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। প্রেমের অবতার পরমবৈষ্ণব কমললোচনকে কৃপা করতে চান, তার আতিথ্যগ্রহণ করতে চান, তার স্বহস্তে প্রস্তুত শাকান্ন গ্রহণ করতে চান — হেতু এ নয় যে, কমললোচন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা, পরন্তু কমললোচন পরমভক্ত ! কিন্তু এই তত্ত্বকথাটা সাধারণ বুদ্ধির শিষ্যদল বুঝতো না। তারা এটাকে অজুহাত দেখিয়ে ব্রাত্য হবার কৈফিয়ৎ খুঁজতো। হয়তো — এ আমাদের অনুমান মাত্র — হয়তো তাই, ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য করুণার অবতার অপ্রকট থেকে দুই কূল রক্ষা করলেন। গৌরাঙ্গসুন্দরকে স্বহস্তপক্ক শাকান্নে সেবা করে কমল তার মানবজীবন সার্থক করল। শিষ্যরাও কিছু জানল না। অর্থাৎ লাঠিটাও ভাঙল না, সাপটাও — না, মরল না, নির্বিষ হয়ে গেল মাত্র !

এদিন সন্ধ্যায় কথকঠাকুর নিমাই সন্ন্যাসের অনুগামী হয়ে মানসভ্রমণে যাজপুর থেকে এলেন পুরুষোত্তমপুর। সেখান থেকে চৌদ্বার হয়ে মহানদী তীরের বন্দর কটক। বললেন, কটক থেকে জগন্নাথক্ষেত্রের পথ-বর্ণনা আমি জাহাজে বসে করব না। সে-পথে আপনারা পদব্রজে যাত্রা করবেন। সম্ভবত কটকের পর চার রাত আমাদের চটিতে, যাত্রীনিবাসে বা মন্দির-প্রাঙ্গণে কাটাতে হবে—একাম্রকানন, সাক্ষীগোপাল, কমলপুর যাত্রী-আবাসে সন্ধ্যা কাটাতে সেসব তীর্থের মহাত্ম্য বর্ণনা করব। আমরা এখানেই আসর ভাঙছি। কালই আমরা সমুদ্রে পড়ব। সেখানে জাহাজ খুব দুলবে, এমন স্থির হয়ে বসে গল্প করার হয়তো অবকাশ থাকবে না।

রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। অনেকেই ব্রাহ্মণের পদধূলি নিতে এগিয়ে এল। অভ্যাসমতো উনি সমভঙ্গে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলতে থাকেন, ওঁ নমঃ নারায়ণায় !

সহসা লক্ষ্য হল, অন্ধকার থেকে অবগুণ্ঠনবতী একজন সধবা এগিয়ে আসছে। তার পরিধানে সেই বাসন্তী রঙের রুক্ষাপাড় মুর্শিদাবাদী রেশমের শাড়িখানাই — যা ওঁর পরিচিত। মেয়েটি ওঁর কাছাকাছি এসে স্পর্শ-বাঁচানো একটি প্রণাম করল গলায় আঁচল দিয়ে। রূপেন্দ্র নিমীলিত নেত্রে যথারীতি উচ্চারণ করলেন : ওঁ নমঃ নারায়ণায়।

মেয়েটির আজ কী যেন হয়েছে ! সন্ন্যাসজীবনের নিয়মবিরুদ্ধ জানা সত্ত্বেও প্রেমের ঠাকুর ভক্তের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন — তাঁর মানবজন্ম সার্থক করেছিলেন শুনেই বোধহয় সে আজ আর স্থির থাকতে পারেনি। সর্বসমক্ষে মাথার ঘোমটা অল্প একটু সরিয়ে দিয়ে বললে, রূপোদা ! বৌঠান কোথায় ?

সে-কণ্ঠস্বরে বজ্রাহত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হলেন মুহূর্তে। দুই বলিষ্ঠ মুঠিতে ওর দুই বাহুমূল চেপে ধরে বললেন, মীনু ! তুই বেঁচে আছিস্ ?

দৃঢ়হস্তে ওর দুই বাহুমূল ধরে আছেন বলেই ও ভূলুণ্ঠিতা হল না। না হলে ওর পদযুগল ঠিক সেই মুহূর্তে বেপথুমান দেহটি হয়তো ধরে রাখতে পারত না।

হাঁ-হাঁ করে ওপাশ থেকে শশব্যস্তে ছুটে আসেন দুর্গা গাঙ্গুলী। ধরে ফেলেন স্ত্রীর

পতনোন্মুখ দেহটি। বলেন, ছি, ছি, ছি, ছি! ও কী করছো ছোটবউ? রুপোকে কি পেন্নাম করতে আছে? তুমি যে ওর খুড়িমা!

মৃন্ময়ী ততক্ষণে সামলেছে। দুই পুরুষের মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। অবগুণ্ঠনে পুনরায় ঢেকেছে আরক্তিম আনন।

রূপেন্দ্র দুর্গা গাঙ্গুলীর দিকে ফিরে বললেন, তাহলে সেদিন কেন বললেন: 'তোমার খুড়িমা ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন?'

অনেকেই ঘটনাটা লক্ষ্য করেছে, পিছনের দিকের মানুষজনও আন্দাজ করেছে ওখানে কৌতুককর কিছু ঘটছে। সকলে ঘনিয়ে আসে।

দুর্গা আমতা-আমতা করেন, কী আশ্চর্য! সে তো তোমার বড়-খুড়িমা, মানে শোভার মা। ছোট-বউ সগ্যে গেছে তা আমি মুখ ফসকেও বলিচি?

রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেন মৃন্ময়ী পায়ে পায়ে অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইছে। উনি বললেন, বুঝেছি!

একজন বর্ষীয়সী মহিলা রূপেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, ওই মেয়েটি কি তোমার খুড়িমা? ওই যে এখনি তোমারে পেন্নাম করল?

রূপেন্দ্র বললেন, ও সম্পর্কে আমার ছোট বোন।

—তাইলে ওই বামুনঠাকুর কেন বললেন, ও তোমার খুড়িমা?

এবার মহড়া নিতে এগিয়ে এলেন রীতিমতো বৃদ্ধা একজন। সাড়ে তিন-কুড়ি পাড়ি দিয়েছেন বিধবা। এগিয়ে এসে বর্ষীয়সীকে ধমক দিয়ে ওঠেন, তোমার মাথায় গোবর পোরা, কায়েত-বউ। বুঝলে না? ওই মেয়েটি আমাদের কথকঠাকুরের সম্পর্কে ছোট বোন, আর ওই তিন-কাল-গে এককালে-ঠেকা বুড়োটা তারে তৃতীয়পক্ষ করেচে। কী গো বুড়ো বামুনঠাকুর? ঠিক বলিচি তো? তৃতীয়? নাকি চতুর্থ?

দুর্গা গাঙ্গুলী ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। রূপেন্দ্রও পিছন ফিরে নিজের ঘরের দিকে চলতে শুরু করেছিলেন। তবু শুনতে পেলেন কায়েতগিন্নির প্রশ্নটা, তা যাই বল কেনে বাঁউনদিদি, খুড়িমা যখন একবার হয়ে গেচে তকন আর পুরনো সম্পক্যের জের টেনে ওর পেন্নাম করাটা ঠিক হয়নি। ধম্মে তা সইবে না!

বামুনদিদির অন্তিম নিদানটাও তাঁর কানে যায়: তুই আর আমারে ধম্মো শোনাতে আসিস না, কায়েতবউ! সন্নেসী হয়েও প্রেমের ঠাকুর যদি পুরনো সম্পক্যের জের টেনে জ্ঞাতিভাইয়ের শাকান্ন সেবা করতে পারেন তাইলে ওই আবাগী ঘাটের মড়ার বউ হবার অপরাধে দাদারে এট্টা পেন্নাম করতেও পারবেনি? এটা তোর কোন পণ্ডিতের বিধেন? অ্যাঁ?

রূপেন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করে দেন।

pathagar.net

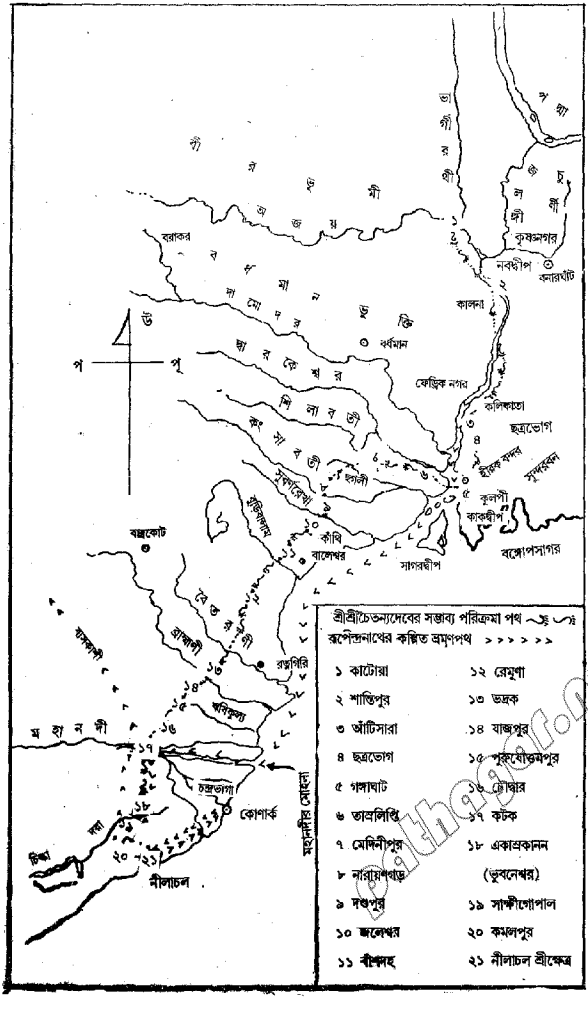

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সম্ভাব্য পরিক্রমা পথ ——
রূপেন্দ্রনাথের কল্পিত ভ্রমণপথ >>>>>>

১ কাটোয়া	১২ রেমুণা
২ শান্তিপুর	১৩ ভদ্রক
৩ আঁটিসারা	১৪ যাজপুর
৪ ছত্রভোগ	১৫ পুরুষোত্তমপুর
৫ গসাঘাট	১৬ চৌদ্বার
৬ তাম্রলিপ্তি	১৭ কটক
৭ মেদিনীপুর	১৮ একাম্রকানন (ভুবনেশ্বর)
৮ নারায়ণগড়	
৯ দণ্ডপুর	১৯ সাক্ষীগোপাল
১০ জলেশ্বর	২০ কমলপুর
১১ বীরনৃহ	২১ নীলাচল শ্রীক্ষেত্র

pathagar.net

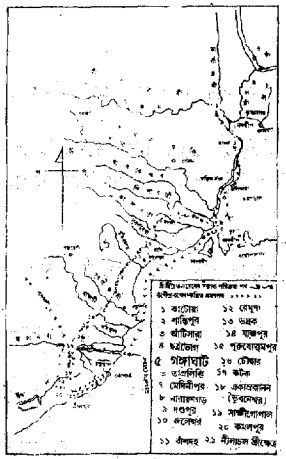

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

1744

অষ্টম পর্ব

জাহাজ আজ কদিন ধরে নীলাম্বুরাশিতে। উপকূল থেকে দু-তিন ক্রোশ দূর দিয়ে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখন পাল খাটানো হয়েছে — যদিও বাতাসের গতিমুখ দক্ষিণ দিক থেকেই। দক্ষ নাবিকেরা জানে পাল কতটা বেঁকিয়ে, হাল কতটা হেলিয়ে জাহাজের গতিমুখ দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের নির্দেশ মোতাবেক দক্ষিণ-পশ্চিমে রাখা সম্ভবপর। তাছাড়া জাহাজের তলদেশে সমুদ্রতলের কিছু উপরে দুই সারিতে বারো-দুকুনে চব্বিশ জন দাঁড়ি একসঙ্গে দাঁড় টানে। অনুমান, পক্ষকাল পার হওয়ার পূর্বেই মহানদীর মোহনায় উপনীত হওয়া যাবে। সেখানে পৌঁছাতে পারলে বড়-সারেঙের বিশ্রাম; কারণ নদীর মোহনা থেকে মহানদী বেয়ে কটক বন্দর পর্যন্ত জাহাজ চলানোর দায়িত্ব স্থানীয় উৎকলী গাঙ-সারেঙের।

জাহাজ এখন প্রচণ্ড দুলছে। অনেকেই রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

দেয়াল ধরে ধরে টলতে টলতে দুর্গা গাঙ্গুলী উপরের 'ডেক'-এ রূপেন্দ্রের বিশ্রামকক্ষে এসে হাজির। রূপেন্দ্র আর নগেন্দ্র ওপরের ডেকে পাশাপাশি দুটি ছোট ছোট কামরায় থাকেন। জাহাজীরা বলে 'কেবিন'।

রূপেন্দ্র শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলেন। বললেন, বসুন, গাঙ্গুলীখুড়ো, এই টলটলায়মান অবস্থায় আপনি হঠাৎ?

দুর্গা কোনওক্রমে আসন গ্রহণ করে বলেন, বাধ্য হয়ে এয়েছি বাবাজী। তোমার খুড়িমা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেটে কিছু থাকচে না, ক্রমাগত বমি হয়ে যাচ্ছে।

রূপেন্দ্র বলেন, সকলের একই অবস্থা, খুড়ো। এর কোনও চিকিৎসা নেই। সহ্য করতে হবে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই ঘুমের ওষুধটা নিয়ে যান। জল দিয়ে খাইয়ে দেবেন। হয়তো ঘুমুতে পারলে একটু ভালো লাগবে।

—তুমি নিজে গিয়ে একবার দেখবে না, বাবা?

—আজ্ঞে না! বললাম তো। জাহাজসুদ্ধ সকলেরই এক অবস্থা।

—তা বটে। আর একটা কথা বলি রুপেন, কিছু মনে কর না — সেদিন কি তুমি

pathagar.net

আমার ওপর রুষ্ট হয়েছিলে?

—কোন দিন?

—যেদিন ছোটবউ তোমারে দ্যাখ-না-দ্যাখ বেমক্কা পেন্নাম করে বসল আর আমি সবার সমুখে বলে দিলাম, ও তোমার খুড়িমা?

রূপেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, আপনি সত্যি করে বলুন তো গাঙ্গুলীখুড়ো — আপনি কি সজ্ঞানে মিথ্যা বলেননি? ইচ্ছে করেই আমাকে বিভ্রান্ত করতে চাননি? যাতে আমি ধরে নিই মীনু মারা গেছে?

দুর্গা গাঙ্গুলী জবাব দিলেন না। নতনেত্রে নীরবে বসে রইলেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, কেন খুড়ো? হঠাৎ মিছে কথা বলতে গেলেন কেন?

এবারও গাঙ্গুলী নতনয়নে নীরব রইলেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, আমি যখন তীর্থভ্রমণে বার হই, তখন ও গর্ভবতী ছিল—

—'ও' মানে? তোমার খুড়িমা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মৃন্ময়ীর কথাই বলছি — মীনু — আপনার চতুর্থ পক্ষের ধর্মপত্নী — তার কী হয়েছিল? পুত্র না কন্যা?

—না বাবা, রূপেন, পুত্র-সন্তানই হতো তার। হল না। কার পাপে জানি না, মৃত সন্তান প্রসব করেছিল ছোটবউ।

—ও!

দুজনেই কিছুটা চুপচাপ।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, আপনি কিন্তু আমার ও-প্রশ্নটার জবাব এখনও দেননি, গাঙ্গুলীখুড়ো। কেন আপনি আমাকে ওই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী করতে চেয়েছিলেন? আজই বা আমাকে কী বলবার জন্য এসেছেন, বলুন তো? মীনু তো জাহাজে একা অসুস্থ হয়নি — সবাই হয়েছে, এমনকি আপনি-আমিও। তাহলে সেই ছুতোয় এত কষ্টস্বীকার করে আমার কাছে কেন এসেছেন? কী বলতে এসেছেন এই নির্জনে?

গাঙ্গুলী অধোবদনে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, তুমি প্রখর বুদ্ধিমান! আমি জানি। হ্যাঁ, বাবা তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আলোচনা করতেই এয়েছি। খোলাখুলি বলবো?

—বলুন, আমি খোলাখুলি জানতেই তো চাইছি। সঙ্কোচ কিসের?

—দেখ বাবা, ঘি আর আগুন কাছাকাছি রাখতে নেই। তোমার খুড়িমার বয়স সতেরো, তোমার এক কুড়ি ছয়। আর আমার তিন কুড়ি পুরেচে অনেকদিন। আমরা তিনজনেই এক গাঁয়ের বাসিন্দা। জানতে তো আমার কিছু বাকি নেই। মৃন্ময়ীর বাপ পীতু — পীতাম্বর মুকুজ্জে — তোমার পাশের বাড়ির বাসিন্দা। তুমিও জান, আমিও জানি — তোমার খুড়িমা দেড়-দুবছর বয়সে বিনি-ঘুন্সিতে তোমাদের দাওয়ায় হামা দিয়ে ফিরেচে। তুমি তারে কাঁধে করে ঠাকুর দেকিয়ে বেড়িয়েচ। তোমাদের দুজনেরই দুজনের প্রতি ইয়ে ছিল, তাও আমার অজানা নয়...

রূপেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, তাহলে, খুড়ো, আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, কেন আপনি পীতুকাকার কাছে এই বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলেন? যখন আমি গাঁয়ের বাইরে ত্রিবেণীতে পড়াশোনা করছি? আপনি তো 'পুত্রার্থে' ভার্যা চেয়েছিলেন, তাই না? বিনা বরপণে? সেক্ষেত্রে অসংখ্য কন্যাদায়গ্রস্তের অরক্ষণীয়া তো আপনার জানা ছিল। আপনি তো নিজেই বলছেন যে জানতেন, আমাদের দুজনের প্রতি দুজনের 'ইয়ে' ছিল...

—কী করব বল? পীতু মুকুজ্জে যেরকমভাবে আমার হাতে-পায়ে ধরলে — ওকে কথা দিয়ে...

—'ও' মানে? আপনার বাবা?

—আমার বাবা?

—বাঃ! আপনার স্ত্রী যদি আমার 'খুড়িমা' হন, তাহলে আমার খুড়িমার বাবা আপনার 'বাবা'ই তো হবেন? শ্বশুরমশাইকে আপনি কি পীতু মুকুজ্জে বলে ডাকেন নাকি?

—পিতু আমার চেয়ে বয়সে ছোট! আমাকে বরাবর 'দাদা' ডেকে এয়েছে।

—তাতে কী হল? খুড়িমাও তো বয়সে আমার চেয়ে ছোট! জন্ম থেকে আমাকেও বরাবর 'দাদা' ডেকে এসেছে।

—তুমি কি আমার গায়ে পা তুলে ঝগড়া করতে এয়েছ?

—আমি তো আসিনি, খুড়ো। আপনিই আমার কাছে এসেছেন, কী যেন একটা জরুরি কথা বলতে। খোলাখুলি কথা বলতে আপনি ভালবাসেন বললেন, তাই বলছি!

দুর্গা গাঙ্গুলী অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, আমি তোমার কাছে একটি সাহায্য চাইতে এয়েচি রুপেন। গাঁ-সম্পর্কে আমি তোমার খুড়ো হই। তুমি কি আমারে এ-বিপদে সাহায্য করবে?

—বিপদটা কী, এবং সাহায্যটা কী জাতীয় না জেনে কী করে বলব?

—তা'হলে কতা দাও, সাহায্য না করলেও তুমি কথাটা গোপন রাখবে।

—বেশ তো, বলুন না?

—তুমি বুদ্ধিমান। নিশ্চয় আন্দাজ করেচ কেন এই বয়সে আমি সস্ত্রীক জগন্নাথক্ষেত্রে তীর্থে যাচ্ছি।

ভ্রূকুঞ্চন হল রূপেন্দ্রের। বললেন, পুণ্যার্জন ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য আছে নাকি? তাহলে স্বীকার করব — আমি আন্দাজ করিনি। ভাবিইনি।

—আমি একটি পুত্রসন্তান চাই, বাবা রুপেন। সেকতা তোমায় অনেকদিন আগেই বলেছিলাম। তুমি ব্যবস্থাদিও দিয়েছিলে। সেই বুক দেখার যন্তরটা নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে আমি তোমার বাড়িতে সস্ত্রীক গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি...

—সেসব পুরনো কাসুন্দি আর নাই ঘাঁটলেন, খুড়ো। আমাকে সরাসরি বলুন, আমার কাছে কী সাহায্য চাইছেন?

—সন্তান উৎপাদনের ক্ষ্যামতা এই দেড় বছরে আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছি রুপেন। তোমার খুড়িমা দিনমানে আমার সেবা যত্ন করে। কিন্তু রাত হলেই সে এক্কেরে

বাঘিনী। আমারে কাছে ঘেঁষতেই দেয় না। তুমি কবরেজ, নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমার অবস্থা! তুমি জান, চার-চারবার বে করেছি, কিন্তু আজও পিণ্ডদানের কোনও ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। এই আমার শেষ চেষ্টা...

রূপেন্দ্র সোজা হয়ে উঠে বসেন : কী আপনার শেষ চেষ্টা?

—গুরুদেবের একটি আশ্রম আছে জগন্নাথধামে। তিনি আমার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর প্রণামী আমি আগাম মিটিয়ে দিয়েচি। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, বিদেশ-বিভুঁইয়ে যদি আতান্তরিতে পড়ি — তাই বলছিলাম, গাঁয়ের মানুষ হিসেবে তুমি কি আমারে টুক সাহায্য করবে?

রূপেন্দ্র কুঞ্চিতভ্রূভঙ্গে বলেন, পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ! জগন্নাথক্ষেত্রে? মীনু জানে?

—বাঃ, সে জানবে না? নিচ্চয়! তাকে জানিয়েই তো সব ব্যবস্থা হয়েছে!

—জাহাজের আর কে কে জানে?

—না, বাবা! আর কেউ জানে না। পুরীধামে আমরা পৌঁছালেই গুরুদেবের নির্দিষ্ট পাণ্ডাজী আমাদের দুজনকে তাঁর পৃথক যাত্রী-আবাসে নিয়ে যাবেন। যজ্ঞ-টজ্ঞ সব কিছু সেখানেই গোপনে সারা হবে।

রূপেন্দ্র নতনয়নে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, মীনুকে জানিয়ে ব্যবস্থা করেছেন বললেন, কিন্তু যজ্ঞের অন্তরালে যে নেপথ্য ব্যবস্থা সেটা কি আপনি মীনুকে বুঝিয়ে বলেছেন? সে ব্যাপারটা কি ও জানে? বুঝেছে?

দুর্গা গাঙ্গুলী বিহ্বলভাবে বললেন, তুমি কী বলছো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বাবা। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

রূপেন্দ্র কঠিনস্বরে বলেন, বলবো। তার পূর্বে আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, কোন বিকল্পটা আমি ধরে নেব? আপনি নিজেই কিছু না বুঝে-শুনে মূর্খের মতো গুরুদেবের কাছে অগ্রিম প্রণামী দিয়ে মাথা মুড়িয়েছেন; নাকি সব জেনে-বুঝে আজ আমার কাছে ন্যাকা সাজছেন?

গাঙ্গুলী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

—'বিনিয়োগ প্রথা' শব্দটা শুনেছেন? 'ক্ষেত্রজ পুত্র' শব্দটা? যূপকাষ্ঠে ফেলে ছাগশিশুকে যেমন বলি দেওয়া হয়, সে-ভাবে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ভণ্ডের আড়ালে একটি সীমন্তিনীকে হাত-পা বেঁধে বলি দেওয়া হয়, তা জানেন না বলতে চান?

গাঙ্গুলী এবার অধোবদনে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা-ভাবনা করলেন। বললেন, তোমার কাছে লুকিয়ে কী লাভ রুপেন? তুমি বিচক্ষণ! কবিরাজ! সবই তো আন্দাজ করেচ! কিন্তু এছাড়া 'পুন্নাম' নরক থেকে এ বৃদ্ধের উদ্ধারলাভের আর কী পথ আছে বল?

—না, নেই। আপনার সংস্কারবশে আপনি যেভাবে 'পুন্নাম নরক'-এর কথা কল্পনায় এঁকে রেখেছেন, তা থেকে আপনার উদ্ধারের পথ নেই। কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো — যাঁরা আজন্ম ব্রহ্মচারী, যেমন আদি শঙ্করাচার্য তাঁরা কি 'পুন্নাম' নরকে যমদূতের ডাণ্ডা খাচ্ছেন?

—তাঁরা যে ঋষি, সন্ন্যাসী! আমি যে গৃহী, বাবা?

—আপনিও সন্ন্যাস নিন না! আমি ব্যবস্থা করে দেব। সন্ন্যাস নেবার বয়সও তো হয়েছে। আপনার খড়ম-জোড়া মীনুকে দিয়ে যান। ও চেষ্টা করে দেখুক — মা-বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো একান্ত সাধনায় সে জগন্নাথের কৃপা পায় কি না পায়?

নিদন্ত হাসি হাসলেন দুর্গা গাঙ্গুলী। সে হাসি বিষণ্ণ। বললেন বিষয়-বিষ যে আমার মজ্জায়-মজ্জায় আজও জড়িয়ে আছে, রুপেন! আমি যে ওটা পারব না।

—বুঝলাম। কিন্তু পুত্রেষ্টি-যজ্ঞে আপনার যে পুত্রসন্তান লাভ হবেই একথা কেন ধরে নিচ্ছেন?

—গুরুদেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন! কন্যাসন্তানের বদলে পুত্রসন্তান উৎপাদনের জন্য তিনি যে আগাম দু-গুনো পেন্নামী নিয়েছেন, বাবা।

—আপনার গুরুদেবের কোনও অধিকার নেই যজমানকে ও জাতীয় প্রতিশ্রুতি দেবার। আপনার স্ত্রী বন্ধ্যা নয় — এটা প্রমাণিত — ফলে গুরুদেব আপনাকে এ-প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের মাধ্যমে সে পুনর্বার সন্তানবতী হবে। একরাত্রির উৎপীড়নে না হলে, বারে বারে তার উপর বলাৎকার করে, যতক্ষণ না হতভাগিনী গর্ভবতী হয়। কিন্তু 'পুত্র'-সন্তান দানের ক্ষমতা তাঁর নেই। কন্যা-সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশভাগ।

দুর্গা গাঙ্গুলী যেন চিরতার রস খেয়েছেন। মুখটা বিকৃত করে বলেন, এত খরচপাতি করে, এত কাঠখড় পুড়িয়ে, আবার মেয়ে? তা'হলে গুরুদেব কেন বললেন : নিশ্চিত পুত্রসন্তান?

রূঢ়স্বরে রূপেন্দ্র বলেন, আপনার গুরুদেব সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা আমার পক্ষে শোভন নয়, তবে এইভাবে অনেক ভণ্ড লোক গুরুবাদী সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায় — এটা প্রত্যক্ষ সত্য! এদের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। দুর্ভাগ্যবশত সমাজ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। কিন্তু আপনি কৌশলে আমার প্রশ্নের জবাবটা বরাবর এড়িয়ে যাচ্ছেন, খুড়ো।

—কী প্রশ্ন, বাবা?

—এই 'নেপথ্য'-ব্যবস্থাটা — বিনিয়োগ-প্রথার কথাটা কি মীনু জানে? পাণ্ডাজীর নিয়োজিত যে পুরুষটার শয্যাসঙ্গিনী হতে তাকে আপনি বাধ্য করছেন, তাকে কি সে দেখেছে? সে কি তাকে অনুমোদন করেছে? পছন্দ করেছে?

খুড়ো মাথা নেড়ে বললেন, না, আমিই তারে দেখিনি এখনো পর্যন্ত। তবে গুরুদেব বলেছেন, কুচ্ছিৎ নয়, এই তোমারই বয়সী।

আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিন : মীনু কি জানে যে, আপনার পুত্রকামনায় তাকে ধর্মের ভড়ংঙে আসলে পরপুরুষভজনা করতে হবে?

জেরার মুখে কোণঠাসা আসামীর মতো হঠাৎ আত্মসমর্পণ করে বসেন দুর্গা গাঙ্গুলী। ঝুঁকে পড়ে রূপেন্দ্রের দুটি হাত ধরে বলে ওঠেন, না, বাবা! যজ্ঞের আসল ব্যাপারটা সে জানে না, তারে বলা হয়নি। আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না...মানে, তুমি এটুকু উপ্পার করে

pathagar.net

দেবে, বাবা? তোমারে সে খুব শ্রদ্ধা করে...

—শ্রদ্ধা, না 'ইয়ে'?

—তা যদি বল তো তাতেও আমি রাজি। কাকপক্ষীতে টের পাবে না। যজ্ঞ-টজ্ঞ কিছুরই দরকার নেই! তুমিই এ-দায়িত্ব নাও! পুরীতে পৌঁছে একটি ঘর ভাড়া নেব। তোমরা দুটিতে থাকবে। ও আমার কাছে বাঘিনী, তোমার কাছে মোহিনী হয়ে যাবে। তোমার দুটি হাত ধরছি, আমাকে পুত্রসন্তান দাও বাবা রূপেন!

জাহাজ তখন প্রচণ্ড দুলছে। না কি এই প্রস্তাবে ওঁর মাথার মধ্যেই টলে উঠল? তবু রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, বেরিয়ে যান!

—তুমি, তুমি...আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, রূপেন!

—সেজন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। আপনি অনাহত ফিরে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমার দৃষ্টির বাইরে না গেলে...

—কিন্তু জাহাজ যে প্রচণ্ড দুলছে, বাবা। আমি ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছি না।

—তাহলে চার-হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যান! আপনার প্রস্তাবের সঙ্গে সেই গমনভঙ্গিমাটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যান!

দেয়াল ধরে ধরে দুর্গা গাঙ্গুলী কোনক্রমে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রূপেন্দ্রনাথ সংলগ্ন স্নানকক্ষে গিয়ে মুখে-মাথায় জলের ঝাপটা দিলেন। টলতে টলতে আবার এসে বসলেন আসনে।

উপায় নেই। কেউ রূপেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। 'বিনিয়োগ প্রথা', 'ক্ষেত্রজ পুত্র' সমাজে স্বীকৃত। স্মার্তপণ্ডিতদের পরিচালিত এই কূপমণ্ডুক সমাজব্যবস্থায় 'ভৃত্য' আর 'ভার্যা'র সমান মর্যাদা। দুটিই এক ধাতুতে গড়া — √ভৃ+য—অর্থাৎ ভরণীয়! যাকে খাওয়া-পরা দিয়ে কাজ করাতে হয়। ভৃত্য শব্দের দুটি অর্থ — এক : দাস; দুই : ভার্যা। ভৃত্য সংসারের ভিতরে করে নানান জাতির কাজ, চাষের খেতে করে শস্য উৎপাদন। ভার্যাও করে সংসারের ভিতরে নানান জাতের কাজ, শয্যায় করে সন্তান উৎপাদন। তাই মনু বলেছেন : ভার্যা ভৃত্যই! "অবশ্যভরণীয়পুত্রদারাদিবর্গ"। মনু আরও বলেছেন : ভৃত্যকে দান করবে ব্যবহৃত পোশাক, যা জীর্ণ হয়ে এসেছে এবং ভার্যাকে দেবে "ভুক্তোবচ্ছিষ্টংবধ্বৈ দদাৎ"!

দুর্গা গাঙ্গুলীও নিশ্চয় তা দিয়ে থাকেন — ভুক্তাবশিষ্ট!

ভৃত্যকে যদি পরের সেবায় নিয়োগ করা যায়, ভার্যাকে কেন যাবে না? সমাজ দুর্গা গাঙ্গুলীর পক্ষে। 'একবগ্গা' ঠাকুরের বিপক্ষে।

তার মানে রূপেন্দ্র যদি মৃন্ময়ীকে বাঁচাবার জন্য সহযাত্রীদের সাহায্য চান, কেউ এগিয়ে আসবে না। ক্ষেত্রজ পুত্র দাবি করার অধিকার আছে স্বামীর। এতে আছে তার সামাজিক অধিকার — স্ত্রী তার মালিকের নির্দেশমতো বিবস্ত্রা হয়ে অজানা-অচেনা পুরুষের বিছানায় গিয়ে শুতে বাধ্য। অবশ্য ওদিকে ততক্ষণ যজ্ঞ হতে থাকবে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। কাঁসরঘণ্টায় যেমন বলির পশুর মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তি ঢাকা পড়ে যায়, তেমনি যজ্ঞের কোলাহলে শোনা যাবে না

নির্যাতিতা হতভাগীর জান্তব আর্তনাদ! এ বলাৎকার শুধ আইনসম্মত নয়, ধর্মসিদ্ধত।

মহান হিন্দুধর্ম!

কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে খরজিহ্ব যাত্রীদলের কাছে সেটা একটা মজাদার কেচ্ছা হয়ে উঠবে মাত্র। তামাক টানতে টানতে পুরুষেরা আড়চোখে মেয়েটিকে দেখিয়ে রসিকতা করবে : ঐ মেয়েটিই সেই বলির পশু, তাই না? তা গাজুলীবুড়ো খরচ পত্তর করে মরছে কেন? আমাকে বললেই তো বিনকড়িতে তার কার্য্যোদ্ধার করে দিতাম! মাগীর গতর তো কানায়-কানায়। পান-জর্দায় রাঙা মহিলাদেরও রক্তিম জিহ্বা পার্শ্ববর্তিনীর কর্ণমূলে কিছু অশ্লীল রসিকতা করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে মাত্র!

আশ্চর্য মতিগতি সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী সমাজের!

ঠিক যেন এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ!

যাত্রীদল কটক থেকে পদব্রজে একাম্রকাননে এসে পৌঁছেছে।

জাহাজটি মহানদীর বন্দরে এসে ভিড়েছিল পূর্ণ-জোয়ারকালে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাত্রীদের নামিয়ে অর্ণবপোত আবার কাটজুড়ির মাঝগাঙে ফিরে গেছে। জোয়ার-ভাঁটা মেনে জাহাজকে বন্দরের পাটাতনে ভেড়াতে হয়। নাহলে সমুদ্রগামী বড় জাহাজের তলদেশ বালির চড়ায় আটকে যায়। কটক একটি অতি প্রাচীন বন্দর। কেশরীবংশীয় নৃপতি মকরকেশরী প্রতিষ্ঠিত। মহানদীর এক শাখা কাটজুড়ি-গঙ্গার এ-বন্দরে সেকালে অনেক অর্ণবপোত নোঙর করতো। হাঁটাপথে শ্রীক্ষেত্র এখান থেকে চার-পাঁচ দিনের পথ। অধিকাংশ যাত্রীই যাবে পায়ে হেঁটে। সামান্য কিছু ধনবান যাত্রীর জন্য পালকি বা চৌদোলার আয়োজন। গো-গাড়িও ভাড়া পাওয়া যায়। ছয়-ছয়জন একত্রে গো-গাড়ি ভাড়া করতে পারেন — যাতায়াতের কড়ারে। এক পক্ষকাল তীর্থবাস করতে পারেন যাত্রীরা। সে-ক্ষেত্রে যাতায়াতের পথে গো-শকট চালকের খাদ্যের ব্যবস্থা যাত্রীদের করতে হয়। অবশ্য পুরীতে যে পক্ষকাল থাকবেন, তখন চালককে খোরাকি দিতে হয় না। যদি না অবশ্য যাত্রীরা স্থানীয় তীর্থগুলি গোযানেই দেখে নিতে চান। এটাই ছিল সেকালীন ব্যবস্থা।

নগেন্দ্র দত্ত একটি সুদৃশ্য চৌদোলায় রওনা হয়ে গেলেন। তিনি রূপেন্দ্রনাথের জন্যও একটি পালকির বন্দোবস্ত নিজ ব্যয়ে করে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রূপেন্দ্র কিছুতেই স্বীকৃত হলেন না! তিনি সংখ্যাগুরু পদযাত্রীদের দলে রয়ে গেলেন। দুর্গা গাঙ্গুলী সস্ত্রীক কিসে রওনা হলেন বোঝা গেল না। সম্ভবত গোযানে, অথবা, কে জানে, হয়তো জোড়া পালকিতে। রূপেন্দ্র টের পাননি। বস্তুত, সেই যেদিন মৃন্ময়ী ওঁকে সর্বসমক্ষে হঠাৎ প্রণাম করতে গিয়েছিল তার পর থেকে মীনুকে উনি আর দেখতে পাননি। গাঙ্গুলীমশাই তাকে বরাবর আড়াল করে রেখেছেন। সেই যেদিন রূপেন্দ্র বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে চতুষ্পদভঙ্গিতে খুড়োকে ওঁর ঘর থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

এখন সূর্যের তেজ কম। তবু যাত্রীরা অতি প্রত্যূষে ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে নিয়ে রওনা দেয়। তখনো নির্মেঘ আকাশে তারা দেখা যায়। সূর্যোদয়ের আগেই না-হোক তিন-চার ক্রোশ পথ পাড়ি দেওয়া যায়। তারপর একটু বিশ্রাম। পথের ধারে দোকানে প্রাতরাশ। যাত্রীদের জন্য অতি প্রত্যূষে পথপার্শ্বের বিপণীতে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। খাজা, জিবেগজা, জিলাবি ইত্যাদি মিষ্টান্ন। গোধূমচূর্ণের নানারকম ঘৃতপক্ব মুখরোচক — ইদানীং তার চল হয়েছে, নাম : লোচিকা।

কিন্তু সে-সব লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি অর্থবান তীর্থযাত্রীদের জন্য। সাধারণ যাত্রীর ঝোলাতে থাকে চিপিটক আর ইক্ষুগুড়। ফেনি আর মঠ।

একপ্রহর বেলায় একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা। সূর্য যখন মধ্যগগনে, তখন মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম। মন্দির কাছে-পিঠে থাকলে ভোগ পাওয়া যায় কড়ির বিনিময়ে। তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি। তারপর দু-দণ্ডের বিশ্রাম। আবার অপরাহ্ণে সূর্যের তেজ একটু কমে এলে পদযাত্রা। শুক্লপক্ষ হলে রাতের প্রথম প্রহরের সমাপ্তিসূচক শিবাধ্বনি পর্যন্ত। জগন্নাথ সড়কের ধারে ধারে প্রতাপরুদ্রদেবের নির্মিত যাত্রীশালা। যারা দানীদের 'পথকর' প্রদান করে আদায়কারীর পাঞ্জাছাপ সংগ্রহ করেছে তাদের বিনামূল্যে সেখানে রাত্রিবাসের আয়োজন। অন্যান্যদের আশ্রয় কড়ির বিনিময়ে অথবা গাছতলায়। প্রতিটি যাত্রীনিবাসে আছে সংলগ্ন জলাশয় — দীর্ঘিকা অথবা পাকা ইঁদারা।

ওঁরা সদলবলে একাম্রকাননে এসে পৌঁছলেন পড়ন্ত বেলায়। কে কোন যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিয়েছে, কে খোঁজ নেয়? ধনবান দু-দশজন যাত্রীকে কটকেই পাকড়াও করেছে পুরীর পাণ্ডা বা তার ছড়িদার। নাম-গোত্র জেনে নিয়ে তারা খেড়ো-খাতা ঘেঁটে বার করেছে কে কার যজমান। নগেন্দ্র দত্তের পাণ্ডাজীর পুত্র স্বয়ং তাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন কটকের জাহাজঘাটায় : স্বনামধন্য পাণ্ডাজী : "জনার্দন মহাপাত্র 'তিনিপুত্র' মনমোহন মহাপাত্র"। মহাপাত্রজীর লাল খেরো খাতায় নগেন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষের পরিচয় উদ্ধার করা গেছে।

pathagar.net

কটক থেকে জগন্নাথক্ষেত্র যাবার পথে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তীর্থ মন্দিরনগরী একাম্রকানন। একাম্র-পুরাণের পঞ্চবিংশতি থেকে দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে একটি দেব-দানবের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণকার বলছেন, গঙ্গাবতী নদীর তীরে এক আম্রকাননে দেবতারা শিবপূজার নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করামাত্র দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ সসৈন্যে এসে যজ্ঞনাশ করে। দেবরাজ ইন্দ্র পরাভূত হয়ে পলায়ন করেন এবং মহাদেবের শরণ নেন। অতঃপর দেবাদিদেব ত্রিশূলহস্তে স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, হিরণ্যাক্ষকে সসৈন্য পরাজিত করেন — দৈত্য-সেনাপতি কালনেমী নিহত হয় এবং হিরণ্যাক্ষের সৈন্য সন্নিকটকস্থ সারি সারি পর্বতগুহায় আশ্রয় নেয়।

এ নিছকই গল্পকথা। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ শব্দের দিকে আমাদের নজর পড়ে। প্রথমত, 'গঙ্গাবতী নদী'; এই শৈবমন্দির নগরীর পাশ দিয়ে যে নদীটি আজও প্রবহমান, তার নাম গঙ্গাবতী বা গাঙ্গেয়া। দ্বিতীয়ত, সারি সারি পার্বত্যগুহার উল্লেখ। মন্দিরনগরী ত্রিভুবনেশ্বরের অনতিদূরে পাশাপাশি দুটি পর্বতে অগণিত বৌদ্ধ ও জৈনগুহা — উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। আর নিকটেই আছে দুটি গ্রাম। তাদের নাম 'যগমারা' ও 'যগসারা'। বলা হয়, প্রথমটিতে হিরণ্যাক্ষ দেবতাদের পরাভূত করে যজ্ঞনাশ করে এবং দ্বিতীয় গ্রামের কাছাকাছি মাঠে মহাদেব দৈত্যদলকে পরাভূত করেন এবং দেবতারা শিবপূজা সম্পন্ন করেন।

ওই একাম্র-পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়েই শিব ও ব্রহ্মার একটি কথোপকথন লক্ষ্য করার মতো। পিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলছেন যে, মর্ত্যে যেখানে দেবাদিদেব কালনেমীকে বধ করেছিলেন, সেই পুণ্যতীর্থে ব্রহ্মা স্বয়ং একটি শৈবমন্দির নির্মাণে ইচ্ছুক। প্রত্যুত্তরে মহাদেব বলছেন, হে পিতামহ বিভূতেশ্বর, এই সামান্য কাজ আপনাকে শোভা পায় না। কলিযুগের একপাদ অতিক্রান্ত হলে আমার মস্তকস্থিত 'শশাঙ্ক' ভূতলে অবতীর্ণ হবেন — একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন এবং ওই একাম্রকাননের সন্নিকটে ত্রিভুবনেশ্বরে আমার জন্য একটি অক্ষয় মন্দির নির্মাণ করবেন।

অনুমান করার যথেষ্ট হেতু আছে, ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন গৌড়রাজ শশাঙ্কই। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতবর্ষে একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন কয়েকজন ক্ষমতাশালী নৃপতি — কান্যকুব্জের হর্ষবর্ধন, প্রাগজ্যোতিষপুরের ভাস্করবর্মা, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী এবং গৌড়রাজ শশাঙ্ক। পরাক্রমশালী নৃপতির মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কের প্রতিই

নিশাপার্বতী (ভুবনেশ্বর)

ইতিহাস সুবিচার করেনি। তার একটি বিশেষ হেতু আছে। এ-যুগের ইতিহাসের মূল দুটি উপাদান। একটি বাণভট্টের হর্ষচরিত, অপরটি এক বিদেশীর দিনপঞ্জিকা : চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। যেহেতু শশাঙ্ক শৈব — বৌদ্ধদের, তথা হর্ষের, বিপক্ষ শিবিরে, তাই তাঁকে প্রায় নর-রাক্ষসের আকৃতিতে চিত্রিত করা হয়েছে।

কিন্তু শশাঙ্ক সম্বন্ধে হিন্দু পুরাণশাস্ত্র ভিন্ন কথা বলে। একাম্র-পুরাণ মতে, সম্রাট শশাঙ্ক কলিঙ্গ বিজয় করে ত্রিভুবনেশ্বরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন — তিনিই কলিঙ্গে শিবপূজার প্রথম ভগীরথ। স্বর্ণাদ্রিমহোদয়, একাম্র-চন্দ্রিকা এবং কপিলসংহিতায় স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে যে, ত্রিভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মূর্তির ওপর একটি অপূর্ব মন্দির গঠন করাই হচ্ছে কলিঙ্গে সম্রাট শশাঙ্কের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বলাবাহুল্য, শশাঙ্ক কোনও শিবলিঙ্গ বা শিবের মূর্তি নির্মাণ করেননি। একটি স্বয়ম্ভু-শিলাকেই শিবের প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এভাবে অনাদিকালের ভূগর্ভ-ভেদ-করা প্রস্তরখণ্ডকে বহু মন্দিরেই শিবের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কাশীর কেদারেশ্বরে এবং হিমালয়ের কেদারতীর্থেও। হাতের কাছে আমাদের তারকেশ্বরও একটি উদাহরণ। আমরা বর্তমানে ভুবনেশ্বরে যে বিশাল মন্দিরটি দেখি, সেটি শশাঙ্ক-নির্মিত দেউল নয়। শশাঙ্ক-নির্মিত দেবদেউল মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনে ভূতলশায়ী হয়ছিল। পরবর্তী রাজন্যবর্গ একই স্থলে বৃহত্তর মন্দিরটি নির্মাণ করান। কিন্তু শশাঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত বিন্দু সরোবরটি আজও বর্তমান, যদিও পরবর্তী উৎকলরাজগণের অর্থানুকূল্যে তার আকার ও আয়তন সমূহ বৃদ্ধিলাভ করেছে।

শ্রোতৃবর্গের প্রথম সারিতে বসেছিলেন বৃদ্ধা বামুনদিদি। তিনি রূপেন্দ্রনাথকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আজ তোমার বক্তিমে বড় রসকষহীন হয়ে যাচ্ছে কথকঠাকুর। দেবতাদের মহিমার গপ্পের ঝুলি কি তোমার ফুইরে গেল নাকি গো?

কথা হচ্ছিল মন্দির-চাতালেই।

রূপেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, না দিদা, ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোনও গল্প আমার জানা নেই। তবে কাল সন্ধ্যাবেলা আপনাদের সেরকম একটা জমাট গপ্পো শোনাব — সাক্ষীগোপালে। তবে ঠাকুরদেবতার গল্প শুনতে চাইলেন যখন, তখন একটা প্রশ্ন করি। ঐ বিরাট কষ্টিপাথরের মাতৃমূর্তিটি লক্ষ্য করে দেখুন। কোনও অসঙ্গতি নজরে পড়ছে?

সকলেই চোখ তুলে দেখল। সিংহপৃষ্ঠ সমারূঢ়া এক পার্বতীমূর্তি। চতুর্হস্ত; কিন্তু চারটি হাতই ভেঙে গেছে। মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট। মায়ের বামদিকে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। পদতলেও তাই।

সকলেই লক্ষ্য করতে থাকে। নগেন দত্ত বলেন, এটি কি লক্ষ্মীমূর্তি?

রূপেন্দ্র বলেন, না। এটি পার্বতী। এঁর নাম 'নিশা-পার্বতী'। এবার বলুন, কিছু অসঙ্গতি আপনাদের নজরে পড়েছে?

একজন প্রৌঢ়া বললেন; মায়ের বাঁ পায়ে একটা গয়না আছে, ডানপায়ে নেই। এমনটা তো হয় না। মায়ের সাজ ঠিক হয়নি বাপু!

রূপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেন, দারুণ নজর করেছেন মা। ঐটিই এ মূর্তির

অসঙ্গতি। আর ঐ এক পায়ের মল দেখেই সনাক্ত করা যায় যে, এটি সাধারণ পার্বতী মূর্তি নয় : ইনি নিশা-পার্বতী!

—নিশা-পার্বতী! এ নাম তো শুনিনি?

—শুনুন তাহলে। দিদা গপ্পো শুনতে চেয়েছিলেন; তাই এ প্রসঙ্গ তুলেছি। একবার মহাদেব নাকি ধ্যানে বসেন। অতি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পরেও তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয় না। তখন দেবকুল সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। অথচ শিবের ধ্যান ভঙ্গ করার হিম্মৎ কারও নেই। অনঙ্গদেবের ভস্ম হয়ে যাবার পরের ঘটনা এটি। তাই উর্বশী-মেনকা-রম্ভা কোন নৃত্যপটিয়সীই ও দুঃসাহস দেখাতে রাজি হয় না। তখন পার্বতী স্বয়ং সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অন্যান্য দেবতাদের বললেন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলে যেতে। অরণ্য নির্জন হলে গভীর পূর্ণিমারাত্রে তিনি ধ্যানস্থ মহাদেবের সম্মুখে নৃত্যারম্ভ করেন। পার্বতী নাচছেন! শিবের ধ্যান ভাঙে! চোখ চেয়েই নৃত্যরতা পার্বতীকে দেখে মহাদেব খুশিয়াল হয়ে ওঠেন! তৃতীয় নয়নের অগ্নি নয়, অপর দুটি নয়নেই ফুটে ওঠে প্রেমের প্রতিচ্ছবি! নিশাকালে নৃত্যরতা এই মূর্তির নাম : নিশা-পার্বতী! ভাস্কর্যে এর উদাহরণ খুবই সুদুর্লভ। শিল্পী প্রচলিত অলঙ্কার শাস্ত্রকে (উভয় অর্থেই) অস্বীকার করে মায়ের একটি পায়ে একটি মাত্র নূপুর পরিয়েছেন। বোঝাতে — হে দর্শক! ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত নিও না! নৃত্যরতা হওয়া সত্ত্বেও ইনি নর্তকী নন — ভবভাবিনী, ভবতারিণী!

আসর ভেঙে গেল। বুড়ি গিয়ে নিশা-পার্বতী মূর্তির চরণস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। বললেন, আমাদের কথকঠাকুরটি সব জানেন!

সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। এখন যাত্রীরা মন্দিরপ্রাঙ্গণ ফাঁকা করে দেবে, মন্দিরের দ্বারপালেরা লগুড়হস্তে ঘুরে ঘুরে মন্দিরের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্রামরত যাত্রী-যাত্রিণীদের সবিনয়ে মন্দির খালি করে দেবার অনুরোধ জানাচ্ছে : সিং-দরজা বন্ধ হই যিবে, সে-পাকে চল।

রূপেন্দ্রের নজর হয়েছিল আজ শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর দুর্গা গাঙ্গুলীকে আদৌ দেখতে পাওয়া যায়নি। তাঁর সহধর্মিণী, বলাবাহুল্য, না-পাত্তা। দলে দলে সকলে নির্গমনদ্বারের দিকে চলেছে। নগেন দত্ত রূপেন্দ্রর বাহুমূল ধরে একটু জনান্তিকে সরে আসেন। ওঁর কর্ণমূলে বলেন, আমাদের পাণ্ডাজী জানালেন, আজ শুক্লা দশমী — রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে নাটমন্দিরে রুদ্রাণীর নৃত্য পরিবেশিত হবে। আমি আসব; আপনি কি দেখতে চান?

রূপেন্দ্র বলেন, রুদ্রাণী কে?

—এ-মন্দিরের দেবদাসীদের প্রাধানা — 'অলঙ্কারা'। শৈবমন্দিরে প্রধানা দেবদাসীকে বলা হয় 'রুদ্রগণিকা', সম্বোধনে : রুদ্রাণি। বৈষ্ণব-মন্দিরে — যেমন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে, প্রধানা অলঙ্কারার নাম : 'গোপিকা'!

রূপেন্দ্র হেসে বলেন, আপনি তো ও বিষয়ে অনেক খবর রাখেন দেখছি!

নগেন্দ্র বলেন, আপনিও তো তীর্থমাহাত্ম্য আর মন্দিরতত্ত্ব নিয়ে...

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বলেন, বুঝেছি! যাদৃশী ভাবনার্যস্য...

—তার মানে?

—আর মানে 'রুদ্রাণী'-নৃত্য দেখবার বাসনা আমার নাই। আপনি বরং একাই আসবেন...কিংবা...

—কিংবা?

রূপেন্দ্র আন্দাজে একটি শব্দভেদী বাণ ছাড়লেন, দুর্গা গাঙ্গুলীমশাইকে নিয়ে। তিনি এ-বিষয়ে আগ্রহী। ভাল কথা, আজ কদিন তাঁকে দেখছি না তো?

শব্দভেদী বাণটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। নগেন্দ্র বললেন, কী জানি কোথায় গেছে! আর থাকলেও সেই বুড়োটাকে এই দেবদাসী-নৃত্যের আসরে আমি নিয়ে আসতাম না।

ওঁরা পায়ে পায়ে মন্দিরের বাহিরে চলে আসেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বাহিরে নগেন্দ্রের চৌদোলা প্রতীক্ষায় ছিল। একজন ওঁর শুঁড়তোলা নাগরা চটিজোড়া হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে। নগেন্দ্র পাণ্ডাজীর বিশেষ অতিথি। রূপেন্দ্র তাঁর আতিথ্য স্বীকার করতে রাজি হননি। তিনি জনতা দলের সঙ্গে রাত্রিবাস করেন সাধারণ যাত্রিশালায়।

যাত্রিশালায় এক-এক কোণে এক-এক দল। ক্লান্ত পদযাত্রীরা পাশাপাশি কাঁথা বিছিয়েছে। ঝোপে-ঝাড়ে জোনাক জ্বলছে। সন্ধ্যা থেকেই নির্মেঘ আকাশে চাঁদের আলো। রূপেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসেছিলেন। বামুনদিদি ইতিমধ্যে দু-দুবার ঘুরে গেছেন। তৃতীয়বার এসে দেখেন রূপেন্দ্র শয়নের আয়োজন করছেন। বামুনদিদি এগিয়ে এসে বললেন : ও কী গো! শুয়ে পড়লে যে ঠাকুর! রাতের সেবা করলে না?

রূপেন্দ্র হেসে বললেন, পরমবৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যভাগবতে কী লিখেছেন জানেন না? "প্রভু যারে যেদিন বা না লিখেন আহার/রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার!!"

—ঠিকই তো লিখেচেন বেন্দাবন দাস ঠাকুর। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে, প্রভু তোমার ললাটে আজ উপুস লিখে রেখেচেন? ওঠ দিকিন, এই মালপোটুক সেবা কর। তোমার নাম করি দোকান থেকে নে এয়েচি।

রূপেন্দ্র উঠে বসলেন। বামুনদিদির করঙ্গে জল ছিল। তাতে হাত ধুয়ে শালপাতার ঠোঙায়-আনা মালপোয়াটুক মুখে দিলেন। বললেন, দিদার সব দিকে নজর!

—থাকবেনি? কথকঠাকুর নিত্যিদিন সাঁঝের বেলায় ঠাকুর-দ্যাবতার কতা শোনায় — পাববনি নেয় না — এটুকুও নজর রাখতে হবেনি? তবে আজ দাদাভাই, আমি এয়েচি একটা সমিস্যে নিয়ে। তোমারে একটা উপ্পার করতে হবে, দাদা।

—বলুন? কী করতে হবে?

—শুনেচ তো, কাল আমাদের যাত্রানাস্তি। এখানেই সবাই ঠাকুর-ঠুকুর দেখে বেড়াবে — অনন্তবাসুদেব মন্দির, মহিষমর্দিনী মূর্তি, বিন্দু সরোবরে স্নান করবে। আসলে কী জান, দাদা? আমাদের দলে বিশ-পঁচিশটা আবাগী — মানে, বেধবা! কাল একাদশী তো? — নিরম্ব উপুস! তাই একটা দিন সবাইকে রুখে দেওয়া। এই আর কী! নাইলে আবাগীগুলো পারবে কেনে?

এ-তথ্যটা জানা ছিল না। মনে মনে খুশিই হলেন রূপেন্দ্র। এখানে কয়েকটি মন্দিরের

কারুকার্যের সুখ্যাতি শুনেছেন — মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, রাজারানী মন্দির — অদূরে আছে ধৌলীপর্বতের পাদদেশে সম্রাট অশোকের শিলালেখ, আর উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে জৈন গুহামন্দির। যাত্রীদল এসব বিষয়ে আদৌ আগ্রহী নয়। কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শিষ্যটি এসব স্বচক্ষে দেখে নিতে চান। খোদাই করা ব্রাহ্মী লিপ্যক্ষর ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি রূপেন্দ্র।

মিষ্টান্ন আহারান্তে হাত ধুয়ে জানতে চান, এবার বলুন দিদা, কী আপনার 'সমিস্যে' আর আমাকে কী 'উগ্গার' করতে হবে?

—আজকাল আর সারা রাত উপুস করতে পারি না। সাড়ে তিন-কুড়ি পাড়ি দিয়েছি তো! তাই সুয্যি ডুবলে ইষ্টদেবকে জল-টল দে' এক বামুনরে সেবা করি। তাঁর অনুমতি নিয়ে বাতাসাটুক মুখে দে' জল খাই! তা দাদা, তুমি কাল আমার সেবা নিয়ে আমারে অনুমতি দেবা?

—এ আর শক্ত কথা কী? সুয্যি ডোবার আগেই আপনাকে অনুমতি দিতে পারি — তার আগেই যদি আমার পেট ভরে যায়।

বৃদ্ধা হেসে বললেন, না, না, অতটা উগ্গার করতে হবেনি!

হঠাৎ কী মনে হয়। রূপেন্দ্র বৃদ্ধার কাছে ঘনিয়ে এসে বলেন, এবার আপনি আমার একটা উগ্গার করবেন, ঠাম্মা? কথাটা কিন্তু খুব গোপন! এটা আবার আমার এক গোপন 'সমিস্যে'!

বৃদ্ধা গম্ভীর হলেন। রসিকতায় যোগ দিলেন না। বললেন, বল্?

—কথাটা পাঁচকান হবে না তো?

—রাসুবামনি তেমন কানপাতলা নয়, বলদিনি কী তোর সমিস্যে?

রূপেন্দ্র নামোল্লেখ না করে বুঝিয়ে বলেন যে, যাত্রীদলের ব্যক্তিবিশেষের — সে পুরুষ কি স্ত্রী, তাও বলেন না — একটা প্রচণ্ড বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জীবন-মৃত্যুর 'সমিস্যে'! কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় তিনি ওই ব্যক্তিবিশেষকে তার বিপদের কথাটা জানাতে পারছেন না।

—কেনে? তারে আর দেখতে পাচ্ছিস না বলে?

—হ্যাঁ, এ-ক'দিন তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু দেখা পেলেও গোপন কথাটা তাকে বলবার সুযোগ পাব না!

বৃদ্ধা দম ধরে অনেকক্ষণ কী ভাবলেন! তারপর বললেন, বিপদটা কী জাতের?

—তাও আমি তোমাকে বলতে পারব না, ঠাম্মা! আমি সত্যবদ্ধ! কথাটা পাঁচকান করব না। কথা দিয়ে রেখেছি!

—বেশ তো! পাঁচকান না করিস্, দু-কান করতি তো বাধা নেই?

—'দু-কান করা' মানে?

—যার বিপদ, তারে কানে কানে বলা!

রূপেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলেন, আঃ! তোমাকে কেমন করে বোঝাই? তাকে কানে কানে বলার সুযোগ যে আমি পাচ্ছি না, পাব না।

pathagar.net

—সে সমিস্যের মওড়া আমি নেবনে। আমি তোরে সুযোগ পাইয়ে দোব! তুই আমারে কিছু না বলে, তারই কানে-কানে তার বিপদের কতাটা বলে দিস! বুঝলি?

রূপেন্দ্র কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বলেন, আমি কার কথা বলছি বল তো, ঠাম্মা?

—ওমা আমি কোতায় যাব! তোর ওই পাড়াতুতো ছুট বুনটা তো? তোর সাথে বে-র সম্বন্ধ হবার আগেই যারে ওই ঘাটের মড়া ছোঁ-মারি তৃতীয় পক্ষ করি ফেলিছেল! তাই তো? নাকি চতুর্থ?

রূপেন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বৃদ্ধার কথায়। বলেন, তুমি কেমন করে আন্দাজ করলে, ঠাম্মা?

—এ তো জন্মান্ধও একন বুঝে ফেলবে রে! আমার তো শুধু বাঁ-চোখটায় ছানি। তা সে আবাগীর বিপদটা কিসের?...ও, না, না, সে তো তুই আমারে বলবি না। পাঁচকান হই যাবে! তা বেশ, তারেই বলিস। কানে-কানে। সাক্ষীগোপালে কিংবা জগন্নাথধামে।

রূপেন্দ্র জানতে চান, কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

বৃদ্ধার চটজলদি জবাব : ফুস্-মন্তরে! সে তোরে ভাবতে হবেনি। কায়দাটা তারে শিখায়ে দেবনে। ও বলবে ওর পেটে শূলব্যথা উটেচে! আমরা পাঁচজনে তড়িঘড়ি তোরে ডাকি পাঠাব। জানিস তো — কোবরেজে যখন সোমত্ত বউরে পরীক্ষে করে, তখন সোয়ামিরে সেখানে উঁড়িয়ে থাকতি নেই। আমি পাহারা দেব নে — বুড়োডারে তাইড়ে। তাইক্যে থাকব। কতায় বলে : পরইস্তিরি! নইলে ধম্মে সইবে না। তবে আমি দু'কান বন্ধ করি থাকব অনে। কতাটা চারকান হতি দোব না।

রূপেন্দ্র বলেন, তোমার তো দারুণ বুদ্ধি, ঠাম্মা! কেমন করে ফন্দিটা মাথায় এল?

বৃদ্ধা বললেন, ওমা আমি কোতায় যাব! জানিস না — রাস্বামনির ভারি বুদ্ধি! এই দ্যাখ না — বুড়োকত্তা বিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ আর বাস্তুভিটে রাখি গেল! মাত্তর বিশটি বছরে সব উইড়ে-পুইড়ে দে' আমি তুলসীর মালা নে' পতে নেমেছি! কেউ ঠেকাতি পারল?

রূপেন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলেন, তার মানে? দাদুর সম্পত্তি কোথায় গেল?

—ভকিল-মোক্তারের গব্বরে। আমার তিন-তিনটি জোয়ান বেটা আর তাদের তিন-দুকনে ছয়টা জাঁহাবাজ বউ! মহা ধুমধাম করি কাজীর কাছে হকিয়ত করছে আজও। আমার কী? আমি দেখতে পাচ্ছি? দিব্যি শান্তিতে আচি! পতে-পতে জয় গৌর, জয় নিতেই গেয়ে বেড়াচ্ছি! বিষয়-বিষে আমারে কেউ বিষিয়ে দিতি পেরেচে?

আশ্চর্য মানুষ তো!

pathagar.net

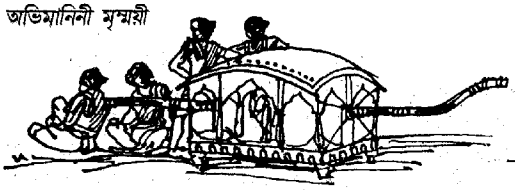

জগন্নাথধামে পৌঁছে যাত্রীদল গোটা শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। কটক বন্দর থেকে কবে জাহাজ ছাড়বে তা সকলেরই জানা। নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছাতে পারলেই হল। নগেন দত্ত এবার আর ছাড়েননি। রূপেন্দ্রও আপত্তি করেননি। কারণ এবার পাণ্ডাজী যে যাত্রীনিবাসে ওঁদের থাকতে দিয়েছে, সেটি একেবারে সমুদ্রতটের উপরে। স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি। ছাদে বসে নীলাম্বুরাশির অবিরাম উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করা যায়।

সেখানেই গাঙ্গুলীখুড়োকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এল ওঁর পাণ্ডাজীর ছড়িদার। ওঁরা আশ্রয় নিয়েছেন মন্দিরের কাছাকাছি একটি যাত্রীনিবাসে। গাঙ্গুলী রোগিণীর উপসর্গের বর্ণনা করে বললেন, এ কী আতান্তরিতে পড়লাম বল তো, বাবা! তুমি একবার চল, গিয়ে দেখবে।

রূপেন্দ্র এই জাতীয় উপসর্গের আশঙ্কাই করছিলেন। কিন্তু অসুখের আক্রমণটা নিতান্ত ঘটনাচক্রে কাকতালীয়ভাবে সত্য হতে পারে। এজন্য ঔষধের পুঁটলিটাও সঙ্গে নিলেন। নগেন দত্ত জিজ্ঞাসা করেন, দোকান থেকে অখাদ্য-কুখাদ্য কিছু খেয়েছিল কি?

গাঙ্গুলী বিহ্বলভাবে জবাবে বলেন, ও যা খেয়েছে, আম্মো তাই খেইচি। অখাদ্য-কুখাদ্য কিছু হলে দু'জনারই তো হবার কতা!

—তা বটে।

রূপেন্দ্র বলেন, চলুন তাহলে — আর দেরি করব না। রোগিণীর কাছে পাহারায় আছে কে? জল-টল খেতে চাইলে—

—আছে বাবা, আছে, আমাদের দলেরই কয়েকজন।

কোবরেজমশাই আসামাত্র মহড়া নিতে এগিয়ে এলেন রাসুদিদি। বলেন, তুমি ভালো করি দেখ তো দাদাভাই — এ-আবাগীর পেটে কী ঢুকিচে। বমি হয় না, দাস্ত হয় না — অতচ তলপেটে শূলবেদনা!

রূপেন্দ্র দীর্ঘসময় রোগিণীর নাড়ির গতি লক্ষ্য করলেন। জিব দেখলেন, চোখের পাতা টেনে-টেনে দেখলেন। তারপর ঝোলা থেকে বার করলেন একটা বিচিত্র যন্ত্র। সেটা দেখেই এত যন্ত্রণার মধ্যেও রোগিণী ফিক্ করে হেসে ফেলল। মুখের ওপর আঁচলটা চাপা দিল।

রূপেন্দ্র দুর্গা গাঙ্গুলীর দিকে ফিরে বললেন, বুকটা একবার দেখবো? আপত্তি নেই তো?

pathagar.net

দুর্গাখুড়ো মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

রাসুবামনি অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠেন, ওমা আমি কোতায় যাব! জিব দেখলে, চোখ দেখলে, নাড়ি দেখলে তাও তোমার আশ মিটলনি? সোমত্ত মেয়ের বুক দেখবে কি গো!

দুর্গা বলে, ও কিছু নয়, দিদি। কোবরেজ এমন দেখে থাকে। দেখ।

রূপেন্দ্র বললেন, আপনারা সবাই ঘরের বাইরে যান। না, বামুনদি, আপনি শুধু থাকবেন।

দুর্গা গাঙ্গুলী নিজেই উৎসাহী হয়ে বাকি দর্শকদের ঘর থেকে বার করে দিলেন। বুক দেখার এ-যন্ত্রটা তাঁর পরিচিত। ওই যন্ত্রটা নিয়েই বছর দুয়েক আগে একটা ভুল বোঝাবুঝিতে রূপেন্দ্রর সঙ্গে ওঁর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। সেবার মৃন্ময়ীও ওঁকে ভুল বুঝেছিল।

যে-কালের কথা, তখনও 'স্টেথোস্কোপ' যন্ত্রটা আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তার একটি আদিম রূপের ব্যবহার ছিল আরব-পারস্যে। মুঘল যুগে হাকিম-উল-মুলুকদের মাধ্যমে সেই বিচিত্র যন্ত্রটা পৌঁছেছে হিন্দুস্থানেও। দু-মুখো ক্ল্যারিওনেট জাতীয় একটা যন্ত্র। তার দু'প্রান্তে দুটি ভেকচর্ম। একপ্রান্ত রোগীর বক্ষস্থলে স্থাপন করলে অপরপ্রান্তে চিকিৎসকের কর্ণমূলে হৃদস্পন্দনের শব্দ শোনা যায়। চিকিৎসক তাতে অনুমান করতে পারেন হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা। রূপেন্দ্রনাথের পুলিন্দায় তেমনি একটা যন্ত্র বরাবর থাকে। প্রথমবার — মৃন্ময়ী তখন সদ্যবিবাহিতা — দুর্গা গাঙ্গুলীর বাড়িতে তিনি যখন বলেছিলেন, 'এবার বুকটা একবার দেখবো', তখন বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিল মৃন্ময়ী। সেবারও গৃহস্বামীকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে একান্তে রোগিণীকে পরীক্ষা করছিলেন এবং সেবারও ওঁর নিয়মানুসারে কক্ষে উপস্থিত ছিল শোভারানী — মীনুর বড় সতীনের মেয়ে, অনূঢ়া হলেও বয়সে সে মীনুর বড়।

শোভারানী ইতিপূর্বে 'কবিরাজ' জীবটিকে কখনও দেখেনি। চিকিৎসা-পদ্ধতি কী-জাতীয় হয়, তার ধারণা ছিল না। কবিরাজ জিব দেখলেন, নাড়ি দেখলেন, এবার বুক দেখতে চাইছেন...

নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো সে বলে উঠেছিল, এটাই নিয়ম, ছোটমা! আমি পিছন থেকে কাঁচুলির বাঁধন খুলে দিচ্ছি। লজ্জা করবেন না। উনি এবার আপনার বুক দুটো দেখবেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। কী সর্বনাশ! ওঁর উচ্চারিত 'বুক' শব্দটা সহসা দ্বিবচনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় মুহূর্তমধ্যে বুঝে ফেললেন —ওদের কী মর্মান্তিক ভ্রান্তি হয়েছে! কিন্তু তিনি কিছু প্রতিবাদ করার পূর্বেই গৃহস্বামী উন্মোচিত হয়ে গেল। বোঝা গেল, গৃহস্বামী দৃষ্টিসীমারই বাহিরে ছিলেন, শ্রুতিসীমার নয়। ঘরের ভিতরে এসে শোভারানীকে বললেন, তুই ভিতরে যা!

শোভারানী তার বিমাতার পৃষ্ঠদেশে কঞ্চুলিকার ফাঁসটা সবেমাত্র টেনে খুলেছে। বক্ষাবরণ অপসারিত করেননি তখনও। নিদারুণ আতঙ্কে, লজ্জায় আরক্তিম-আননে মৃন্ময়ী যেন বাধা দিতেও ভুলে গেছে।

বৃদ্ধ দৃঢ়স্বরে বলে উঠেছিলেন, তোমার রুগী দেখা শেষ হয়ে গেছে, রূপেন্দ্র। এসো আমার সঙ্গে, এ-ঘরে এসো। ওর চিকিচ্ছে তোমারে করতে হবেনি!

সেদিন ওই ক্রুদ্ধ বৃদ্ধকে রূপেন্দ্রনাথ বোঝাতে পারেননি — তিনি কী বলতে চান। দীর্ঘদিন পরে দুর্গাচরণ নিজের ভুলটা বুঝতে পারেন, যখন সর্বসমক্ষে ওই রূপেন্দ্রনাথই

জমিদারগিন্নিকে বলেছিলেন — ওই একই কথা : আপনার বুকটা একবার দেখব, জ্যাঠাইমা।

বৃদ্ধাও সর্বসমক্ষে অনায়াসে বলেছিলেন, দ্যাখ্!

যন্ত্র দিয়ে বুক দেখা যে চর্মচক্ষে নয়, শ্রুতিপথে, তাতে অশ্লীলতা যে কিছু নেই — 'বুক' যে হৃদ্‌পিণ্ডকে বোঝাচ্ছে — এসব কথা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন।

ঘর খালি হল।

রাসুদিদি সবাইকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। নিজে বসলেন ঘরের দূরতম প্রান্তে। ভূমিশয্যাতেই। হাতে ছিল জপের মালা। টপকাতে শুরু করলেন।

রূপেন্দ্র কিছু বলার আগেই মৃন্ময়ী শয্যা থেকে নেমে পড়ল। বললে, দাঁড়াও, সবার আগে প্রণামটা সেরে নিই। সেদিন...

রূপেন্দ্র বাধা দিলেন না। প্রণাম সেরে মীনু প্রথমেই জানতে চাইল, বৌঠান কোথায়, রুপোদা?

এই প্রথম একজন পরিচিত ব্যক্তি সেই হতভাগিনীটার কথা জানতে চেয়েছে। রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল — এই মীনুই একদিন তাঁর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল কুসুমমঞ্জরীকে বাঁচাতে — বিবাহ করে বাঁচাতে! মৃন্ময়ী ততদিনে ওঁর খুড়িমা। রূপেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তার সব জ্বালা এতদিনে জুড়িয়েছে রে, মীনু।

মৃন্ময়ী স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে রইল একমুহূর্ত। তারপর বললে, আমিও তাই আশঙ্কা করেছি। তাতেই তোমার এই বাউণ্ডুলের মতো হাল।

রূপেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, আমার কথা থাক রে। আমি তোকে একটা খুব জরুরি কথা জানাতে এসেছি। তোর একটা বিপদের কথা। দারুণ বিপদ...

মৃন্ময়ী একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওঁকে থামিয়ে দেয়। নিম্নস্বরে বলে, জানি।

—জানিস! কিন্তু কতটুকু জানিস? তোকে কতটা বুঝতে দিয়েছে খুড়ো?

মৃন্ময়ীর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কিন্তু শব্দ বের হল না কোনও।

রূপেন্দ্র ঝুঁকে পড়ে বলেন, তুই কি এটুকু বুঝতে পেরেছিস, মীনু যে, যজ্ঞ-টজ্ঞ সব ফক্কিকারি? আসলে তোকে একটা অন্ধকার ঘরে...

প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি আমাকে কী ভাবো রুপোদা?

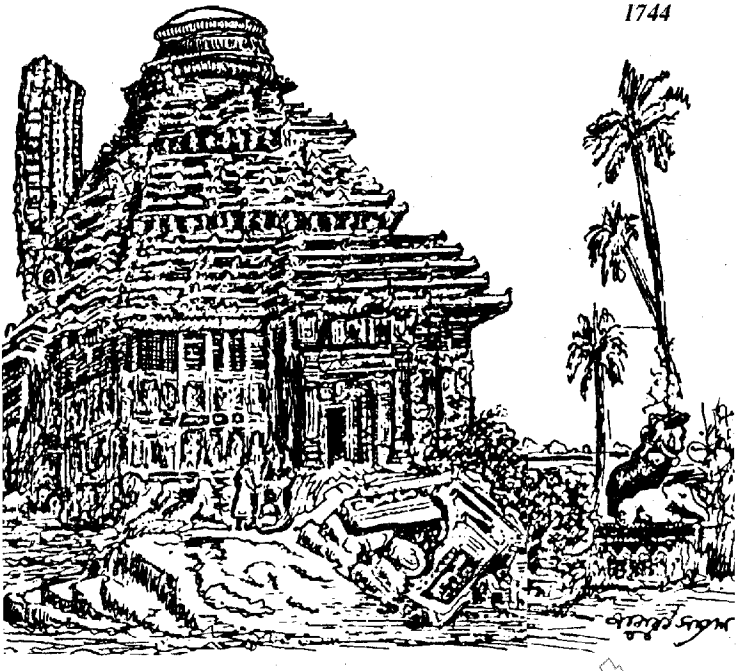

কোনার্ক : ১৮৩৭
ফার্গুসনের আঁকা স্কেচ অবলম্বনে

কচি খুকি? বাঁচেনি — কিন্তু আমি তো একছেলের মা! তা তো মান?

—তার মানে তুই সব জানিস? সব জেনে-বুঝে...

ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল মৃন্ময়ী। বসে পড়ল আবার।

মাঝপথেই থেমে গেলেন রূপেন্দ্র। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, তাও তো বটে! কী করতে পারিস তুই? এটাই তো এই অবক্ষয়ী সমাজের ব্যবস্থা!

মৃন্ময়ী কী একটা কথা বলতে গেল। পারল না। মুখের ভিতর আঁচলের অনেকটা ঢুকিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

তোমরাই বল! ও-কথা কি বলা যায়? কী বলবে? কী করে বলবে? বললে তো বলতে

pathagar.net

হতো — না, রুপোদা! আমি কিছুই করতে পারি না। কিন্তু তুমি পারতে! তুমি এখনো পার। অন্ধকার ঘরে একটা নারীমাংসলোলুপ নরপিশাচের হাত থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে এখনো বাঁচাতে পার। তুমি পার না? তুমি রাজি না হবার পরেই না বুড়োটা আমাকে সব কথা খুলে বলেছে! জাহাজেই সেই বুড়োটা টলতে টলতে তোমার ঘরে গেছিল না? আমাকে উদ্ধার করার প্রস্তাব নিয়ে?

একথা হতভাগী কেমন করে বলবে? এ প্রত্যাখ্যান যে তার নারীত্বের চরম অপমান! বোধকরি সেই অচেনা নারীমাংসলোলুপটার নিষ্পেষণে ভূতলশায়ী হওয়ার চেয়ে বড় জাতের আঘাত!

দুজনেই চুপচাপ। মুখোমুখি। দূর থেকে বামুনদিদি লক্ষ্য করল। ওখান থেকেই চিৎকার করে প্রশ্ন করে, কী দেখচ বলদিনি? পেটটা কি ফুলেছে?

রূপেন্দ্র বসেছিলেন বিছানায়। মীনু ভূতলে। দুজনেই বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে দেখেন। বৃদ্ধা নিঃশব্দে নিজের ওষ্ঠাধরে তর্জনী স্পর্শ করে আবার জপে বসল।

রূপেন্দ্র বললেন, সবই যদি জান, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন?

মীনু তার ডাগর দুটি চোখ মেলে তাকালো তার রুপোদার দিকে। বললে, তোমার কাছে একটা জিনিস ভিক্ষা চাইব বলে। দেবে? কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করব না, আর কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইব না—

—অমন করে বলছিস কেন রে? বল্ না কী চাস? আমার ক্ষমতায় কুলালে যা চাস নিশ্চয় দেব!

'কর্ণকুন্তীসংবাদ' রচনার দুশো বছর আগেকার ঘটনা। না হলে এখানে হয়তো রূপেন্দ্রনাথ বলে বসতেন, 'আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর/যাহা আজ্ঞা কর দিব...'

মীনু বললে, না, রুপোদা, তা তোমার অদেয় নয়। এর আগেও তা তোমার কাছে চুপিচুপি একজন চেয়েছিল আর লুকিয়ে তা পেয়েওছিল!

কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে রূপেন্দ্র জানতে চান : কে সে?

—আন্দাজ করতে পারছ না? বৌঠান! মঞ্জরী বৌঠান!

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শূন্যে দৃষ্টিপাত করে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, ভুলে যেও না মীনু, সে আমার ধর্মপত্নী ছিল!

প্রথমটা ও অবাক হয়ে যায়। বুঝে উঠতে পারে না, তার রুপোদার কথার মর্মার্থ। তারপর তিল তিল করে তা ওর বুদ্ধিতে ধরা দেয়। মৃন্ময়ীও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। দু-হাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়তে নাড়তে আর্তনাদ করতে থাকে : ছি! ছি! ছি! আর কত অপমান করবে আমাকে, রুপোদা? আমি অমৃত চাইনি! ভিখারির মতো পরপুরুষের

pathagar.net

প্রেমভিক্ষা করতেও আসিনি। আমি চেয়েছিলাম : বিষ! তীব্র কালকূট! কেন, বৌঠান তা চায়নি? বৌঠান তা পায়নি? তখন তো সে তোমার ধর্মপত্নী ছিল না?

রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল অতীত কথা। কুমারী অবস্থায় কুসুমমঞ্জরী তার চিকিৎসকের কাছে একই জিনিস চেয়েছিল — তার ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে। রূপেন্দ্রনাথ সেবার তাকে তা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিষ কুসুমকে পান করতে হয়নি, তার আগেই রূপেন্দ্র তার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সেসব কথা অন্যত্র বলেছি। তোমরা হয় তো জান, নয় তো জান না। থাক ওসব অবান্তর কথা—

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের। বললেন, তার মানে তুই ওই কুপ্রথায় স্বীকৃত হসনি?

—ও নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে রুপোদা! বল! দেবে! যা চাইলাম? মীনু তো তোমার কাছে আর কোনদিন কিছু চাইতে আসবে না! দেবে?

হঠাৎ মনস্থির করলেন। আত্মহত্যা মহাপাপ! রুগী প্রার্থনা করলেও শারীরিক যন্ত্রণা উপশমের জন্য ভেষগাচার্য তাকে বিষ দিতে পারেন না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্পষ্ট নিষেধ আছে। কিন্তু রূপেন্দ্রনাথ তা মানেন না। নিজের বিবেকের বকযন্ত্রে সব শাস্ত্রবাক্য চোলাই করে নেন। তাই সিদ্ধান্তে এলেন : আত্মহত্যা যদি মহাপাপ তবে ধর্মরক্ষার্থে ভারতীয় নারীর জহরব্রত পালনেও শাশ্বত অধিকার। এ তো শারীরিক যন্ত্রণা নয়, এ যে বলাৎকারের যন্ত্রণা! বলতে গেলেন, তাই তোকে দিয়ে যাব রে, মীনু! নারীমাংসলোলুপ পিশাচটা অন্ধকারে তোর অঙ্গস্পর্শ করার আগেই তুই মুক্তি পাবি।

বলা হল না। তার আগেই রুদ্ধদ্বারে মীনুর আতঙ্কগ্রস্ত পরম গুরু করাঘাত করলেন : কী গো? তোমাদের হল?

বামুনদিদি দোর খুলে দিয়ে বললেন, এসো বাবা। হয়েছে। কোবরেজমশাই ওষুধ দিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই। এসো, দ্যাকো।

রূপেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন জগন্নাথধামের অনতিদূরে, বস্তুত একদিন-পথ দূরত্বে, সমুদ্রতীরে একটি জীর্ণ সূর্যমন্দির আছে — এককালে তার নাম ছিল অর্কতীর্থ। এখন তা বিগ্রহহীন, পরিত্যক্ত। কিন্তু একজন আরবি-ফার্সি জানা মৌলবি ওঁকে জানিয়েছিলেন আকবর বাদশার সভাসদ মহাপণ্ডিত আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ওই মন্দিরটির বিশালত্ব এবং গঠন-সৌকর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পুরী মন্দিরে রক্ষিত 'মাদলাপাঞ্জী' অনুসারে জানা যায় খুর্দার রাজা নরসিংহদেব ওই মন্দির দর্শন করতে যান 1628 খৃষ্টাব্দে। সেসময় উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন বাখর খাঁ, যিনি দিল্লীশ্বর শাহজাহাঁর প্রতিনিধি হিসাবে

উড়িষ্যাশাসন করতেন। মাদলাপঞ্জী মতে, খুর্দার রাজা কোণার্ক মন্দিরে সূর্যমূর্তির বিগ্রহটি দেখতে পাননি। কারণ, তার পূর্বেই যবন আক্রমণের ভয়ে ওই মূর্তিটি অপসারিত হয়েছিল। তবে খুর্দার রাজার পরিদর্শনকালে মূল মন্দিরটি অটুট ছিল, শুধু ধাতব ধ্বজাটি ছিল না। যবনেরা সেটা সোনার মনে করে সম্ভবত অপহরণ করেছিল।

যবন আক্রমণের সময়কালটা আকবরের শাসনকালে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে। গৌড়-বাঙলার আফগান নবাব সুলেমান করনানি অতর্কিতে উড়িষ্যা আক্রমণ করে। নবাবের সেনাপতি ধর্মান্ধ কালাপাহাড় এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারে বারে যে দুর্ভাগ্যকে ঘনিয়ে উঠতে দেখেছি — প্রাক-স্বাধীনতা যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে, বর্তমানে ভোটের রণাঙ্গনে আজও যা দেখছি — উড়িষ্যার ক্ষেত্রে সেবারও তাই হল। ওই চরম দুঃসময়ে উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের অমাত্যরা সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মুকুন্দদেবের একক ক্ষমতায় কালাপাহাড়কে প্রতিহত করা সম্ভবপর হল না। মুকুন্দদেব নিরুপায় হয়ে কোণার্ক তীর্থের বিগ্রহটি নিরাপদ স্থানে অপসারিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সে যুদ্ধে বুকের রক্ত দিয়ে মুকুন্দদেব তাঁর বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন। আর কালাপাহাড়ের অপকীর্তি মহাকালের বুকে চিরস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন হয়ে রইল উড়িষ্যার নানান দেবদেউলে। ওই মুকুন্দদেবই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা।

খুর্দারাজের কোণার্কদর্শনের ঠিক দুশো বছর পরে পাচ্ছি ওই মন্দির সম্বন্ধে কালানুসারে পরবর্তী একটি বিবরণ — এ. স্টারলিঙ-এর। সেটি 1825 খৃষ্টাব্দের। তখন জগমোহনটি অটুট থাকলেও মূল রেখদেউলটি ছিল ভগ্নাবস্থায়। স্টারলিঙের বিবরণে দেখছি লেখা আছে: "রেখদেউলটি তখনও কোনক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল। উচ্চতায় প্রায় একশ পঁচিশ ফুট। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পালতোলা একটি জাহাজ।" জেমস ফার্গুসন মন্দিরটি দেখেন তার বারো বছর পরে, 1837 খৃষ্টাব্দে। তাঁর একটি স্কেচের অনুলিপি ছাপানো বইতে পাওয়া যায়।

আমাদের কাহিনী অনুসারে রূপেন্দ্রনাথ পুরীতে এসেছেন 1743 খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ খুর্দারাজার পরিদর্শনের পরবর্তীকালে এবং স্টার্লিং-এর প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার পূর্ববর্তীকালে। মূল মন্দিরটি তখনও অটুট, যদিও বিগ্রহ নেই। আমরা এখন জগমোহন ঘিরে পাদপীঠে যে কারুকার্য দেখি, চব্বিশটি প্রকাণ্ড অর্ধোৎকীর্ণ রথচক্র, তা তখন দেখা যেত না। খুর্দার রাজা বা স্টারলিঙ তা দেখেননি। সেসব সময়ে তা ছিল বালির গর্ভে ঢাকা। সেসময় ওখানে কোনও লোকালয় ছিল না আদৌ।

রূপেন্দ্রনাথের বাসনা ওই কোণার্ক-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া। কিন্তু যাত্রীদলের ভিতর কেউই রাজি হল না। নিত্যপূজা হয় না, দেববিগ্রহ নেই, এমনকি জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই — সেখানে কে যাবে? কিন্তু 'এক রত্না-ঠাকুর' অত সহজে নিবৃত্ত হবার মানুষ নন। সন্ধান নিয়ে জানলেন, সমস্ত রাত্রি সমুদ্রোপকূলের বালুকাবেলার পথ ধরে গো-গাড়ি চালালে পরদিন প্রভাতে কোণার্কতীর্থে পৌঁছানো যায়। আহার্য-পানীয় এবং গোরুর খাদ্য সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় রওনা হলে সারা রাত্রে ফিরে আসা যায়। দু-একজন গো-শকট মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল যারা জীবনে দু-একবার এমন

নাছোড়বান্দা যাত্রীকে ওই সূর্যমন্দির দেখিয়ে এনেছে। চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই — কারণ যাত্রীদের কাছে একদিনের খাদ্যপানীয় ছাড়া কিছু লুটের মাল থাকেই না। নগেন দত্তকেও রাজি করানো গেল না। তিনি সারাদিন পুরীধামের তীর্থ দেখে বেড়ান এবং সন্ধ্যায় — দেবদাসীনৃত্য।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল। না, গো-শকট নয়, উনি যাবেন অশ্বারোহণে। একটি ভাল জাতের আরবীয় অশ্বের ব্যবস্থা করে দিলেন পাণ্ডাজী, আর ওই সঙ্গে নটুসীদলের কাছ থেকে ভাড়া করে আনলেন একটা বিচিত্র পোশাক। বললেন, আপনি এই পোশাক পরে যান ঠাকুরমশাই — দূর থেকে মনে হবে উড়িষ্যারাজের কোনও সৈন্যাধ্যক্ষ। চোর-ডাকাত ত্রিসীমানায় ভিড়বে না। আর নিরস্ত্র যাবেন না। এটা নিন।

মাজায় বেঁধে দিলেন একটা তরবারি।

স্থির হল পরদিন প্রত্যূষে উনি যাত্রা করবেন। একলাই। সঙ্গে থাকবে একদিনের মতো আহার্য-পানীয়। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

কিন্তু এ পরিকল্পনাও বাতিল করতে হল শেষ পর্যন্ত। বাধা দিলেন দুর্গাখুড়ো স্বয়ং, তুমি যদি আপত্তি না কর, বাবা, তাইলে আমরাও তোমার সঙ্গে যেতে চাই। গো-গাড়িতে। আমরা দুজন।

সবাই বিস্মিত হল। একবগ্গা না হয় আধাপাগল, কিন্তু দুর্গা গাঙ্গুলী কেন কোণার্ক যেতে চাইছেন? সেখানে না আছে পূজা-পাঠনের ব্যবস্থা, না কোন ঠাকুর-দেবতা। গাঙ্গুলীমশায়ের যুক্তি অন্যরকম : মন্দির ভেঙে গেলেই কি দেবতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়? ওঁর পাণ্ডাজী বলেছেন ওই অর্কতীর্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নাকি রোগমুক্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রভাগা নদী যেখানে সমুদ্রে বিলীন হয়েছে, সেই কুম্ভরাশির মধ্যবর্তী অগ্নিকোণ দ্বাপরযুগে ছিল মহাতীর্থ। স্বয়ং শাম্ব ওই কোণার্ক মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বিগ্রহ আছে কি নেই, এটা বড় কথা নয়। ওঁর মনোগত বাসনা সেই চক্রতীর্থে সস্ত্রীক তিনটে ডুব দেওয়া। কোন যাত্রী যেতে রাজি হচ্ছে না বলে উনি এতদিন নীরব ছিলেন। এখন, যখন শুনলেন কবিরাজমশাই স্বয়ং কোণার্কতীর্থে যাচ্ছেন, তখন উনি ভরসা করে এগিয়ে এসেছেন।

রূপেন্দ্র গো-যানে যেতে স্বীকৃত হলেন না। তবে একই সঙ্গে অশ্বারোহণে যেতে আপত্তি করলেন না। গো-গাড়ির সঙ্গে অশ্বারোহী একই তালে যেতে পারে না। তবে পথে যখন বিপদ কিছু নেই, তখন আগে-পিছে গেলে ক্ষতি নেই। বড় পাণ্ডা আরও সংবাদ দিলেন যে, কোণার্ক সম্পূর্ণ জনহীন নয়। তিন-চার ঘর মানুষ ওখানে বাস করে। খুর্দারাজার নিষ্কর প্রজা তারা। সপ্তাহান্তে পিপলির হাটে তারা বাজার করতে আসে। খুর্দার রাজা তাদের নিয়োগ করেছেন, যাতে আশপাশের গৃহনির্মাণেচ্ছুরা ওই ভাঙা মন্দিরের পাথর তুলে নিয়ে না যায়। বড় পাণ্ডা তাদের দলপতি মহানন্দ দাসপাত্রকে একটা হাতচিঠি লিখে দিলেন, যাতে ওই তিনজন যাত্রীর ঠিকমতো দেখভাল করা হয়। অবশ্য দাসপাত্র এবং তার তিনঘরের আত্মীয়-

স্বজনেরা সবাই নিরক্ষর। চিঠি পড়তে পারবে না। তা হোক, অন্তত পাঞ্জাছাপটা চিনবে।

শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যারাত্রে গো-যানে যাত্রা করলেন সস্ত্রীক দুর্গা গাঙ্গুলী। মধ্যরাতে শুক্লা চতুর্দশীর নিশাপতি এখন প্রায় মধ্যগগনে — খ-মধ্যর কাছাকাছি। আকাশ নির্মেঘ, তবু বাঁধভাঙা চাঁদের উপচে-পড়া জ্যোৎস্নায় নক্ষত্রকুলরমণীরা আজ নিষ্প্রভ। ফাল্গুনের মাঝামাঝি। সূর্য এখন কুম্ভরাশিস্থ। আগামীকাল পূর্ণিমা। তাহলে এই মধ্যরাত্রে সূর্যদেব কু-বিন্দুর কাছে-পিঠে। হিসাবমতে এখন পূর্বগগনে বৃশ্চিকরাশির উদয় হবার কথা। হ্যাঁ তাই — রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল রক্তাম্বরা জ্যেষ্ঠা পূর্বসমুদ্রে অবগাহন সেরে সবে উদিত হয়েছেন। গণিত-জ্যোতিষে রূপেন্দ্রনাথের কিশোরকাল থেকেই আগ্রহ। পিতৃদেবের কাছে এবং গুরু তর্কপঞ্চাননের সাহায্যে রাশিচক্রের গতিছন্দ এবং জ্যোতিষ্কদের মধ্যে উজ্জ্বল অনেক নক্ষত্র ভালই চিনতে পারেন। অশ্বের গতি সংবরণ করে ঊর্ধ্বগগনে পূব থেকে পশ্চিমে একবার তাকিয়ে দেখলেন। বৃশ্চিকরাশির প্রশ্নবোধক চিহ্নের পূর্ববর্তী তুলা রাশির নক্ষত্র-চতুষ্টয় পূর্ণচন্দ্রিমার প্রভাবে আজ অপ্রকাশ। কন্যারাশির চিত্রা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে সমুদ্রতীরের ওই একক অশ্বারোহীকে। সিংহরাশির মঘা চন্দ্রসন্নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য নয়; পশ্চিমাকাশে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সনাক্ত করা যায়-কি-না যায়। রক্তবসনা রোহিণী এখনো অস্তমিত হননি। চিত্রার অদূরে জ্বলজ্বল করছে স্বাতী। উত্তরাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ব্যতিরেকে সনাক্ত করা যায় স্বর্গীয় বীণায় অভিজিৎকে; এবং হংসবালাকার শীর্ষে কী-নাম-যেন উজ্জ্বল সাদা নক্ষত্রটিকে। এছাড়া চন্দ্রের অনতিদূরে স্বজ্ঞানপ্রভায় ভাস্বর দেবগুরু বৃহস্পতি। বাদবাকি শতসহস্র কৌতূহলী নক্ষত্রললনা — যারা অমাবস্যার রাত্রে তারকাপুরীর অসংখ্য বাতায়নপথে উঁকিঝুঁকি দেয় — আজ তারা পূর্ণচন্দ্রের মায়ায় সুসুপ্ত।

জগন্নাথধামের অধিকাংশ ভদ্রাসনেই নেমে এসেছে মধ্যরাত্রির গাঢ় তন্দ্রিমা। তবু শহরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে এই মধ্যরাত্রেও আলোর আভাস। আগামীকাল দোলপূর্ণিমা। বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ পুণ্যাহ। নন্দলালার রঙিন উৎসব — আবীর-ফাগ-রঙদোলের হোরি। আবার অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরমগুরু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি। দুই শত সাতান্ন বৎসর পূর্বে এমনই এক দোলপূর্ণিমার পুণ্য-রাত্রে শচীমাতার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন গৌরচাঁদ। ফলে বেশ কিছু গৃহাভ্যন্তরে এই মধ্যরাত্রেও কর্মব্যস্ততা। মিঠাই-এর দোকানে রাত্রি-জাগরণক্লান্ত ভিয়েনের আয়োজন।

অর্ধদণ্ডের মধ্যেই এইসব আলোকোজ্জ্বল ব্যস্ততার এলাকা অতিক্রম করে এলেন অশ্বারোহী। এখন বিশ্বচরাচরে তিনি নিতান্ত একা। দু-একটি নিশাচর পক্ষী এখনো বালুকাবেলায় শিকার-অন্বেষণে ব্যস্ত। অশ্বের আহ্লাদিত গতিশব্দে তারা জোড়া-পায়ে দূরে সরে সরে যায়। পদতলে আদিগন্ত বেলাভূমি। সমুদ্র আর মহাকাশ হারিয়েছে তাদের পৃথক সত্তা। রূপেন্দ্রনাথের দক্ষিণে ভরা কোটালের অতন্দ্র জলোচ্ছ্বাস আর বামে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশুতি প্রকৃতি।

সন্ধ্যারাত্রে গো-শকটে গাঙ্গুলীখুড়োকে সস্ত্রীক রওনা করে দিয়েছেন। মীনু একদিনের সংসার পাতার নানান সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে গেছে — চাল, ডাল, আনাজপাতিও নিয়ে চলেছে। রসিকতা করে রূপেন্দ্রনাথকে বলেছিল, কাল আমার পুন্নিমের বেরতো, ঠাকুরমশাই! আমাদের গাছতলায়-পাতা সংসারেই দুটি অন্নসেবা করে আমাদের গো-জন্ম উদ্ধার করবেন। রূপেন্দ্রনাথও হাসতে হাসতে বলেছিলেন, উপায় কী? না হলে দোলপূর্ণিমার দিন 'উপুস' করতে হবে। বড়জোর কাঁচা ফলার। তার চেয়ে তোমার 'বকনা-জন্ম' উদ্ধার করাই ভাল।

কালীক-হিসাবে তিনি দুই প্রহরকাল পশ্চাবৎবর্তী। উনি আশা করে ছিলেন — অর্ধরাত্রির ব্যবধান থাকলে গো-যান ও অশ্বারোহী একই সময়ে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবে। বাস্তবে হিসাবটি মেলেনি। দু-তিন ক্রোশ দূর থেকে কোণার্ক মন্দিরের চূড়াটি চন্দ্রালোকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু সারা পথে গো-শকটটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। বালুবেলার উপর মাঝে-মাঝেই একজোড়া সমান্তরাল চাকার দাগ অবশ্য নজরে পড়েছে। তাতে বুঝেছেন, গো-শকট ওঁর পূর্ববর্তী। পল্লীবালা মীনুর ভাগ্যের মতো টলতে টলতে গোযানের বক্রচিহ্ন কোন্ অলক্ষ্য দিগন্তের দিকে চলেছে। অর্কতীর্থে যখন উপনীত হলেন, তখনও সূর্যোদয় হতে অর্ধদণ্ড বাকি। পূব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। দেবারিগুরু শুক্রাচার্য সমুদ্রতলের কাছাকাছি। পাখির কাকলি জেগেছে বনে-বনান্তরে। মন্দিরের অদূরে প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে মীনু কিলিঞ্চক বিছিয়ে তার সাময়িক সংসার পাতছে। ওঁকে দূর থেকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে রূপেন্দ্রনাথ একটি ছদ্ম অভিবাদন করলেন।

মীনু বললে, তোমাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে সোনাদা! যেন সত্যিকারের রাজপুত্তুর। মাথায় উষ্ণীষ, মাজায় তরোয়াল, পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে চলেছ কোন্ রাক্ষসপুরীতে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে!

রূপেন্দ্র বললেন, আর কুঁচবরন রাজকন্যা তার মেঘবরন চুল এলিয়ে কোথায় বীণা বাজাবেন, তা নয় তিন-পাথরের উনানে কাঠিকুঠি গুঁজে ফুঁ পাড়ছেন! খুড়ামশাইকে দেখছি না যে?

মীনু চোখ বড় বড় করে বললে, কে? রাক্ষসরাজ? কালরাত্রে তাঁর জ্বর এসেছে। গো-

গাড়িতেই শুয়ে আছেন। নামেননি।

গরু দুটিকে খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে সামনে-পিছনে ঠেকো দিয়ে গাড়োয়ান গো-যানটি ভূমির সমান্তরালে রেখেছে। উপরে টাপর তোলা। রূপেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করলেন দুর্গা গাঙ্গুলীকে। না, এখন জ্বর কমে গেছে। তবে নাড়ির গতি ভাল নয়। সর্বাঙ্গে বেদনা।

গাঙ্গুলী বললেন, ও কিছু নয়, পুন্নিমে তো! এসময় বাতের ব্যথাটা চাগায়। তার ওপর কাল সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সারাটা পথ 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' কেত্তন গাইতে গাইতে এয়েছি যে, গো-গাড়ির ভিতরে।

রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঔষধের পুলিন্দাটা নিত্যসঙ্গী। কী একটা শিকড় বার করে খল-নুড়িতে বেটে মধু সহযোগে খাইয়ে দিলেন। বললেন, অন্নগ্রহণ আজ আর না-ই করলেন। দেখি, কাঁচা ফলার কী পাওয়া যায়।

গাঙ্গুলী বললেন, সেসব ব্যবস্থা তোমার খুড়িমা জগন্নাথধাম থেকেই করে এনেছেন। ফলমূল-মিষ্টান্ন সবই সঙ্গে মজুত আছে। এখন মুশকিল হচ্ছে, চন্দ্রভাগা নদীর মোহনাটা কোতায়? এ ব্যাটা গাড়োয়ান তো কিছুই জানে না দেখচি! অক্কতীর্থের নামই শোনেনি গদ্ধভটা!

রূপেন্দ্রনাথ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-সংবাদ সংগ্রহ করলেন। জীর্ণ দেবদেউলের পশ্চাতে, কিছুদূরে দু'-তিন ঘর মানুষের বাস। একটু এগিয়ে যেতেই একটি ঘর থেকে বার হয়ে এলেন নগ্নগাত্র এক প্রৌঢ়। উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে দেখে দণ্ডবৎ হলেন। তাঁর পিছন পিছন বার হয়ে এসেছিল দুটি শিশু। বড়টি ওঁর কন্যা — বছর দশ-বারো; ছোটটি পুত্র, বছর ছয়-সাত। তারা ধমক খেল, যেহেতু দণ্ডবৎ হতে ভুলেছে তারা। হ্যাঁ, ইনিই দাসপাত্র। কন্যার নাম সুভদ্রা, আজ্ঞে। লেড়াটি মান' এ অধম দাসর পুত্র, বলাই আইজ্ঞা!

বড়পাণ্ডার পাঞ্জা-ছাপ দেখেই চিনলেন। চিঠিখানা পড়ে শোনানোর প্রয়োজন হল না। গো-যান এবং অশ্বারোহী দেখেই বাকিটা দাসপাত্র আন্দাজ করে নিয়েছেন: অতিথি সৎকারে উনি পরাঙ্মুখ নন।

তাঁর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল : চন্দ্রভাগা নদীটি কোর্ণাক মন্দিরের বিগ্রহের মতো অন্তর্হিত। গর্ভমন্দিরের শূন্য সিংহাসন যেমন প্রমাণ দেয়, এককালে এ-মন্দিরে মূর্তি ছিল — সূর্যদেব, পূষণ, হরিদশ্ব, যাই হোক — তেমনি চন্দ্রভাগার মরা খাত দেখে অনুমান করা যায় কোথায় সেকালে ছিল অর্কতীর্থ। স্বচ্ছতোয়া চন্দ্রভাগার খাত নিত্য জোয়ার-ভাঁটায় স্তরের পর স্তর বালিতে সম্পূর্ণ বুজে গেছে। এখন সেখানে গেলালি ডোবে-কি-ডোবে না। স্নান করার প্রশ্নই ওঠে না। দাসপাত্র আরও জানালেন, এখানে সমুদ্রস্নান নিরাপদ নয়; তবে সিকি ক্রোশ উত্তরে খুর্দারাজের প্রতিষ্ঠিত পদ্মদিঘিতে এখনো জলের অভাব হয়নি। অবগাহন স্নানে অসুবিধা নাই।

গাঙ্গুলী বললেন, আমার তো মাতা খারাপ হয়নি যে, এই জ্বর গায়ে চষাক্ষেত ঠেঙিয়ে দিঘিতে ছান করতে যাব।

দাসপাত্র তার বিচিত্র উৎকলী ভাষায় যা বলল, তার অর্থগ্রহণ হল না গাঙ্গুলীর; কিন্তু রূপেন্দ্রের কানদুটি লাল হয়ে উঠেছে। আর মীনু কী জানি কী করে বুঝে ফেলেছে — হাসির

দমকে ওর পেট ফেটে যাবার জোগাড়। গাঙ্গুলী বলেন, সব কতায় শ্যালের মতো অমন খ্যাকখ্যাক করে হাস কেন বল দিকিনি?

রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, কী বলচে ও?

রূপেন্দ্রনাথ ঠিকমতে অন্বয় ব্যাখ্যা করলেন না। দাসপাত্রর বক্তব্যের সারাংশটুকু শুধু দাখিল করলেন: ও বলছে, কর্তামশাই যদি স্নান করতে না চান তাহলে বলভদ্র তাঁর কাছে বসে পাহারা দিতে পারবে; আমাদের দুজনকে সুভদ্রা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে দিঘিতে।

বৃদ্ধ বলেন, অ! তা এতে হেসে গড়িয়ে পড়ার কী হল?

মীনুর সঙ্গে রূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি-বিনিময় হল। কিন্তু কেউই হাসলেন না। দাসপাত্র একটু অপ্রস্তুত। বেচারি বুঝে উঠতে পারেনি যে, মীনু ওই বৃদ্ধের চতুর্থ পক্ষ। সে ভেবেছিল — ব্যাটা-ব্যাটাবউ নিয়ে বৃদ্ধ তীর্থভ্রমণে এসেছেন। তাই সে বলতে চেয়েছিল পিতৃদেবকে বালকের জিম্মায় রেখে রূপেন্দ্র সস্ত্রীক পদ্মদিঘিতে অবগাহন করে আসতে পারেন।

মীনুর নির্দেশমতো রূপেন্দ্র বললেন, আমরা এখানে অন্নপাক করে মধ্যাহ্ন-আহার করব। আর সুভদ্রা আর বলভদ্র আমাদের সঙ্গেই মধ্যাহ্ন-আহার সারবে।

দাসপাত্র সানন্দে স্বীকৃত; সিটা তো মহাপ্রভুর আশীর্বাদ, আইজ্ঞে। ব্রাহ্মণের প্রসাদঅ!

বিগ্রহ নাই। তাতে কী হল? কোণার্ক মন্দির-ভাস্কর্যের খ্যাতি যে আগৌড় প্রসারিত। গাঙ্গুলীখুড়োর অত আদিখ্যেতা নেই: বিগ্রহহীন মন্দিরে মূর্তি দেখে বেড়ানো। অগত্যা রূপেন্দ্রনাথ মীনুকে নিয়ে মন্দির-ভাস্কর্য দেখতে এগিয়ে গেলেন। দাসপাত্র দু'জনের হাতে দুটি লাঠি ধরিয়ে দিল। ভাঙা পাথরের স্তূপে সাপের আধিক্য। পৌষ-মাঘ তারা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। এই ফাল্গুনে সদ্য দীর্ঘ নিদ্রান্তে তারা গর্তের বাহিরে আসে। নাগ খোঁজে নাগিনীকে। বসন্তকাল যে মিলনের ঋতু।

দাসপাত্রের ভ্রান্তি এখনো অপনোদিত হয়নি। বিশেষ হেতুতে তাই সে নিজেও সঙ্গে গেল না মূর্তিগুলো দেখিয়ে দিতে — পুত্রকন্যাকেও যেতে দিল না। মন্দিরের বাহিরে কী জাতির মূর্তি আছে, সে-কথা তার অজানা নয়।

আগেই বলেছি, আমাদের কাহিনীর কালে কোণার্ক মন্দিরের পোতা পর্যন্ত প্রোথিত ছিল বালির গর্ভে। রথচক্রগুলি তাই অদৃশ্য। পরিকল্পনাকার যে সূর্যরথের পরিকল্পনা করেছিলেন তা তখন বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালে জগমোহনের পূর্বদিকে যে প্রকাণ্ড নবরত্নের 'স্ল্যাব'টা দেখা যায় — এখন যার নিত্যপূজা হয়—তা তখনো ভেঙে পড়েনি। সেটি

ছিল জগমোহনের প্রবেশদ্বারের উপর সুস্থানে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসেই কী একটা নজরে পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মৃন্ময়ী। রূপেন্দ্রও একটু ভেবে নিয়ে বললেন, চল, আমরা বরং ওদিকটা দেখি—

'ওদিক' বলতে কোন দিক? মন্দিরের চতুর্দিকেই তো একই জাতের মূর্তি। অতি বিশাল অসংখ্য নরনারীর নগ্নশৃঙ্গারদৃশ্য — অতি-অন্তরঙ্গ রতিরঙ্গের মিলন-দৃশ্য! এমনকি বিকৃতকামের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুগল-মূর্তি।

মৃন্ময়ী চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। বললে, যাক রুপোদা, আমার সখ মিটেছে! চল ফিরে যাই! ভাল লাগছে না।

—চল! উপর-পোতালের দেবদাসীদের মূর্তিগুলি কিন্তু অপূর্ব!

—তা হোক, গা ঘিন্‌ঘিন্ করছে! চল ফিরে যাই।

—চল।

দুজনে পায়ে পায়ে ফিরে আসতে থাকেন। মৃন্ময়ী গম্ভীরভাবে বলে, এতক্ষণ বুঝতে পারছি, কেন সুভদ্রা আর বলাইকে উনি আসতে দিলেন না—

—কেন?

—বাঃ! ওই অশ্লীল মূর্তিগুলো কি ভাইবোনের একত্রে দেখা উচিত?

—উচিত কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু একথা তো নিশ্চয় যে, ওদের বাড়ি যখন এত কাছে, তখন ওই প্রকাণ্ড মন্দিরের যাবতীয় মূর্তি ওরা ভাইবোনে বারে বারে দেখেছে! দেখেনি? একসঙ্গেও দেখেছে!

—হ্যাঁ, তা দেখেছে নিশ্চয়। কিন্তু কী বুঝেছে ওরা?

রূপেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন না। পায়ে পায়ে দুজনে গাঙ্গুলীমশাই যে-বটবৃক্ষের নিচে বিশ্রাম করছেন সেদিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। মৃন্ময়ী পুনরায় বলে, আর সেই জন্য দাসপাত্রমশাই আমাদের মন্দির দেখাতে নিজে এলেন না—

—'সেই জন্যেই' মানে?

মীনু আড়চোখে তার রুপোদার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে: আহা! বোঝ না যেন...

—ও হ্যাঁ! উনি তো আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভেবে বসে আছেন।

হঠাৎ থমকে থেমে পড়ে মৃন্ময়ী। বলে, একটা কথা বল তো রুপোদা, আমার বদলে যদি সত্যিই তোমার সঙ্গে আজ কুসুম-বৌঠান থাকত, তাহলে তোমরা দুজন বোধহয় ঘুরে ঘুরে ওই মূর্তিগুলো দেখতে, তাই নয়?

রূপেন্দ্রনাথ হেসে প্রশ্নটা উড়িয়ে দিতে চান, কী হলে কী হত, সে গবেষণা থাক!

হঠাৎ দৃঢ়মুষ্টিতে মৃন্ময়ী ওঁর একখানা হাত চেপে ধরে। বলে, না। থাকবে না! সত্যি করে বল তো — তোমার মনোগত ইচ্ছেটা কী? তুমি ওই মূর্তিগুলো দেখতে চাও, তাই না? — তা যাও না, দেখে এসো! আমি বরং একাই ফিরে যাই!

রূপেন্দ্র বললেন, হাতটা ছাড়, মীনু! দূর থেকে দাসপাত্রমশাই দেখলে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাটা...

pathagar.net

মীনু তৎক্ষণাৎ ওঁর হাতটা ছেড়ে দেয়।

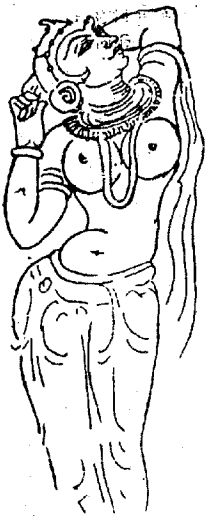

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, দেখ মীনু, এখানে তো জনমানব নেই। আর এটাও অনস্বীকার্য যে, মূর্তিগুলো অতি অনবদ্য ভাস্কর্য। তা আমার সঙ্গে একসঙ্গে দেখতে যদি তোমার সঙ্কোচ হয়, তাহলে আমি বরং এখানে অপেক্ষা করছি। তুমি একচক্কর দেখে এস। তুমি ঘুরে এলে আমি যাব। একসঙ্গে না হয় নাই দেখলাম!

—না! তুমি যাও, তোমার যখন অতই ইচ্ছে তখন দেখে এসোগে! আমি এখানে অপেক্ষা করছি। যাব না। আমি যাব না। আমার লজ্জা করবে!

—কার কাছে? নির্জনে নগ্নস্নান করতে কারও তো কখনো লজ্জা করে না।

—কেমন করে জানলে? তুমি নিজে কখনো করেছো?

—কী? নির্জনে নগ্নস্নান? নিশ্চয়! কেন তুমি করনি?

মীনু আবার আড়চোখে ওঁকে একবার তাকিয়ে দেখল। বলল, তুমি কৌশলে আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছিলে। বল না, আজ আমার বদলে যদি কুসুমবৌঠান তোমার সঙ্গে থাকত, তাহলে তোমরা যুগলে ওই মূর্তিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে। তাই নয়?

রূপেন্দ্রনাথ সত্যকে এবার আর অস্বীকার করতে পারলেন না। বললেন, হ্যাঁ, দেখতাম। সে রাজি হলে! জানি না, ঐ মূর্তিগুলির যৌনতার ঊর্ধ্বে যে শিল্পসৌকর্য তার নাগাল সে পেত কি না! হয় তো সেও তোমার মতো এর মধ্যে শুধু নরনারীর অন্তরঙ্গতাটুকুই দেখতে পেত। কোণার্ক মন্দিরের ভাস্কর্য অনবদ্য!

মীনু অধোবদনে কী যেন ভাবল একমুহূর্তের জন্য। তারপর বললে, সে নিশ্চয় রাজি হতো! সে তো তোমার স্ত্রী। তোমার কাছে তার আবার লজ্জা কী?

রূপেন্দ্র বললেন, এটা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। 'লজ্জা' একটা অদ্ভুত মনোবৃত্তি। তুমি তো একা-একাও ওগুলি ঘুরে দেখতে রাজি হলে না — আমি বলা সত্ত্বেও যে, কোণার্ক মন্দিরের ভাস্কর্য গোটা হিন্দুস্থানের মধ্যে অতি অনবদ্য এক দ্রষ্টব্য! কেন রাজি হলে না মীনু? যেহেতু, তুমি নিরাসক্ত হতে পারছ না; তোমার অবচেতনের একান্তে ওই বোধটা জাগ্রত রয়েছে যে, তোমার রূপোদা জানতে পারছে যে, তুমি এগুলি দেখেছো! অথচ তুমি যদি কুসুমমঞ্জরী হতে, তাহলে সানন্দে আমার সঙ্গে মন্দির পরিক্রমা করতে...না, না, বাধা দিও না মীনু...আমার বক্তব্যটা শেষ হয়নি — তুমি আমার 'খুড়িমা' হলে তোমার লজ্জা করা সঙ্গত — কিন্তু ভাইবোনের সম্পর্কটা যদি সত্য হতো, তাহলে...ভেবে দেখ, ওই বলভদ্র আর সুভদ্রা — ভেব না ওরা কিছু বোঝে না—

কথাটা তাঁর শেষ হল না, অন্তরীক্ষ থেকে দৈববাণী হল যেন, সব দেখিলেন, আইজ্ঞা?

অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলে যবনিকাপাত ঘটালেন রূপেন্দ্র, হ্যাঁ, দেখে এলাম। এবার স্নানের আয়োজন করা যাক। রোদের তাপ বাড়ছে...

—আইজ্ঞা! সুভদ্রা সে-পাকে অছে। আপনকারদের পদ্মদিঘি লই যিবে।

পদ্মদিঘিতে শুধু জলই নয়, পদ্মও এখনো আছে। পাথর-বাঁধানো প্রাচীন ঘাট জীর্ণ এবং বিপদজনক। বাঁশ ও কঞ্চি দিয়ে বানানো আর একটি ঘাটের কাছে সুভদ্রা ওদের পৌঁছে দিল। তার ভাই বলাই বৃদ্ধের কাছে পাহারায় আছে। পদ্মদিঘির চারধারে ঘন বন-জঙ্গল। স্নানের ঘাট সম্পূর্ণ নির্জন। কিন্তু ঘাট একটাই — পুরুষ-স্ত্রীর পৃথক ঘাট নেই। মৃন্ময়ী সুভদ্রার দিকে ফিরে বলে, তুই ছান করতে এলি আর একটা শুকনো কাপড় নিয়ে এলি না? কী বোকা রে তুই?

সুভদ্রা নতনয়নে নীরব রইল।

রূপেন্দ্র এই জনহীন জলাশয়ের পদ্মফুলগুলিকে দেখছিলেন। দর্শকের অভাবে তারা সৌন্দর্য বিকাশের পথে কোনও বাধা মানেনি। কোণার্কশিল্পী — যাঁরা ওই অনবদ্য ভাস্কর্যগুলি গড়েছিলেন — তাঁরা নিশ্চয় দর্শকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন — কিন্তু এই পদ্মবনের অযুত-নিযুত পদ্ম গড়েছেন যে প্রকৃতি তিনি দর্শক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। হঠাৎ রূপেন্দ্র বলে বসেন, এবারও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছো, মৃন্ময়ী। এটা ওই কিশোরীর নির্বুদ্ধিতাজনিত হেতুতে নয় — জগন্নাথধামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ওকে তোমার একটি ব্যবহৃত বস্ত্র দান করে যেও...

—মানে?

—মানে, লোকসমাজে পরিধানের উপযুক্ত ওর দ্বিতীয় আচ্ছাদন নাই! সচরাচর এই নির্জনে ও নগ্নস্নান করে থাকে, যা আজ সম্ভবপর নয়। সিক্তবসনেই ওকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সুভদ্রা কিছুই বুঝতে পারে না। যাতে না পারে তাই রূপেন্দ্র অত্যন্ত দ্রুত উচ্চারণে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষে মৃন্ময়ীকে বক্তব্যটা জানিয়েছেন। মৃন্ময়ী বলে, বুঝলাম। ওঁর না হয় দারিদ্র্যজড়িত বিড়ম্বনা — ঠাকুরমশায়ের ক্ষেত্রে হেতুটা কী? মহাশয় কেন একবস্ত্রে এসেছেন?

—আমি অশ্বারোহণে এসেছি। ওজন কমাতে চেয়েছি। একবেলা সিক্তবস্ত্রে থাকলে আমার অসুখ করবে না।

—হয়েছে মশাই, হয়েছে! একজন তো জ্বরে কাৎ হয়েছেন, আর একজনও হোন! আমার মাথায় এই বিদেশ-ভুঁইয়ে আকাশ ভেঙে পড়ুক!

—তার মানে আমাকে স্নান করতে বারণ করছ?

—আজ্ঞে না, মশাই। আপনি একটু আড়ালে যান। সুভদ্রা তিন ডুব দিয়ে এক ছুটে বাড়ি চলে যাবে। আর আমি স্নান সেরে ওই ঝোপের আড়ালে গিয়ে ভিজে শাড়ি পালটাবো। তারপর ওই ভিজে শাড়িটা জলকাচা করে দেব, তাই পরে আপনি ছান করবেন!

—আমি তোমার শাড়ি পরবো?

—কেন? জাত যাবে তাইলে?

—না, যাবে না। তোমার কাছে আমার অথবা আমার কাছে তোমার আবার সঙ্কোচ কিসের? এই তো সেদিন দুর্গাখুড়ো বলছিলেন, 'তোমার খুড়িমা তো বিনা-ঘুনসি-যুগে তোমাদের দাওয়ায় হামা দিয়ে ফিরেছেন।'

—'বিনা-ঘুনসি-যুগে' মানে?

—মানে নিতান্ত শৈশবে। যখন পরিধেয় বস্ত্র তো ছাড়, তোমার মাজায় ঘুনসি বাঁধার কথাও কারও মনে পড়েনি!

মীনু দু-হাতে মুখ ঢাকে — কী অসভ্য তোমরা!

—তাহলে আড়ালে যাই? তা আড়ালেই যদি যেতে হয় তাহলে তুমিই বা শুধু শুধু শাড়িটা ভিজাবে কেন? এখানে তো ত্রিসীমানায় লোকজন নেই।

মৃন্ময়ী অবাক হয়ে বললে, তার মানে?

—মানেটা বোঝা কি এতই শক্ত? আমি 'বিনাঘুনসি-স্নানের' কথা বলছি!

মৃন্ময়ী ছোট একটা পাথর ছুঁড়ে মারল রুপোদাকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

রূপেন্দ্র বললেন, ফসকে গেল তো? চলি!

মৃন্ময়ী বললে, না। একটু দাঁড়াও রুপোদা।

—আবার দাঁড়াব? কেন?

—স্নানের আগে তোমার পায়ে একটু আবীর দেব। আজ দোলপূর্ণিমা।

ওর পেটকোঁচড়ে যে আবীরের পুঁটলি ছিল, এতক্ষণ তা মনেই পড়েনি। মৃন্ময়ী তা থেকে একটু আবীর নিয়ে রূপেন্দ্রের পায়ে দিল, সুভদ্রার মুখে মাখিয়ে দিল। রূপেন্দ্র বললেন, আমাকে একটু আবীর ধার দেবে মীনু? তাহলে আমিও সুভদ্রার কপালে টিপ পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করতাম।

মৃন্ময়ী তার কোঁচড় থেকে পুলিন্দাটা বার করে দিল। রূপেন্দ্র ওই কিশোরীর কপালে-গালে আবীর মাখিয়ে দিলেন। সুভদ্রা দুজনকে প্রণাম করল। রূপেন্দ্র মৃন্ময়ীর দিকে ফিরে বললেন, মনে আছে মীনু — তুমি যখন ওই সুভদ্রার বয়সী, তখন এক দোলপূর্ণিমায় আমি

pathagar.net

তোমার মুখে আবীর দিতে চেয়েছিলাম। তুমি দৃঢ় আপত্তি করে দু-হাতে মুখ ঢেকে বলেছিলে: না!

বিনা আবীরেও মৃন্ময়ীর গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। বলল, বল তো রুপোদা, সে সময় কে বেশি বোকা ছিল? তুমি না আমি?

—দুজনই সমান নির্বোধ ছিলাম। তাই আমি তোমার আপত্তিটা মেনে নিয়ে বলেছিলাম: 'বোকা মেয়ে! এত ভয়!' নির্জনে পেয়েও তোমার কপালে শুধু একটি টিপ পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম! গালে-মুখে মাখাতে সাহস হয়নি।

—আজ বুঝি তার শোধ নিতে চাও? সুভদ্রার সামনেই?

রূপেন্দ্র জবাব দিলেন না। দু-হাতে আবীর নিয়ে মাখিয়ে দিলেন মীনুর মুখে-মাথায়-গালে-গলায়!

মীনু থরথর করে কেঁপে উঠল। আর খিলখিল করে হেসে উঠল সুভদ্রা। পরমুহূর্তেই পদ্মপুকুরের অতলতলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মীনু।

অপরাহ্নের দিকে দুর্গা গাঙ্গুলীর জ্বরটা ছেড়ে গেল; কিন্তু তিনি কিছুতেই সে-রাত্রে জগন্নাথধামে প্রত্যাবর্তনে স্বীকৃত হলেন না। সর্বাঙ্গে নাকি প্রচণ্ড বেদনা। পূর্ণিমা না ছাড়লে বাতের ব্যথাটাও কমবে না।

বুদ্ধি যোগালো দাসপাত্র।

pathagar.net

তার এক ভাইপো নাকি পৃথগন্ন হয়ে বাস করে পাশের বাড়িটাতেই। শ্যালিকার বিবাহ-উপলক্ষে সে দিনতিনেক হল সপরিবারে পিপ্‌লি গেছে। বাড়িটা খালি। বাড়ি বলতে অবশ্য মাঝারি মাপের একটা উলুখড়ের ঘর আর সংলগ্ন একচালা। ঘরে প্রায় ঘর-জোড়া তক্তাপোষ। তার উপর শীতলপাটি বিছানো। দাসপাত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ওই তক্তাপোষে সপরিবারে শয়ন করে ছেলে-মেয়েসহ সস্ত্রীক। ওঁদের তিনজনের স্থানাভাব হবার কথা নয়। রূপেন্দ্র আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই দুর্গাখুড়ো বলে ওঠেন — অ্যাই হল পাকা মাতার বুদ্ধি! কতায় বলে 'হলে সুজন, তেঁতুল পাতায় নজন'! ঠিগাছে! তাই ব্যবস্থা কর!

দাসপাত্রের ঘরণী মৃন্ময়ীকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে তার বিচিত্র ভাষায় যা বললে তার মর্মার্থ: তীর্থের পথে শয়নের কোন বাধা কি যাত্রীনিবাসে বা 'চটি'তে মানা চলে? শুধু দেখতে হবে কে কারে কোল-পাঁজরে নিয়ে শুলো। ব্যস! হাসতে হাসতে প্রৌঢ়া বললেন, 'আপনার কর্তাটিরে কহিবে কি গোটে রাতির জন্য সুভদ্রাদেই হই যিবে।' — অর্থাৎ দেবী সুভদ্রা যেমন একপাশে বলরাম অপরপার্শ্বে জগন্নাথদেবকে নিয়ে নিত্যশোভমানা, মৃন্ময়ীর কর্তাও যেন তেমনি একরাত্রের জন্য একপাশে পিতা, অপর কোলপাঁজরে পত্নীকে নিয়ে শয্যাগ্রহণ করেন। এতে দোষ নেই!

মৃন্ময়ী প্রথমটা বুঝে উঠতে পারেনি, পরক্ষণেই তার কানদুটি লাল হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে কীভাবে কর্তার ভ্রান্তি গৃহিণীতে সংক্রামিত হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভুলটা ওরা ভেঙে দেয়নি — না মৃন্ময়ী নিজে, না রূপেন্দ্রনাথ। প্রয়োজনও বোধ করেনি। একটা রাত যে থাকতে হতে পারে, এটা তো আগে আন্দাজ করেনি। এখন — এত বিলম্বে, কী করা উচিত মৃন্ময়ী বুঝে উঠতে পারে না।

এ-বেলায় তিনজনেরই পূর্ণিমার পারণ — কাঁচা ফলার। মৃন্ময়ী অবশ্য পূর্ণিমায় দু-বেলাতেই অন্নসেবায় অভ্যস্ত; কিন্তু আজ অবস্থা বিপাকে সেও কলাটা-শশাটা দিয়ে মিষ্টান্ন-সহযোগে পিত্তিরক্ষা করল। সূর্যাস্ত হবার তর সইছে না আজি পূর্ণচন্দ্রের। কোণার্ক মন্দিরের বিমান আর জগমোহনের ফাঁকে — ওই যেখানে বিশাল ঝাম্পান-সিংহটা মারাত্মকভাবে ঝুঁকে আছে, পড়তে পড়তে পড়ছে না, সেই খাঁজে উঠল রুপোর থালাখানা। ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলছে অগুনতি জোনাকি। সমস্ত প্রকৃতি জ্যোৎস্নামদিরায় যেন মোহগ্রস্ত।

দাসপাত্র বাইরের দাওয়ায় একবালতি জল আর একটি পিতলের গাড়ু রেখে গেলেন।

একটি লাঠিও। পরামর্শ দিলেন, রাত্রে যদি কোনও দরকারে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে বেশিদূরে যাওয়া ঠিক হবে না। আর প্রতি পদক্ষেপে লাঠি ঠুকে-ঠুকে যাওয়াটা জরুরি। না, 'বড় শেয়ালের' উপদ্রব নেই — বনবিড়াল বা গুলবাঘারা মানুষকে ডরায় — তবে ভাঙা পাথরের স্তূপে বাস করেন 'তেনারা' — সেই যাঁদের নাম 'রেতের বেলা' করা মানা।

কুলুঙ্গিতে একটি পিতলের প্রদীপে যথেষ্ট রেড়ির তেল ঢেলে জ্বেলে দিলেন। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, কোনও প্রয়োজন নেই — চাঁদের আলোই তো আছে। তা আছে, জানলা দিয়ে একমুঠো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শীতলপাটিতে। কিন্তু বৃদ্ধ বললেন, না, বাতিটা জ্বলুক। নতুন জায়গা। রাতে ঠোক্কর খাওয়ার ভয় আছে। তাঁকে রাতে বার দুই-তিন বাইরে যেতে হয়।

দাসপাত্র-গৃহিণীর মতো শয়নের ব্যবস্থা অবশ্য করা হয়নি। দুর্গা গাঙ্গুলী মধ্যমণি। গো-গাড়িতে আসার সময় মৃন্ময়ী দুটি কার্পাস-উপাধান এনেছে। সে দুটি ওঁদের দুজনকে দিয়ে নিজে একটা পুঁটলি মাথায় দিয়ে একপ্রান্তে শুয়েছে। দুর্গা একটি খেদোক্তি করলেন, বৃথাই গা-গতরে ব্যথা হল, টাকাগুলান জলে গেল! 'অক্কতীথো' না কোন ঠাকুর-দেবতা, না হল 'তীথ্যস্তান'!

রূপেন্দ্র বললেন, মন্দির-ভাস্কর্য কিন্তু অনবদ্য।

দুর্গা একটা বিজৃম্ভণমিশ্রিত প্রশ্ন করলেন, তোমরা দুটিতে ঘুরে-ঘুরে তাই দেখলে বুঝি সকালে?

—না! খুড়িমা আর দেখলেন কোথায়? উবড়ো-খাবড়া পাথুরে জমিতে হাঁটতে ওঁর পায়ে লাগছিল। আমি একাই দেখলাম, দুপুরে।

মৃন্ময়ী অবাক হল। মানুষটা নিপাট সাত্ত্বিক! কিন্তু আজকাল মিছে কথা আটকায় না ওর জিবে। আশ্চর্য!

'দুর্গা শ্রীহরি' বলে পাশ ফিরলেন মধ্যমণি। ধর্মপত্নীমুখো হলেন এতক্ষণে। মৃন্ময়ী সারা গায়ে আঁচলটা টেনেটুনে তাঁর দিকে পিছন করে পাশ ফিরল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল বৃদ্ধের নাসিকাধ্বনি। রূপেন্দ্রের নিশ্বাসও সমতালে শোনা যেতে থাকে। দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না মৃন্ময়ীর। তার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে সারা দিনের অভিজ্ঞতা। মুখে আবীর মাখা, স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন; চুরি করে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা — শাড়ি পরে নগ্নগাত্রে রূপেন্দ্রের স্নানদৃশ্য! — আচ্ছা, সে যখন স্নান করছিল, তখন উনিও কী... ? নাঃ! তা হতেই পারে না। কিন্তু দুপুরে একা-একা ওই বিশ্রি পাথরের মূর্তিগুলো তো ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন! তখন তো বিবেকে বাধেনি? ...মনে পড়ে গেল, একঝলক-দেখা দণ্ডায়মান দুটি নরনারীর অন্তরঙ্গ সঙ্গমদৃশ্য! এক-সন্তানের জননী মৃন্ময়ীর এ-বিষয়ে কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গ পর্যায়

বলতে ও বোঝে নীরন্ধ্র অন্ধকারে এক বৃদ্ধের কামেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা। নায়িকাও যে সক্রিয় হতে পারে, হয়, এটা ওর ধারণার বাইরে। ...মনে হচ্ছে, ভুল করেছে ফিরে এসে। নিশ্চয় শুধু চোখের দেখায় দোষের কিছু ছিল না — থাকলে, রুপোদা একা-একা তা ঘুরে-ঘুরে দেখতো না।

নিঃশব্দে মৃন্ময়ী উঠে বসে। স্বামীকে ডিঙিয়ে ও-পাশের ঘুমন্ত মানুষটাকে দেখে। নগ্নগাত্রে চিৎ হয়ে আছেন রূপেন্দ্র। একমুঠো চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে, বুকে। নিশ্বাসের তালে তালে উপবীতশোভিত কবাটবক্ষটা উঠছে-নামছে! একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মীনু; ওর মনে পড়ে গেল কুসুমবৌঠানের কথা। আচ্ছা কুসুমমঞ্জরীরও কি এমন ঘুম-না-আসা চাঁদনী রাতে ওই মানুষটাকে এমন করে লুকিয়ে দেখত? শুধুই দেখত? তারপর কি ইচ্ছে হলে পাথরের মূর্তির ওই নায়িকার মতো...

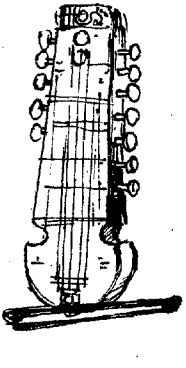

দুর্গা গাঙ্গুলী কাশলেন।

তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ল মৃন্ময়ী। দুর্গা উঠলেন। বসলেন। ইতি-উতি কী যেন খুঁজছেন তিনি। মৃন্ময়ী মৃদুভাষে প্রশ্ন করে: কিছু খুঁজছেন?

এই এক বিড়ম্বনা! ও-পাশে রূপেন্দ্র ঘুমোচ্ছে বলে নয়, গাঙ্গুলীর এই চতুর্থপক্ষ তাঁর সন্তানকে জঠরে ধারণ করতে পারল, কিন্তু আজও 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'র নৈকট্যে আসতে পারল না।

বৃদ্ধ বললেন, না খুঁজছি না কিছু। কোন দিক দিয়ে নামব তাই ভাবছি।

মৃন্ময়ী জবাব দেবার আগেই রূপেন্দ্রনাথ একলাফে নেমে পড়েন চৌকি থেকে। বলেন, আসুন, এদিক দিয়ে। বাইরে যাবেন বুঝি?

—হ্যাঁ, লাঠিগাছখান দাও দিনি। তোমরা ভিতর থেকে দোরটা বন্ধ করে দাও বরং।

—কেন? আপনার কি ফিরতে দেরি হবে?

—না না, দেরি হবে কেন? এমন কিছু বেশি দেরি হবে না।

—তাহলে দরজা বন্ধ করার কী দরকার? আমি জেগেই বসে আছি। আপনি ঘুরে আসুন।

বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন, আঃ! সব কতায় তক্কো কর কেন বলতো? দোর খালি পেলেই তেনারা লতিয়ে লতিয়ে চৌকাট ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকেন। ঐ রেতে যাঁদের নাম করতে নেই। দোর বন্ধ করে দাও। আমি ফিরে এসে টোকা দিলে খুলে দিও বরং।

বৃদ্ধ যাবার সময় দোরটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন। রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজা বন্ধ করতে

pathagar.net

এগিয়ে গেলেন না। ফিরে এসে তক্তাপোষে বসলেনও না ফের। দরজার পাশে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলেন। মৃন্ময়ী বসে আছে। শোয়নি। প্রদীপটা জ্বলছে। রূপেন্দ্রনাথের ছায়া পড়েছে বিপরীত দেওয়ালে। মধ্যগগনে উন্নীত চাঁদের একমুঠো চৌকো নকশাটা, জানলার ফোকর দিয়ে চুরি করে ঘরে ঢুকে যেটা এতক্ষণ চৌকির ওপর লুটোপুটি খাচ্ছিল — সেটা নেমে পড়েছে বিছানা থেকে। যেন রূপেন্দ্রকে অনুসরণ করে। মৃন্ময়ী বললে, দাঁড়িয়ে কেন? বস, রুপোদা।

—না, ঠিক আছে।—দাঁড়িয়েই জবাব দিলেন রূপেন্দ্র।

ভ্রূকুঞ্চন হল মৃন্ময়ীর। পরক্ষণেই বললে, ও! সে-কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। ঠিক আছে, আমিই না হয় দাঁড়িয়ে থাকছি। বস, তুমি। কিন্তু নির্জন ঘরে এক বিছানায় তো আমরা আগেও বসেছি, রুপোদা? বসিনি?

হঠাৎ হেসে ওঠেন রূপেন্দ্র: দূর পাগলি! না, না, সেসব কিছু নয়। বস তুই। এই তো আমি বসছি।

যথেষ্ট দূরত্ব রেখে দুজনে চৌকির দু'প্রান্তে বসলেন। মধ্যবর্তী অন্তর্হিত বৃদ্ধের উপস্থিতি সম্বন্ধে দুজনেই সচেতন।

রূপেন্দ্র বালিশে ঠেশান দিয়ে আধশোয়া, মৃন্ময়ী কিন্তু বসে আছে। হঠাৎ বললে, দুপুরে মন্দির দেখতে আবার যখন গেলে, তখন আমাকে ডাকলে না কেন?

—বাঃ! তুই তো দেখ্‌বি না বল্‌লি?

—মানুষের মন কি বদলায় না? তুমিও তো এককালে বলতে সারা জীবনে বিয়েই করবে না...

রূপেন্দ্র তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে দিলেন, ঠিক আছে বাপু! তুই যদি চাস, কাল সকালে আমরা আবার মন্দির ঘুরে দেখতে পারি।

—তোমার খুড়োমশাই কি জানেন, মন্দিরে কী জাতের মূর্তি আছে?

—বোধহয় না। কেন?

মৃন্ময়ী 'কেন'র জবাব দিল না। জানতে চাইল, তোমার খারাপ লাগেনি, রুপোদা? গা ঘিনঘিন করেনি?

—না তো! গা ঘিনঘিন করবে কেন? মূর্তিগুলো তো অনবদ্য!

—চূড়ান্ত 'অশ্লীল' নয়?

—অন্তত আমার কাছে নয়। 'শ্লীল-অশ্লীল' শব্দগুলো আপেক্ষিক। যুগে-যুগে তার সংজ্ঞা বদলায়!

—বুঝলাম না।

—স্বাভাবিক। যেহেতু 'শিল্প' সম্বন্ধে তোর কোনও প্রাথমিক জ্ঞান নেই। কিন্তু খুড়ো এখনো ফিরছেন না কেন? একটু এগিয়ে দেখব?

মৃন্ময়ী জবাব দিল না। রূপেন্দ্র নিজেই উঠে গেলেন। দোর খুলে বাইরে বের হলেন। পূর্ণিমার আলোয় বহু দূর পর্যন্ত পরিষ্কার নজর যাচ্ছে। ত্রিসীমানায় বৃদ্ধকে দেখা গেল না। রূপেন্দ্র দাওয়া থেকে নেমে পড়লেন। এদিক-ওদিক রীতিমতো সন্ধান করে অনেকক্ষণ পরে

pathagar.net

ফিরে এলেন। মৃন্ময়ী একই ভঙ্গিতে বসে আছে, হাঁটুর ওপর চিবুকটা রেখে। রূপেন্দ্র বললেন, আশ্চর্য, খুড়োকে ত্রিসীমানায় কোথাও দেখতে পেলাম না।

মৃন্ময়ীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললে, এখন কী করবে?

—তাই তো ভাবছি!

—ওঁর কোনও বিপদ হয়েছে বলে কি তোমার মনে হচ্ছে, রুপোদা?

—বিপদ! না, বিপদ কী হতে পারে? নরখাদক বাঘ এ-তল্লাটে নেই, তা দাসপাত্র আগেই বলেছেন। খুড়োর কাছে কানাকড়ি নেই। তিনি যুবতী নারীও নন — যে কেউ অপহরণ করবে। তাছাড়া তেমন কিছু ঘটলে তো খুড়ো চিৎকার করতেন!

—তাহলে?

—'তাহলে' মানে?

—ওঁর এই ব্যবহারের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে তো!

হঠাৎ এই সমস্যার সমাধানটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওঁর কাছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওঁর। গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি কি এটা জানতে, মৃন্ময়ী?

তৎক্ষণাৎ চৌকি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মীনু। ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললে, বিশ্বাস কর রুপোদা, আমি...আমি কিছুই আন্দাজ করিনি। উনি এই ষড়যন্ত্রের কথা মনে রেখেই এখানে ভাঙা-মন্দির দেখতে এসেছেন। আমাদের দুজনকে এভাবে একঘরে বন্দি করার ফন্দি এঁটে! কিন্তু এই বিশ্রী ষড়যন্ত্রের কথাটা আমি কিছুই জানতাম না।

—তাহলে, আমার আগে তুমি ব্যাপারটা এমন চট করে আন্দাজ করলে কেমন করে? তুমি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী বলে?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মীনু। বললে, না, না, না! অমন করে বল না, রুপোদা! আমরা দুটিতে ষড়যন্ত্র করে এই দুর্ঘটনাটা ঘটাইনি। তোমার আগে আমি ওটা বুঝতে পেরেছি, তার দুটো কারণ। প্রথমত, ওই ফন্দিবাজ বুড়োটাকে তুমি ঠিক চেন না, আমি হাড়ে হাড়ে চিনি! দ্বিতীয়ত, আমি একটা কথা জানি, যা তুমি জান না—

—সেটা কী?

—তোমার খুড়োকে আমি শাসিয়ে রেখেছি — ওই যজ্ঞ-টজ্ঞ করার আগে আমি গলায় দড়ি দেব! তোমার খুড়ো বুঝতে পেরেছে...ওভাবে হবে না। বিশ্বাস কর...

রূপেন্দ্র বোধকরি বিশ্বাস করলেন। বললেন, আঃ! পা ছাড়। যা চৌকিতে উঠে বস্। আর বসবিই বা কেন? অনেকটা রাত বাকি। শুয়ে পড়।

—আর তুমি?

—আমিও শোব। চৌকির এদিকে। অহেতুক রাত জাগবো কেন?

—আমাকে নিয়ে এভাবে এক বিছানায় শুতে তোমার আপত্তি হবে না?

জবাব না দিয়ে রূপেন্দ্র এগিয়ে গেলেন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করতে।

—ও কি করছো, রুপোদা? দরজা কি ভেতর থেকে বন্ধ থাকবে?

—থাকবে না? যে লোকটা আমাদের এ-ঘরে থাকতে দিয়েছে, তার কী দোষ? তার সব কিছু চুরি হয়ে যাবে না, দোর খোলা থাকলে?

মৃন্ময়ী জবাব দিল না। দুজনেই উঠে বসলেন তক্তাপোষে। দুজনে শুয়েও পড়লেন —যথেষ্ট দূরত্ব রেখে।

দুজনেই জেগে। এবং দুজনেই জানেন যে, দুজনেই জেগে।

—রুপোদা?

—বল?

—তুমি বলতে পারবে ঠিক কতক্ষণ ধরে তুমি আমাকে 'তুমি'র বদলে 'তুই' বলছো?

—না। খেয়াল নেই। একথা কেন?

—তুমি আমাকে 'তুই-তুমি-আপনি' তিনরকম সম্বোধনই করেছ। জীবনের এক-একটা পর্যায়ে। তোমার কিছুই খেয়াল নেই, না?

—না। বল্ শুনি। ঘুম যখন হবেই না।

—সত্যি তোমার মনে পড়ে না, ঠিক কবে 'তুই' ছেড়ে আমাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলে?

—বলছি তো, মনে নেই। বল্ না।

—সেও ঠিক এমনি এক দোলপূর্ণিমাতে। হঠাৎ 'তুই' ছেড়ে আমাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলে? বলেছিলে, 'বোকা মেয়ে! রঙ মাখতে তোমার এত ভয়?'

—আশ্চর্য! তোর মনে আছে ঠিক কবে তোকে প্রথম 'তুমি' বলেছিলাম?

—থাকবে না? সেই প্রথম যে তোমার চোখে আমি 'খুকি' ছেড়ে একটি পুরোপুরি 'মেয়ে' হয়ে গেলাম! যাক সে-কথা, কিন্তু আজ ঠিক কোন মুহূর্ত থেকে আমি 'তুমি' থেকে 'তুই' হয়ে গেছি বলতো?

—জানি না। তুই-ই বল?

pathagar.net

–ঠিক যখন বুঝতে পারলে, আমি এ-ষড়যন্ত্রের অংশীদার নই; আর বুঝতে পারলে আমাকে এই ঘরে অরক্ষিত একা রেখে তুমি চলেও যেতে পারবে না। আমাদের দুজনকেই এই চৌকিতে শুয়ে বাকি রাতটা কাটাতে হবে। তাই না? নিজের মনকে তুমি ঠিক তখনই বোঝাতে চাইলে যে, আমি পরস্ত্রী নই, আমি যুবতী নই, আমি তোমার সেই ছোট্ট মীনু। বল? ঠিক বলিনি?

—তুই চিরটাকালই পাগ্‌লি রয়ে গেলি, মীনু। নে, এবার ঘুমাবার চেষ্টা করা যাক!

হঠাৎ উঠে বসল মৃন্ময়ী। বলল, না! এমন একটা অবাক রাত আমার জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে না। আমি ঘুমাব না, সোনাদা!

—সোনাদা?

—হ্যাঁ, তোমার মনে নেই? ছোটবেলায় তোমার ওপর খুশি হলে আমি তোমাকে 'রুপোদা'র বদলে 'সোনাদা' ডাকতাম!'

রূপেন্দ্র হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ রে, মনে আছে! কিন্তু আজকে হঠাৎ আমার উপর খুশি হয়ে ওঠার কারণটা কী?

—তুমি যে মেনে নিলে, আমার একমাত্র পরিচয় এটাই নয় যে, আমি তোমার খুড়িমা, আমি পরস্ত্রী! আমি আজও সেই পড়শি-মেয়েটাই আছি, তোমার চোখে সেই মীনুই!

রূপেন জবাব দিলেন না। কথা বাড়ালেই কথা বেড়ে যায়।

—তোমারও ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু, সোনাদা।

—নাকি? কেমন?

—আগে তুমি কিছুতেই মিছে কথা বলতে পারতে না। এখন কিন্তু অনায়াসে বল। এই তো একটু আগে তোমার খুড়োকে বললে, পাথুরে জমিতে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি তোমার সঙ্গে মন্দির ঘুরে দেখিনি।

রূপেন্দ্র বললেন, দ্যাখ, মীনু, মিছে কথা আমি আগেও বলতাম না, এখনো বলি না। তবে 'সত্য' বস্তুটার সংজ্ঞা ক্রমে ক্রমে বদলে যাচ্ছে আমার ধারণায়। আগে মনে হতো, যা বাস্তবে ঘটেছে সেটাই সত্য, এখন মনে হয় : শিব ও সুন্দরের সঙ্গে যা সম্পৃক্ত শুধু সেটাই সত্য। বাস্তবে তা ঘটুক-না-ঘটুক!

—বুঝলাম না।

—স্বাভাবিক। এ-সব কথা বুঝবার মতো শিক্ষার সুযোগ তো তোর পাস না।

—আচ্ছা, বৌঠানকেও কি তুমি এভাবে কথায়-কথায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে?

রূপেন্দ্রনাথ লজ্জা পেলেন। বললেন, আমি দুঃখিত। তুই এ-কথায় আঘাত পাবি তা ভাবিনি। আমি কিন্তু সাধারণভাবে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার অভাবে হিন্দুসমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে চিন্তারাজ্যে একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে!

—এবারও আমার বলার কথা : 'বুঝলাম না'; কিন্তু তা আমি বলবো না — কারণ তুমি তাতে বিরক্ত হবে। বরং তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা সোনাদা, আমার অনুরোধে তুমি খুড়োকে একটা মিছে কথা বলতে পারো? আমার ভালোর জন্যে?

—ভূমিকা না করে সোজাসুজি বল না : কী কথা?

—না, সামান্য একটু ভূমিকা আমাকে করতেই হবে। কথাটা 'কী' তা বলার আগে আমি বলে নিতে চাই : আমি মরতে চাই না, সোনাদা! জীবনে যা চেয়েছিলাম, তা পেলাম না। কোনদিন পাবও না। অর্থের অভাব আমার নেই; কিন্তু অর্থ তো চাইনি আমি, যখন ছেলেবেলায় শিবপুজো করতাম, পুন্নি পুকুর করতাম? হ্যাঁ, জীবনে আমি সুখী নই; কিন্তু তাই বলে বাঁচবার ইচ্ছে আমার শেষ হয়ে যায়নি।

—ঠিক কী বলতে চাইছিস্, মীনু?

—কাল তুমি তোমার খুড়োকে একটা মিছে কথা বলবে?

—'মিছে কথা'! কী কথা?

—বলবে : যজ্ঞ-টজ্ঞর দরকার নেই। ওসব ব্যবস্থা ওকে করতে হবে না।

—আমার কথা সে শুনবে কেন? ও-কথা তো আমি খুড়োকে আগেও বলেছি।

দপদপ্ করে প্রদীপটা নিবে গেল। তাই দু-হাতে মৃন্ময়ীকে আর মুখটা ঢাকতে হল না। তার দু-চোখ ছাপিয়ে যে অশ্রুর বন্যা নেমেছে তা ওর সোনাদা দেখতে পাচ্ছে না। অতিমৃদু স্বরে মৃন্ময়ী বললে, এবার শুনবে। যদি তুমি মিছে করে বলতে পার — আজ রাতের পর আর ওসবের দরকার নেই, বলবে...আমি, ...আমি, ...কীভাবে বোঝাবো তোমাকে? বলবে আমি...আজ রাতেই আবার 'মা' হয়ে গেছি!

রূপেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসলেন। প্রদীপ নিভে গেলেও এতক্ষণে চাঁদের আবছা আলোয় চোখটা সয়ে এসেছে। মীনুকে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, কিন্তু তার অবস্থানটার অভাস পাওয়া যায়। মেয়েটা উবুড় হয়ে শুয়েছে, দু হাতে মুখ ঢেকে। রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, মীনু কী নিদারুণ পরিস্থিতিতে পড়েছে! একথা কি মুখ-ফুটে বলার? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, তুমি জান না, মীনু, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও-কথা বলা যায় না।

—বিজ্ঞানসম্মতভাবে কী-কথা বলা যায় না!

—ঐ যা তুমি বললে, নরনারীর এক রাত্রেই মিলনেই মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে যাবে।

—তোমার খুড়ো তা জানে না। ও ঝাড়-ফুঁক-কবচ-মাদুলি সব বিশ্বাস করে। তোমার মতো ধন্বন্তরির মুখের কথাই সে বেদবাক্য বলে মেনে নেবে।

রূপেন্দ্রনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ধর, নিল! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তো তুই ধরা পড়ে যাবি?

—যাব। কিন্তু ততদিনে আমরা সোঞাই পৌঁছে যাব। সেখানে আমি এতটা অসহায় নই। আমার জা আছে, শোভারানী আছে, দেওর আছে। সেখানে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও যা-খুশি তাই করতে পারবে না।

কথাটা যুক্তিযুক্ত। রূপেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক আছে রে, মীনু। তোকে কোনদিনও হাতে করে কিছু দিতে পারিনি। আজ তোর মুখ চেয়ে এই মিছে কথাটাই না-হয় বলব আমি। তাছাড়া, আমার মতে এই মিথ্যা ঘোষণার সঙ্গে 'শিব' এবং 'সুন্দর' সম্পৃক্ত — তাই এ 'সত্য'। তোর হাতে যে বিষ তুলে দিতে হল না, এতেই আমি সুখী! কিন্তু আর কথা নয়। এবার ঘুমাবার চেষ্টা কর বরং।

আবার দুজনে শুয়ে পড়লেন। চৌকির দু-প্রান্তে। মাঝখানে অনেকটা জায়গা খালি পড়ে থাকল। রূপেন্দ্র জানতেও পারলেন না অদূরে নিঃশব্দ অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে একটি অনিদ্রিতা যুবতী। অনিদ্রিতা এবং অনাদৃতা।

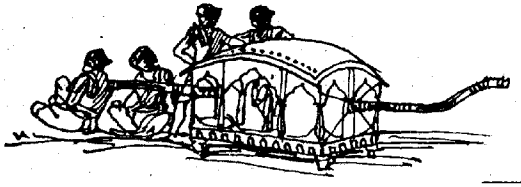

রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চাঁদ অস্ত গেছে, অথবা পশ্চিম দিগন্তে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। এদিকে ফর্সা হতে শুরু করেছে পুবের আকাশ। সূর্য আসন্ন। এখনও জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শুকতারা। গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির কলকাকলি শুরু হয়ে গেছে —কিন্তু তা সুষুপ্ত রূপেন্দ্রনাথের শ্রুতিতে প্রবেশ করলেও মস্তিষ্কে কোন অনুরণন জাগাচ্ছে না। শেষরাতের একটা গা-সিরসির মিঠে হাওয়া বইছে।

রূপেন্দ্রনাথ সুষুপ্তি থেকে সুপ্তির রাজ্যে — নির্জ্ঞান থেকে সংজ্ঞান স্তরে উন্নীত হয়ে এখন 'স্বপ্নদর্শন' চেতনার তলে রয়েছেন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখছেন তিনি : কুসুমমঞ্জরী এসেছে ওঁর কাছে। বিছানায় ঠিক ওঁর পাশেই শুয়ে আছে। কোল ঘেঁষে।

প্রায় প্রতিরাত্রেই ইদানীং কুসুমমঞ্জরীকে স্বপ্ন দেখেন। বোধকরি সজ্ঞান চিন্তায় তার কথাই বেশি করে স্মৃতিচারণ করেন বলে। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে কুসুমমঞ্জরী দেখা দেয় একটা কালো অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢেকে। বোধকরি ওটা মৃত্যুলোকের কৃষ্ণ-চীনাংশুক যবনিকা। রূপেন্দ্রনাথ প্রতি রাত্রেই তাকে অনুরোধ করেন অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করতে, কিন্তু মঞ্জরী তা করে না, অথবা করতে পারে না। রূপেন্দ্র সেই স্বপ্নে-দেখা মঞ্জরীকে দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে যান আর সে ক্রমেই দূরে সরে যায়। স্বপ্নমঞ্জরী প্রতিদিনই কী-একটা কথা বলতে চায়, যা বলতে পারে না, বলা হয় না — তার আগেই ওঁর ঘুমটা ভেঙে যায়।

আজও-তাই হল। কুসুমমঞ্জরী এসেছে। কিন্তু এ কী! আজ আর নেই কোনও অবগুণ্ঠন, কৃষ্ণ যবনিকার রহস্যান্তরাল। শুধু তাই নয় — চিরব্রীড়াবনতা মঞ্জরী, আজ উদ্দাম — তার বক্ষাবরণ অন্তর্হিত। তার কামনা-বাসনা যেন যুগল সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো উদবেলিত। রূপেন্দ্রনাথ দুই হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিতে গেলেন — আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! চির লাজনম্রা কুসুমমঞ্জরী দূরে সরে গেল না। বরং ঝাঁপিয়ে পড়ল ওঁর কবাটবক্ষে

— কোণার্ক-জগমোহনের উপর-জঙ্ঘায় খোদিতা বিপরীতরত্যাতুরা রমণীর মতো!

রূপেন্দ্র ওর কর্ণমূলে বললেন, ধরা দিলে শেষ পর্যন্ত?

ওর সর্বাবয়ব তখন রতিরঙ্গে থরথর করে কাঁপছে। বোধকরি ওর অবচেতনে প্রত্যাখ্যাতা হবার একটা আশঙ্কা ছিলই — সেটা অপসৃত হতেই ও উদ্দাম হয়ে উঠল। রূপেন্দ্রর প্রশ্নের জবাবে কী একটা কথা বলতে গেল, বলা হল না — তার পূর্বেই রূপেন্দ্রর ওষ্ঠাধর নিবিড় নিষ্পেষণে নীরব করে দিল মেয়েটিকে। পরিরিম্সু কণ্ঠলীনার বাক্যস্ফূর্তির ক্ষমতা রইল না আর।

ক্ষণ-পল-দণ্ড নিয়ে তা মাপা যায় না — দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় — আযৌবনের চুম্বনতৃষ্ণা মিটিয়ে যেন ক্ষান্ত হল রত্যাতুরা। নিশ্বাস নিতে আলিঙ্গনমুক্তা হল। আর তৎক্ষণাৎ স্বপ্নস্তর ত্যাগ করে জাগর-বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করলেন রূপেন্দ্রনাথ। অনুভব করলেন, তাঁর বুকের ওপর উবুড় হয়ে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, নিজ দেহভারে যার স্তনযুগল ওঁর রোমশবক্ষে নিষ্পেষিত, সে কুসুমমঞ্জরী নয়! বালার্কসূর্যের আলোয় তাকে চিনতে পারলেন। স্বপ্নভঙ্গের তীব্র ক্ষোভে উঠে বসলেন, ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। মৃন্ময়ী পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল ওঁর বুকে —দুই দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেললেন ওর দুই বাহুমূল। যেন প্রতিবর্তী-প্রেরণায়। শুধু বললেন : ছিঃ!

বজ্রাহতা হয়ে গেল মৃন্ময়ী। এর মানে কী? ওর চোখে বলির পশুর দৃষ্টি! কাঁঠালপাতা খাওয়াতে খাওয়াতে আর আদর-সোহাগ করতে করতে হঠাৎ যখন ঘাতক খড়্গখানা হাতে তুলে নেয়, তখন বোধকরি এমনই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছাগশিশু। জানতে চায় : হঠাৎ কী হল?

হতভাগিনী মৃন্ময়ী, বেচারি বোঝেনি যে, এতক্ষণ যে মেয়েটি রূপেন্দ্রর আদর-সোহাগ উপভোগ করছিল সে এক স্বপ্ননায়িকা — যার ভূমিকায় অজান্তে আযৌবন-উপেক্ষিতা মীনু অভিনয় করেছে কয়েকটি খণ্ডমুহূর্ত!

রূপেন্দ্র চৌকি থেকে নেমে পড়েছেন। পোশাক পরিধান করতে শুরু করেছেন। মাথায় চড়ালেন উষ্ণীষ, মাজায় বেঁধে নিলেন তরবারি। এখনো পর্যন্ত দুজনেই নির্বাক। মীনু ইতিমধ্যে তার আঁচল দিয়ে সারা দেহ ঢেকে নিয়েছে। অপরিসীম লজ্জায় চরম অপমান আর সহ্যাতীত বেদনায় যেন পাথর হয়ে বসে আছে। রূপেন্দ্রনাথ দ্বারের অর্গল উন্মোচনের উপক্রম করতেই কোনক্রমে বলল, কোথায় যাচ্ছো?

ঘুরে দাঁড়ালেন রূপেন্দ্রনাথ। এই প্রথম সংযম হারালেন উনি। বললেন, কাল তুমি গা ঘিনঘিন করার কথা বলেছিলে, না মীনু? আমি যাচ্ছি পুষ্করিণীতে একটা ডুব দিয়ে আসতে।

নির্জলা মিথ্যাভাষণ। কিন্তু কেন? রূপেন্দ্র পণ্ডিত, রূপেন্দ্র জ্ঞানী! তাহলে তিনি কেন এটুকু বুঝলেন না যে, স্বপ্নজগতে তিনি যে আনন্দলাভ করেছেন সেজন্য তাঁর আত্মধিক্কার নিষ্প্রয়োজন — আর আত্মধিক্কার দেওয়ার প্রয়োজনে ওই হতভাগিনীর কাটা ঘায়ে লবণ-নিক্ষেপ অহৈতুকী ধর্ষকামিতার বিকার!

রূপেন্দ্রনাথ দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন। সকাল হয়ে গেছে। দেখলেন, অশ্বত্থবৃক্ষতলে দুর্গাখুড়ো মুখপ্রক্ষালন করছেন। তাঁর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হল। কিন্তু কেউ কোন সম্ভাষণ করলেন

না। রূপেন্দ্রর অশ্বটি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করছিল।

বিনা সম্ভাষণে রূপেন্দ্র অশ্বারোহণে যাত্রা করলেন — জগন্নাথধামের দিকে।

সূর্য তখনো ওঠেনি। পূর্বগগনে জেগে আছেন শুধু তামসাচারী দেবারিকুলের গুরু শুক্রাচার্য!

রূপেন্দ্র চলেছেন তাঁর বিপরীতে — দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে।

কাহিনীটি দীর্ঘ — অতি দীর্ঘ! সব কথা গুছিয়ে বলার না আছে সময়, না পরিবেশ। বস্তুত আমি — এ-কাহিনীর লেখক — এখনো অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি — কীটদষ্ট পুরাতন গ্রন্থের পাতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগকে। রূপমঞ্জরীর সন্ধানে আমার হালও সেই : 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর!'

তোমরা অবশ্য ও-কথা বলতে পার : বাপু হে, লেখক! এতক্ষণ ধরে ধানাই-পানাই করলে — রূপেন্দ্রনাথের কথা বলেছো, কুসুমমঞ্জরীর কথাও, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম নারী-বিদ্রোহিণী রূপমঞ্জরীর কোনও আভাসও তো এ-পর্যন্ত দিতে পারোনি। সে কোথায়?

তা বটে! এবার সংক্ষেপে শেষ করে সে-কথাই বলি :

যতদূর জানতে পেরেছি, রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে জগন্নাথধামের গোবর্ধনমঠে সমকালীন শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎকারটি আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি। শঙ্করাচার্য জানতে চেয়েছিলেন : ক্যা মাংতা হ্যয় রে, বেটা?

রূপেন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গৌড়মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বর্ধমানভুক্তির এক ভেষগাচার্য। গোবর্ধনমঠে এসেছেন পূর্বাঞ্চলের ধর্মগুরুর নিকট কিছু সামাজিক অনুশাসন সম্বন্ধে অবহিত হতে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে, বাল্যবিবাহনিরোধ বিষয়ে, সহমরণপ্রথা-বর্জন বিষয়ে।

ধর্মগুরুর ভস্মাচ্ছাদিত ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়েছিল। তিনি এবার সংস্কৃত ভাষায় জানতে চাইলেন : প্রশ্নকর্তা দশনামী কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত।

রূপেন্দ্র জানিয়েছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী নন, গৃহী। তিনি মন্ত্রদীক্ষাও গ্রহণ করেননি, সৎগুরুর সন্ধান পাননি বলে।

শঙ্করাচার্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, সর্বপ্রথমে সৎগুরুর সন্ধান কর্, দীক্ষা গ্রহণ কর্, জপ-তপ-সাধন কর্ — না হলে মুক্তি পাবি না।

pathagar.net

অন্তরের বিরক্তি চেপে এবার রূপেন্দ্র বলেন, আমি মুক্তির সন্ধানে আসিনি, আচার্যদেব! আমি জানতে এসেছি : স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং সহমরণপ্রথা সম্বন্ধে আপনার কী সামাজিক অনুশাসন?

শঙ্করাচার্য ওঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন : না, ব্রাহ্মণকন্যার আট বছর পর্যন্ত সারস্বত-সাধনায় বাধা নাই। অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালিকাদের অক্ষর-পরিচয় নিষ্প্রয়োজন — তারা বার-ব্রত-পূজাবিধি শিখবে। ওই অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত। কারণ : অষ্টমবর্ষেতু ভবেৎ গৌরী। তারপর বালিকাদের ধ্যানজ্ঞাননিদিধ্যাসন শুধুমাত্র তাদের পরমপতিদেবতা! বিধবা? তার সন্মার্গ : সহমরণ! অন্যথায় দীক্ষাগ্রহণ, গুরুচরণারবিন্দ-আশ্রিত নিষ্ঠাময়ীর জীবন!

চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে রূপেন্দ্রনাথ নিষ্ক্রান্ত হলেন গোবর্ধনমঠ থেকে। এখানে হল না। হবে না। সংস্কারমুক্ত মহাজ্ঞানীর সন্ধান কোথায় পাবেন? দ্বারকা? রামেশ্বরম্? হিমালয়? নাকি ষড়্‌গোস্বামী-অনুসারী উত্তরসূরীর পদরজধন্য বৃন্দাবনধাম?

নিতান্ত ঘটনাচক্রে এই সময় পথিপার্শ্বে এক ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। পাকদণ্ডী পথে রূপেন্দ্র হনহন করে এগিয়ে চলেছেন। গাছের ছায়ায় শুয়েছিলেন অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসী। সাদা বাঙলায় ডাক দিয়ে বললেন, বাবা! একটু এদিকে আসবি?

রূপেন্দ্র থমকে থেমে পড়ে বলেছিলেন, আমি কপর্দকশূন্য, সন্ন্যাসীঠাকুর।

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একগাল হেসে বৃদ্ধ বলেছিলেন : তোর কাছে কপর্দক তো ভিক্ষা করিনি, একবগ্গা-বেটা!

রূপেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত। এগিয়ে এসে বলেন : আপনি আমাকে চেনেন? এর আগে কখনো দেখেছেন?

—না রে বেটা! তবে এটুকু জানি, তুই একবগ্গা-কোবরেজ, আর জানি গোবর্ধনমঠের গোয়ালে পাঁচনবাড়ির ঠ্যাঙানি খেয়ে কেন্দ্রাপসারী পথে নিরুদ্দেশে ছুটে চলেছিস!

—'কেন্দ্রাপসারী' বললেন ঠাকুর?

—ভুল বললাম নাকি রে? বলবিদ্যায় কেন্দ্রের অভিমুখের আকর্ষণকে তো কেন্দ্রাভিকর্ষী বলে! তার মানে কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়াকে...তবে পড়াশুনা তো বহুদিন করি না — সব ভুলে গেছি রে, বেটা...

রূপেন্দ্র ওঁর পদপ্রান্তে বসে পড়ে বলেন, ডাকছিলেন কেন, বলুন?

—ধুনির আগুনটা নিবে গেছে। চকমকি ঠুকতে পারি না। হাতে জোর নেই। আগুনটা জ্বেলে দিবি?

—দেব, নিশ্চয় দেব।

ধুনি জ্বেলে দিলেন, টিকেয় আগুন দিয়ে বড় ছিলিমটা ধরিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর প্রাণপণ বাধা সত্ত্বেও তাঁকে মকরধ্বজ জাতীয় কী-একটা ওষুধ খাইয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এবার বলুন, কী করে জানলেন আমার নাম, আর আমি যে গোবর্ধনমঠে ব্যর্থকাম হয়েছি।

ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীই দিলেন পথের সন্ধান। স্বীকার করলেন, সাধনার প্রথম স্তরে কিছু কিছু 'বিভূতিলাভ' করে উনি ভুল করে বসে আছেন। ছলনাময়ীর লীলা! মানুষজনকে

দেখলেই বুঝতে পারেন, সে কালো না ভালো! তার 'সামান্য পরিচয়'!

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছি তা জানেন?

—না রে, বেটা, তবে এটুকু জানি : তোর নিজের মুক্তির পথ নয়!

রূপেন্দ্র তখন সব কথা খুলে বলেন। কী তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

সন্ন্যাসী বললেন, তোর সমস্যার সমাধানের কথা আমি বলতে পারব না বাপু! কিন্তু যে পারবে তার হক্-হদিস বাতাতে পারি। না — দ্বারকা, রামেশ্বরম্, যোশীমঠ নয়, বৃন্দাবনধামও নয়। তুই সোজা কাশীধামে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণজোড়া জড়িয়ে ধর!

রূপেন্দ্র সহাস্যে বললেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর! বাবা বিশ্বনাথ লিঙ্গমূর্তি! তাঁর চরণজোড়া আমি পাব কোথায়, যে জড়িয়ে ধরবো?

—পাবি রে, বেটা পাবি! অচল বিশ্বাস রাখ! তাহলেই অচল বিশ্বনাথ নয়, সচল বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ পাবি! কাশীতে নয়, ব্যাসকাশীতে। তাঁরই চরণজোড়া জড়িয়ে ধরিস। সেই ন্যাংটাবাবা যদি না পারে, তাহলে ভূ-ভারতে আর কেউ পারবে না। যাঃ।

সন্ন্যাসী নিদ্রাভিভূত হলেন!

রূপেন্দ্র এটাকে দৈবনির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করে চললেন উত্তরমুখো — শেরশাহী বাদশাহী সড়ক ধরে : কাশীধাম।

সচল বিশ্বনাথ! তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া কি অতই সহজ?

কখন কোথায় থাকেন টেরই পাওয়া যায় না। এই শোনা গেল বাবা আছেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। দৌড়ালো শত শত দর্শনার্থীর দল। গিয়ে শুনল, বাবা ভাসতে ভাসতে চলে গেছেন কেদারঘাটে। অসি থেকে বরুণা তিনি ক্রমাগত সন্তরণে অতিক্রম করেন — ঘাট দিয়ে পায়ে-হেঁটে নয়। তিনি যে দিগম্বর। সমস্ত রাত্রি হয়তো আকণ্ঠ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হয়ে বসে আছেন — কী শীত, কী গ্রীষ্ম। তারপর যেই গঙ্গার ঘাটে প্রথম স্নানার্থীর আবির্ভাব ঘটে অমনি বাবা সাঁতরে চলে যান ব্যাসকাশীতে। জনশ্রুতি — তিনি দাক্ষিণাত্যের সন্ন্যাসী। কাশীধামে যখন প্রথম আসেন, তখনো বেণীমাধবের ধ্বজাটা মাথা খাড়া করে ওঠেনি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুই তো হয়েছে ছত্রিশ বছর আগে, 1707 খৃষ্টাব্দে। জনশ্রুতি এই সন্ন্যাসী নাকি প্রায় আড়াই শত বৎসরকাল ওই কাশীধামের বিপরীতে ব্যাসকাশীতে লীলাময় হয়েছিলেন।

pathagar.net

নানান ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আমাদের কাহিনীর নায়ক একদিন এসে পৌঁছালেন কাশীধামে। জেব-এ নেই পারানির কড়ি। সন্তরণে অতিক্রম করলেন গঙ্গা। ও-পাড়ে জনমানবশূন্য বালিয়াড়ি। দূর থেকে তাঁর দর্শন পাওয়া গেল। বসে আছেন পদ্মাসনে, জনহীন প্রান্তরে, বালির ওপর। চোখ দুটি নিমীলিত। ধ্যানস্থ। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তবে ওঁর মধ্যদেশ এতই স্ফীত যে, মেদের মৈনাকে তাঁর — না, ভুল হল, তাঁর নয়, দর্শনার্থীর — লজ্জানিবারণ হয়ে থাকে। বিশালকায় পুরুষ। মুণ্ডিত মস্তক। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই এই সন্ন্যাসীর।

একজন কাশীবাসী পরামানিকের কীর্তি এটি।

জপ-তপ, পূজা-উজা সে কিছুই করে না। বিশ্বনাথদর্শন বা গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন হয় না তার। সগর্বে বলে, 'কোন শালা যমদূত মরার পর আমাকে ছুঁতে পারবে না।' কারণ তার সাধনমার্গ বড় বিচিত্র। সপ্তাহে দুদিন — 'বুধ ঔর এতোয়ার' সে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতের বাধা মানে না। ব্যাসকাশীতে চলে আসে নৌকা বেয়ে। ধ্যানস্থ বাবাকে ক্ষৌরি করে দিয়ে যায়। বাবা টেরও পান না।

ভক্তরা যা ফলমূল-মিষ্টান্ন নিবেদন করে যায়, তা পড়ে থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কাক-গাঙশালিক আর শৃগাল নির্দ্বিধায় তাতে উদরপূর্তি করে যায়। বাবা অচল বিশ্বনাথই জানেন ধ্যানভঙ্গ হলে সচল বিশ্বনাথ সেই বায়স ও শিবাকুলের উচ্ছিষ্টে উদরপূর্তি করেন কি না।

ধ্যানমগ্ন ত্রৈলঙ্গস্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন রূপেন্দ্র। বাবা টেরও পেলেন না। এখন নিরন্তর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। ততক্ষণে চৈতালী রৌদ্র প্রখর হতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, চৈতালী রৌদ্র। পুরো তের মাস সময় লেগেছে কপর্দকহীন অবস্থায় পুরী থেকে কাশীধাম আসতে। এমন কত চৈতালী দিনে উদয়ভানু অস্তাচলে উপনীত হয়ে দেখেছেন সমস্ত দুপুরের 'লু'-এর ঝড়ে বাবার সর্বাঙ্গ প্রায় ঢেকে যেতে বসেছে; অথচ তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়নি।

নিতান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। বাবার ধ্যানভঙ্গ হল।

অতলান্ত একজোড়া চোখ মেলে বাবা বললেন, ক্যা মাংতা হ্যয় রে, বেটা?

আগন্তুক করজোড়ে বললেন, আশীর্বাদ, প্রভু!

রুখে উঠলেন দুর্বাসা : ক্যিঁউ? ভ্রষ্টাচারীকো ক্যিঁউ আশীর্বাদ করুঁ?

রূপেন্দ্র স্তম্ভিত। জ্ঞানত জীবনে কখনো কোন পাপ করেননি। সজ্ঞানে সত্যপথ থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হননি। আর বাবার দৃষ্টিতে তিনি : ভ্রষ্টাচারী।

করজোড়ে বললেন, কহিয়ে প্রভু, ক্যা পাপ কিয়া হ্যয় ম্যায়নে?

—ক্যা তু গঙ্গাপুত্র পিতামহ ভীষ্ম তো ন হো?

এ-প্রশ্নের কী জবাব? রূপেন্দ্র নীরব রইলেন। পরক্ষণেই বাবা মন্ত্রোচ্চারণ করেন :

ন তপস্তপ ইত্যাহ ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।
ঊর্ধ্বরেতা ভবেদ যস্তু স দেবো ন তু মানবঃ।।*

---

* সর্বপ্রকার জপ-তপ-পূজাচরণবিধির শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য।
যিনি 'ঊর্ধ্বরেতা' তিনি মানুষ নন, দেবতা।।

pathagar.net

—হ্যাঁ, ম্যয়নে মানলি। লেকিন মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবজী? বহ্ ক্যা থা? দেওতা? ব্রহ্মচারীন্? ইয়ে ভ্রষ্টাচারী? কেঁও রে বেটা, তু তো মহাপণ্ডিত হো! বাতা না তু?

কেন এভাবে তিরস্কৃত হচ্ছে তা বুঝতে পারেন না; কিন্তু নিশ্চয় তাঁর কোন অজ্ঞান অপরাধে অসন্তুষ্ট হয়েছেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তাই প্রশ্নের জবাবে যুক্তকরে নিবেদন করলেন : মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবজী তো মহান ব্রহ্মচারী, পরমভাগবত থে, প্রভু!

—কৈসে? বিদুরজননীকো উস্থোনে লাথ তো নেহি মারা থা, না?

আবার সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। কী বলতে চান উনি? সন্ন্যাসী একই নিশ্বাসে বলে চলেন, সোচ লে মূর্খ! যো মন্দভাগিনী তেরি কৃপা মাংনেকো লিয়ে আয়ী থি বহ্ তো মাতা অম্বিকাকি তরহ্ আঁখ বন্দ নেহি কী! মাতা অম্বালিকাকি তরহ্ পাণ্ডুর ভি ন হো গয়ী। তো?...

দুরন্ত বিস্ময়ে এবার সাদা বাংলায় প্রশ্ন করেন, কার কথা বলছেন প্রভু?

রূপেন্দ্র নিজের অজ্ঞাতসারে হিন্দি ছেড়ে বাঙলায় প্রশ্ন করেন।

এবার ত্রৈলঙ্গস্বামীও হিন্দি ছেড়ে সংস্কৃতে প্রত্যুত্তর করলেন। গদ্যে নয়, তাৎক্ষণিক ছন্দোবদ্ধপদে — শার্দূলবিক্রিড়িতছন্দে :

"বালচাপল্যের কিশলয়, কৈশোরের অর্ধস্ফুট কুসুমকলি আর যৌবনের লীলাকমল।
সৃষ্টিযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে অর্ঘ্যডালি সাজিয়ে এসেছিল সীমন্তিনী নারী।।
যেন পরমভাগবত ব্রহ্মচারী ব্যাসদেবজীর চরণপ্রান্তে মাতা বিদুরজননী।
অহোবত! কী নিদারুণ নিয়তি! নায়িকার ললাটলিখন শুধু নিষ্ঠুর পদাঘাত।।"

রূপেন্দ্রনাথ বজ্রাহত! এ কী! এ কী বলছেন বাবা? কামার্তা মৃন্ময়ীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে কখনো তো কোন অনুশোচনা হয়নি। পরদারগমন পাপ নয়? অথচ এই ত্রিকালজ্ঞ সংসারত্যাগী মহাসন্ন্যাসী ছন্দোবদ্ধপদে ব্যাসদেব আর বিদুরজননীর প্রসঙ্গ টেনে এনে...

করযোড়ে সবিনয়ে বলেন, অগর আপ নির্দেশ দেঁ তো ম্যয় ওয়াপস্ যা কে উনসে মাফি মাং লুঙ্গা!

সন্ন্যাসী গর্জে ওঠেন : মাফি? হাঃ! ক্যা বহ্ বৈঠি হ্যয় তেরে লিয়ে?

—তো?

সন্ন্যাসী তাঁর বিচিত্রভাষে বুঝিয়ে দেন, তোর 'বচপন-কি-সাথী' তোর কাছে 'অমৃৎ' চাইল, তুই দিলি না! সে তোর কাছে 'জহর' চাইল, তাও দিলি না তুই! আর কী করতে পারত সে হতভাগিনী? ধর্মরক্ষার তাগিদে, তার স্বামীনিযুক্ত তামসাচারী পশুর হাত থেকে নারীধর্মকে রক্ষা করার প্রয়োজনে গলায় ফাঁস দিয়ে সেই অভিমানিনী তো সীতামায়ীর মতো পাতালপ্রবেশ করেছে!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বালির উপর বসে পড়লেন শ্রোতা। মীনু, মৃন্ময়ী, সেই একফোঁটা মেয়েটা...যে মেয়েটা শেষ সাক্ষাতে বলেছিল, 'জীবনে আমি সুখী নই, তবু মরতেও আমি চাই না, সোনাদা', ...আর যাকে উনি শেষ সম্ভাষণ করে এসেছেন, 'গা ঘিনঘিন

pathagar.net

করছে বলে ডুব দিতে যাচ্ছি' — সে নেই! সে আজ অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা! সে তার কথা রেখেছে': 'আর কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইতে আসব না, সোনাদা!' — না, আর কেউ কোনদিন তার নারীত্বকে অপমান করতে পারবে না — না তার সাতপাকের নিষ্ঠুর অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ জরাগ্রস্ত অক্ষম স্বামী, না পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অছিলায় কোনও বামাচারী কামাচারী, না ঊর্ধ্বরেতা থাকার অহঙ্কারে কোনও আত্মাভিমানী ব্রহ্মচারী!

তাকিয়ে দেখলেন, মহাসন্ন্যাসী পুনরায় ধ্যানস্থ।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন।

হল না, কিছুই হল না। নারীমুক্তির স্বপ্ন সার্থক হবার নয়। এখন একমাত্র লক্ষ্য : সেই অলক্ষ্যলোক — যেখানে প্রতীক্ষা করে আছে সীমন্তিনী কুসুমমঞ্জরী তার স্বামীর পথ চেয়ে, আর মীনু তার সোনাদার।

চলতে শুরু করতেই পিছন থেকে আহ্বান এল : লৌটকর আ যা!

করজোড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন আবার।

সন্ন্যাসী নিমীলিতনেত্র, কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটা ডানে-বামে দুলছে : এক দফে গলতি কিয়া, বেটা। ব্যস! দুসরে দফে, নহী!

রূপেন্দ্র আদৌ বিস্মিত হলেন না। ওঁর আত্মহননের সঙ্কল্পটা যেন ওই সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুমান করা নিতান্ত জাগতিক কার্যকারণসূত্রে। বাবা এবার তাকালেন, বুঝিয়ে বললেন, যাদের লীলাখেলা শেষ হয়ে গেছে, তাদের শান্তি বিঘ্নিত করিস্ না। কিন্তু যাবৎ-জীবন কর্মণ্যেবাধিকারস্তে! তোর কাজ তো শেষ হয়নি! নারীমুক্তি? নারীশিক্ষা? সতীদাহনিবারণ? তুই না তোর ধরমপত্নীকে জবান দিয়ে বসে আছিস? তাকে সরস্বতীমাঈয়ের পায়ের তলায় পৌঁছে দিবি?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন রূপেন্দ্র। বললেন, কী করব, বাবা? কী করতে পারি, আপনিই বলুন? মৃত্যু এসে যে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

—তো ক্যা হুয়া? তোর মা, তোর জনমভূমি, যে তোর পথ চেয়ে বসে আছে রে বেটা! তার মায়ের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করার ব্রত যে তোর মায়ের! সে তোকে ডাকছে, তুই শুনতে পাচ্ছিস না?

হতবুদ্ধির মতো রূপেন্দ্র বলেন, আমার মা? তাঁর মায়ের অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করবেন বলে আমার সাহায্য চাইছেন? কে তিনি, কোথায় তিনি?

—হাঁ রে বেটা! তেরি চুন্নিমুন্নি মায়ী!

বুঝিয়ে বললেন, কুসুমমঞ্জরীর সাধনা ব্যর্থ হয়নি। সাধনায় প্রাণ দিয়েছে সে, কিন্তু বিদায়ের পূর্বে নতুন প্রাণকে প্রাণবন্তও করে দিয়েছে। মহাকবি ভারতচন্দ্রের আশীর্বাণী ব্যর্থ হবার নয় : "মদনারিরিপুর বিধানে এ মিলন সার্থক হবেই!"

রূপেন্দ্রনাথ এবার পূর্বাভিমুখী।

গঙ্গার স্রোতধারার পথে চলেছেন গৌড়মণ্ডলের দিকে।

জন্মভূমির সন্ধানে, আত্মজার সন্ধানে।

: রূপমঞ্জরীর সন্ধানে।

pathagar.net

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

নবম পর্ব

রূপেন্দ্রনাথ এবার পূর্বাভিমুখী।

গঙ্গার স্রোতধারায় যাত্রীবাহী বজরায় এবার চলেছেন গৌড়মণ্ডলের দিকে। জন্মভূমির সন্ধানে, আত্মজা-জননীর সন্ধানে, রূপমঞ্জরীর সন্ধানে। বজরা এসে ভিড়ল নবদ্বীপের ঘাটে প্রায় তিন মাস পরে। সেদিন রূপেন্দ্রনাথের মনটা চনমন করে উঠল। এখানে নেমে নৌকা বদল করে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় জলাঙ্গী বেয়ে, কৃষ্ণনগরে। সেখান আছেন ওঁর পরমসুহৃদ রায়গুণাকর কবি — রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। প্রাকবিবাহ জীবনে রূপেন্দ্র একবার কৃষ্ণনগরের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ঋষধ্বজের চিকিৎসা করতে এসেছিলেন। ঘটনাচক্রে আলাপ হয়েছিল মহাকবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে। বস্তুত যে কয়দিন কৃষ্ণনগরে ছিলেন ঐ প্রোষিতপত্নীক কবির ভদ্রাসনে অতিথি হিসাবে বাস করে যান। তখন কুসুমমঞ্জরীর সঙ্গে রূপেন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির হয়েছে। রূপেন্দ্রের কাছে সে খবর শুনে কবি ভারতচন্দ্র বলেছিলেন তোমাদের যদি পুত্রসন্তান হয় তবে তার নাম দিও : 'আত্মদীপ' আর যদি কন্যাসন্তান হয় তবে তার নাম দিও : 'রূপমঞ্জরী।' রূপেন্দ্র বলেছিলেন, 'রূপমঞ্জরী' শব্দটির অন্বয় ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সহজ, সরল দ্বন্দ্বসমাস। আমাদের দুজনের নামের অংশবিশেষ, কিন্তু কবি! ঐ 'আত্মদীপ' শব্দটির তাৎপর্য কী?

ভারতচন্দ্র বুঝিয়ে বলেছিলেন, এতবড় পণ্ডিত হয়েও সেটা তুমি ধরতে পারলে না? শোন! অশীতিপর শাক্যসিংহ যখন কুশীনগরে শেষশয্যায় শায়িত, তখন তাঁর মহাপরিনির্বাণ শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র বুদ্ধশিষ্য : আনন্দ। তিনি গৌতমবুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রভু! আপনার মহাপরিনির্বাণের পরে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে আমরা সমাধানের জন্য কার কাছে যাব?

মহাজ্ঞানী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন :

আত্মদীপো ভব।
আত্মশরণো ভব।।
অনন্যশরণো ভব।।

pathagar.net

বলেছিলেন, নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালিও। সেই বিবেক-নির্দেশিত পথে গমন কর। অপরের কথায় জীবন পরিচালিত কর না। ভাই রূপেন্দ্র! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, বুদ্ধদেবের ঐ নির্দেশটি তুমি জানো বা না জানো — জীবনে সেই পথনির্দেশটি তুমি কঠোরভাবে মেনে চল। যেন ওটাই তোমার জীবনের মূলমন্ত্র। তাই এই নামকরণ করলাম তোমার পুত্রের।

আজ রূপেন্দ্রের তাই ইচ্ছা হল নবদ্বীপের ঘাট থেকে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে চলে যেতে। মালতীর বেড়া দিয়ে ঘেরা কবির সেই পর্ণকুটীরে। গিয়ে বন্ধুকে দু-বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করতেন। বলতেন, 'আত্মদীপের' পরিবর্তে 'রূপমঞ্জরী' অবতীর্ণ হয়েছে এ ধরাধামে। ঐ মেয়েটিকেই দীক্ষা দেবেন তিনি আড়াই হাজার-বছরের ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রটায় : "আত্মদীপো ভব।"

কিন্তু তা হল না। 'মাহেশ' গ্রামখানি ওঁকে টানছে। স্তনভারনম্র গাভী যেমন বাছুরকে ডাকে, রূপেন্দ্রের আত্মজা-জননী যেন ব্রতউদযাপনের তাগিদে ওঁকে সে ভাবে ডাকছেন। সবার আগে ওঁকে মাহেশ যেতে হবে। বজরা ছাড়ল। অতিক্রান্ত হল কালনার ঘাট। এখান থেকে পশ্চিমমুখো রওনা হলে নদীপথে যাওয়া যায় তাঁর পিতৃভূমিতে : সোঞাই গ্রামখানিতে। কিন্তু না। রূপেন্দ্র সে পথেও গেলেন না। নৌকাটি যাবে ফ্রেডরিকনগর পর্যন্ত। উনি নৌকা থেকে অবতরণ করবেন তার পূর্বেই — ফরাসীডাঙার ঘাটে। আজ যার নাম চন্দননগর। কারণ ওঁর পিসাশ্বশুরের ভদ্রাসনটি যে গ্রামে, সেই মাহেশে যেতে হলে ঐ ঘাটেই নামতে হবে।

তাই নামলেন। ফরাসী অধিকৃত ফরাসীডাঙার ঘাটে। পুঁটুলিটি বগলে নিয়ে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলেন মাহেশের দিকে, রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

মঞ্জরী নেই। কুসুমমঞ্জরী অকালে ঝরে গেছে; কিন্তু ব্যর্থ হয়নি তার আত্মদান— মহাসাধক ত্রৈলঙ্গস্বামী তাই বলেছেন। যাবার আগে সে রেখে গেছে রূপমঞ্জরীকে। সেই মহাসাধকের নির্দেশমতো রূপেন্দ্র কন্যাকে নিয়ে যাবেন স্বগ্রামে : সোঞাই গ্রামে। সেখানে আছেন বৃদ্ধা জগুপিসিমা, আছে কাত্যায়নী। তারাই শিশুটিকে মানুষ করে তুলবে, শিশুকাল থেকে যত্ন না নিলে মানসিক গঠন অন্যরকম হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন তীর্থ পরিক্রমা করেছেন। ভাগীরথীর দুই তীরের বহু বর্ধিষ্ণু জনপদ। তারপর শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাম্রলিপ্তি, দন্তপুর, ভদ্রক, পুরুষোত্তমপুর, কটক, একাম্রকানন (ভুবনেশ্বর), সাক্ষীগোপাল হয়ে নীলাচল শ্রীক্ষেত্র। সেখানে ব্যর্থ হয়ে পদব্রজে অরণ্যভূমির অজানা পথে এসে বাদশাহী সড়ক (জি. টি. রোড)। তারপর আর পথসন্ধান নিতে হয়নি। বাদশাহ শের শাহ-এর সরলীকরণ পথে সোজা বাবা সচল বিশ্বনাথের চরণতলে। সেখানেই পেলেন নির্দেশ : রূপমঞ্জরীকে 'আত্মদীপ'-মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে হবে।

তীর্থপরিক্রমা কালে অনেক-অনেক কিছু দেখেছেন। ওঁর এখনো বিশ্বাস : 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' তিনি যখন আসবেন — যদি আজও না এসে থাকেন — তবে তাঁর লীলাক্ষেত্র ঐ ভাগীরথী-বিধৌত 'গঙ্গাহৃদির' কোন একটি জনপদ। পুরীতেও নয়। কাশীধামেও নয়।

কিন্তু বঙ্গভূমের কী অবস্থা! গঙ্গার দুই তীরে গায়ে-গায়ে গড়ে-ওঠা বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম। আলিবর্দীর সুশাসনে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলছে নির্বিঘ্নে। রেশমশিল্পীরা কাপড় বোনে। কুম্ভকারেরা চাকা ঘোরায়, তাঁতিরা তাঁত বোনে। দিগন্ত-অনুসারী মাঠে টোকা-মাথায় কৃষকদল সোনা ফলায়। গ্রামজীবনের মধ্যমণি ব্রাহ্মণ-সমাজ! মহামহোপাধ্যায়েরা ন্যায়ের ভাষ্য নিয়ে চুল-চেরা বিচার করেন : তৈলটা পাত্রাধার অথবা পাত্রটা তৈলাধার! পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী —কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবেও কোন পাঠশালায় দেখতে পাননি বেণী-দোলানো ডাগর-চোখো কোনও বালিকা বা কিশোরীকে! ওদের অক্ষর-পরিচয় হওয়া মানা। স্ত্রীলোকের অক্ষর-পরিচয় মাত্রেই অনিবার্য অকালবৈধব্য। কোন্ যুক্তিতে? বাঃ। কোন গণ্ডমূর্খ এটা জানে না! ন্যায়রত্ন মশাই স্বয়ং বিধান দেছেন। শাস্ত্রে নাকি তাই লেখা আছে!

জল-অচল অচ্ছুতেরা বাস করে ভদ্রপল্লীর বাহিরে। তারা অন্তেবাসী। গঙ্গাস্নান তারা করতে পারে। তবে ঐ আঘাটায়। পথেঘাটে তাদের সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ : বামুন-গায়ে যেন ছায়াপাত না ঘটে যায়!

সে নীরন্ধ্র অন্ধকারে রাজা-রাম, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সম্ভাবনার আভাসমাত্র নাই!

প্রায় তিনশবছর পূর্বে এই ভাগীরথী-বিধৌত নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক বিদ্রোহী যুগাবতার। তিনি গৌড়মণ্ডলকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের বন্যায়। যবন হরিদাসকে তিনি কোলে টেনে নিয়েছিলেন। আচণ্ডাল ভক্তকে এক মন্ত্রে আবদ্ধ করে শিখিয়েছিলেন 'হরিনাম'-ছাড়া এ কলিযুগে মুক্তির আর কোনও পথ নেই। যুক্তি নয়। ভক্তি আর বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। কিন্তু মাত্র তিনশ বছরের ভিতরেই তাঁর প্রভাব লুপ্ত হতে বসেছে। সম্প্রদায় হিসাবে বৈষ্ণবেরা সমৃদ্ধিলাভ করেছে বটে — শাক্ত গৌড়মণ্ডলে সে ধর্ম এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত — কিন্তু তা নিতান্ত আচারসর্বস্ব! মূল তাত্ত্বিক লক্ষ্য থেকে তারা সরে গেছে। তারা মাথা কামায়, তিলক সেবা করে, খঞ্জনী বাজিয়ে দোরে দোরে মাধুকরী করে ফেরে, আর কিশোরী-ভজনের তাল খোঁজে! চৈতন্যদেবের ঋজু ধর্মবিশ্বাস থেকে তা অনেক দূরে সরে গেছে। কূপমণ্ডুক ব্রাহ্মণ্যসমাজপতিদের চণ্ডীমণ্ডপের বিধানে যাদের জাত গেছে তারাই ক্রমে দলে দলে হয়েছে নেড়া-নেড়ি — বোষ্টম-বোষ্টমী। ঠিক যেভাবে প্রাক-শঙ্করাচার্য যুগে সমুদ্রযাত্রা করার অপরাধে জাত খুইয়ে দিশেহারা শত শত দক্ষ নাবিক ঝুঁকেছিল বৌদ্ধধর্মের দিকে, নাথ সম্প্রদায়ের দিকে।

মুষ্টিমেয় কিছু সাত্ত্বিক বৈষ্ণব — প্রভু নিত্যানন্দের প্রভাবে — নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, ত্রিবেণী, তেঘড়া আর ভাটপাড়ায় হয়তো সেই প্রেমের ঠাকুরের পবিত্র দীপশিখাটি আজও জ্বালিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব আখড়ার চতুঃসীমায়। বৃহত্তর বঙ্গসমাজে তার প্রভাব নেই।

এই কূপমণ্ডুক সমাজে কাশীধাম থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন রূপেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম প্রতিজ্ঞা — যা পরবর্তী শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবিত হবে বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহনের মাধ্যমে — সেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। আত্মজাকে তিনি নিয়ে যাবেন মহেশের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাতাবরণ থেকে! নিয়ে যাবেন তাঁর সোঞাই গাঁয়ে। যেখানে আছেন তাঁর পিসিমা, আছে ছোট বোন

কাত্যায়নী, তার স্বামী গঙ্গারাম আর আধুনিকমনা বৃদ্ধ জমিদার : ভাদুড়ীমশাই।

রূপমঞ্জরীর বয়স এখন কত? হিসাবমতো দু-আড়াই বছর। এতটুকু শিশুকে মানুষ করার অভিজ্ঞতা বা পারদর্শিতা তাঁর নাই। কিন্তু কাতু আছে। পিসিমা আছেন। তারা দেখভাল করবে! যতদিন না সেই ছোট্ট মেয়েটির হাতেখড়ির বয়স হয়। কথা ছিল, হাতেখড়ি দেবে ওর মা। সে কথা আর রক্ষা করা গেল না।

না! ঐ অর্বাচীন কুসংস্কারটা উনি আদৌ স্বীকার করেন না : অক্ষর-পরিচয় হলে, শিক্ষিতা হলে একটি কুমারী মেয়ে অকাল-বৈধব্যের দিকে পদক্ষেপ করে। যাজ্ঞবল্ক্যজায়া মৈত্রেয়ীর স্বামী অতি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। গার্গী এক দুর্লভ প্রতিভা। বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী ছিলেন মহাপণ্ডিতা; বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে কী-করে স্বহস্তে গোপনপত্র লিখে পাঠান, যদি তিনি নিরক্ষরা হয়ে থাকেন? রূপেন্দ্রনাথের মতে ঋগ্বেদের সূত্রকারদের ভিতর অন্যূন সাতাশজন মহিলার নাম পাওয়া যায়। গার্গীপ্রণীত ঋগ্বেদের টীকা আজও প্রামাণ্য। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত অন্যূন আঠাশটি সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা হচ্ছেন একজন অত্রি-বংশীয়া মহাপণ্ডিতা : বিশ্ববারা! কাশীধামের পৌরাণিক মহারাজা অলর্কের জননী মদালসা এক আশ্চর্য পণ্ডিতা। রাজপুত্র অলর্ককে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য কোনও গুরুর আশ্রমে যেতে হয়নি। রাজান্তঃপুরে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন রাজমহিষী মদালসার কাছে।

তাহলে?

সোঞাই-গ্রামের ব্রাহ্মণ্যসমাজ যদি ওঁর আত্মজাকে কোন চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করতে অনুমতি না দেয়? তাহলে তিনি নিজেই একটি চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। প্রয়োজনে তাতে একটি মাত্র ছাত্রীই থাকবে : রূপমঞ্জরী!

হয়তো এই অপরাধে সমাজ ওঁকে জাতিচ্যুত করবে! করে করুক। উনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। রোগযন্ত্রণায় যখন কূপমণ্ডুক সমাজপতিরা কাতর হবে তখন তাদেরই এসে জাতিচ্যুত রূপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আয়ুর্বেদিক ঔষধ নিয়ে যেতে হয় কি না তিনি দেখতে চান। কন্যার বিবাহ না হয় নাই দিলেন! নিমন্ত্রণ কাউকে করবেন না, ফলে নিমন্ত্রণ রাখতে যাবার বিড়ম্বনাও নাই। ক্ষারে কাপড় কাচলে রজক নিষ্প্রয়োজন! চুল-দাড়ি-গোঁফ না কামালে নাপিতেরই বা প্রয়োজন হবে কেন?

একঘরে বা জাতিচ্যুত হবেন ধরে নিয়েই তিনি চলেছেন নদীর ঘাট থেকে শ্বশুরালয়ে। আত্মজাকে স্বগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

pathagar.net

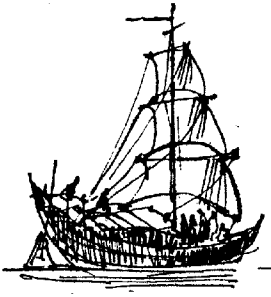

ফরাসীডাঙ্গার ঘাটে পুটুলি-বগলে যখন নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন, তখনও আকাশে তারা ছিল। চেনা পথ, আলিবর্দীর শাসনে চোর-ডাকাত ঠেঙাড়ের দল অন্য জাতির জীবিকা বেছে নিয়েছে। রূপেন্দ্রনাথ নির্ভয়ে আমকাঁঠালের ছায়াঘেরা বনপথ দিয়ে শেষরাতে যখন মাহেশে এসে পৌঁছলেন ততক্ষণে পুব আকাশটা সিঁদুর-বরণ হতে শুরু করেছে। ফরাসীডাঙ্গার বাজারে কিছু পথচারী সারমেয়-শীৎকারে আর বনপথে একটানা ঝিঁঝিপোকার ডাক ছাড়া জীবনের সাড়া পাননি। মাহেশের কাছাকাছি এসে দেখলেন, মানুষজন শয্যাত্যাগ করেছে। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের দিকে। পথে-ঘাটে অপরিচিত বহিরাগতকে দেখতে সেযুগের মানুষ আদৌ অভ্যস্ত ছিল না। অধিকাংশ মানুষই গ্রামের চেনা-চৌহদ্দীতে পাক খেত, কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো। রূপেন্দ্রনাথ ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন মাহেশের সেই সবচেয়ে বড় চকমেলানো প্রসাদের দিকে। নায়েব ভবতারণ গাঙ্গুলী মাহেশের সব চেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি। স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দক্ষিণ হস্ত। ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন চন্দননগরে ফরাসী গভর্নর ডুপ্লেক্সের দেওয়ান। অর্থকৌলিন্যে ইন্দ্রনারায়ণকে বলা যায় নাটোরের রানী ভবানী বা কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমকক্ষ। সুতরাং সেই ইন্দ্রনারায়ণের দক্ষিণহস্ত ভবতারণও মাহেশে হাতে মাথাকাটার কর্তৃত্বের অধিকারী।

নগ্ন পদে, নগ্ন গাত্রে, শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়-সর্বস্ব রূপেন্দ্রনাথ এসে থামলেন দেড়মানুষ উঁচু পাঁচিল-দেওয়া দেউড়ির প্রবেশদ্বারে। ঢালাই-লোহার শিক-দেওয়া গেট। খুলে দিলে চার ঘোড়ার চৌঘুড়ি অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। গাদাবন্দুকধারী দ্বাররক্ষক এগিয়ে এসে জানতে চাইল: ক্যা চাহিয়ে বাবুজি?

'বাবু-কালচার' ডিহি-কলকাতায় সদ্য জন্মেছে। দারোয়ান কলকাত্তাইয়া লবজটা আয়ত্ত করেছে: 'বাবুজী'।

রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, গঙ্গোপাধ্যায়-মশাই কি উঠেছেন?

—বড়াসা'ব? জী নেহি। ঔর একঘণ্টা পিছে আনা...

দারোয়ান সাহেব-সুবোদের নিয়ে কারবার করে, 'ঘণ্টা' 'মিনিট' চেনে। সাহেব-বিবি-

pathagar.net

গোলামের ফারাক বুঝতে পারে। রূপেন্দ্র লোহার গেটের এপারে দাঁড়িয়ে-কী করবেন স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। সহসা একটি চকিত এবং সুললিত বামাকণ্ঠে চমকিত হয়ে ওঠেন:

—বাঁড়ুজ্জেমশাই না?

শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলেন। দু-বছরে পঞ্চদশী হয়েছে সপ্তদশী — কিন্তু তুলসীকে চিনতে অসুবিধা হল না ওঁর। বললেন, ভাল আছ, তুলসী?

ভবতারণের অনূঢ়া কন্যা। মঞ্জরীর পিসতুতো ছোট বোন। ওঁর শ্যালিকা। ভোরবেলা পাঁচিল-ঘেরা বাগানে পূজার ফুল তুলতে এসেছে। সদ্য স্নান করেছে। মাথায় ভিজে চুল। সেকালে মেয়েরা বাড়িতে বক্ষবন্ধনী বা জ্যাকেট ব্যবহার করত না। তুলসী তার আঁচলটাই সাবধানে মাজায় জড়িয়ে নিয়েছিল। তবু তার হৃদয়ের যুগ্ম-উচ্ছ্বাসের আভাস লুকানো সম্ভবপর হয়নি।

তুলসীর আদেশে দ্বারপালকে গেট খুলে দিতে হল।

ওঁরা দুজনে পায়ে-পায়ে প্রকাণ্ড উদ্যান অতিক্রম করে লাল সুরকি বিছানো পথে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। তুলসী বলে, একটু দাঁড়ান, জামাইবাবু, পেন্নামটা সেরে নিই।

—তুমি সদ্য স্নান করেছ, আর আমি সাত রাজ্যের ময়লা পথ অতিক্রম করে আসছি, এখন আমার পদস্পর্শ নাই করলে, তুলসী।

তুলসী শুনল না। পথের মাঝেই ওঁকে থামিয়ে পদস্পর্শ করে প্রণাম করল। বলল, কোথায় ছিলেন এতদিন? একবস্ত্রে বেরিয়ে গেলেন, কেমন করে দু-দুটো বছর কাটালেন?

হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, সে অতি দীর্ঘ কাহিনী। ইতিমধ্যে নীলাচলের শ্রীক্ষেত্র আর কাশীধাম ঘুরে এলাম।

—পুরী-কাশী দুটোই? সে তো অনেক অনেক দূরের পথ। নয়?

—সেজন্যই তো এত দেরি হল।

—চুল-দাড়ি কাটেন না কেন? বাউণ্ডুলের মতো!

রূপেন্দ্র সে-কথার জবাব এড়িয়ে বললেন, তোমার বাবা-মশাই আর মা ভাল আছেন? বাড়ির আর সবাই?

তুলসী জবাব দেবার আগেই ও পাশের খিড়কির দরজা খুলে বার হয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া। তুলসীর মা।

তুলসী বললে, ঐ তো মা!...মা, দেখ, কাকে ধরে এনেছি।

ভবতারণজায়া মাতঙ্গী যেন ভূত দেখলেন। মাথার উপর ঘোমটা তুলে দিয়ে বললেন, তুই ভিতরে যা, মেজ। আমি দেখছি।

রূপেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন। স্পর্শ বাঁচাতে মহিলা দুপা পিছিয়ে গেলেন। বললেন, এতদিনে মনে পড়ল আমাদের কথা?

রূপেন্দ্র অপরাধীর মতো, সলজ্জে নীরব রইলেন।

—কী কঠিন প্রাণ গো জামাই, তোমার! মেয়েটার হেরাদ্দ পর্যন্ত তর সইল না? এক

pathagar.net

কাপড়ে কাউকে কিছু না বলে ঘর ছাড়লে?

রূপেন্দ্র নতনেত্রে বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছেন মা, আমি আজও অশৌচ পালন করে চলেছি। চুল-দাড়ি কাটি না, মাথায় তেল দিই না। একাদশীতে উপবাস করি...

প্রৌঢ়া বিস্মিতা হলেন। বললেন, কেন? কেন? একাদশীতে উপবাস কর কেন?

—আমি মনে করি: দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব। স্বামীর প্রয়াণে স্ত্রী যদি একাদশীতে উপবাসী থাকে, তাহলে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীকেও একই ভাবে একাদশী পালন করতে হবে।

প্রৌঢ়ার বাক্যস্ফূর্তি হল না। সম্বিত ফিরে এল পাশ থেকে বর্ষীয়সী পরিচারিকা কানাইয়ের-মায়ের কণ্ঠস্বরে, মা! কর্তামশাই বললেন, 'ঐ ওঁনারে বৈঠকখানায় বসতে বলতি। আর আপনারে এট্টু ভিতরবাগে আসতি বললেন।

প্রৌঢ়া কিছু বলার আগেই কানাইয়ের মা রূপেন্দ্রকে বললে, আয়েন, জামাইবাবু, আমার লগে লগে...

পথ দেখিয়ে সে নিয়ে এসে ওঁকে বসালো ভবতারণের শ্যাম্ডেলেয়ার-শোভিত প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরে। ঘরের একদিকে একটা বিশাল পালঙ্ক। তাতে ধপধপে ফরাস ও চাদর পাতা। তাকিয়া ছড়ানো। আশপাশে কিছু কেদারা। মর্মর পিলসুজে মার্বেলের ভেনাস, ব্যাক্কাস, সাটির, ফন। ফরাসী অনুকরণে গ্রীক ভাস্কর্য।

কানাইয়ের মায়ের নির্দেশমতো একটি কেদারায় গিয়ে বসলেন। ঘরের ও-প্রান্তে আর একজন খিদমদগার ঝাড়ন দিয়ে আসবাবের ধুলো ঝাড়ছিল। সে আড়চোখে বার-দুই দেখল ওঁকে। কানাইয়ের মায়ের কাণ্ডজ্ঞান আছে। লোকটাকে বললে, ঝাড়-পোঁচ থাক এখন, ধুলো ওড়াস না। তুই বরং টানাপাখাটা একটু টান দিনি, কালিপদ...

কালিপদ প্রতিবাদ করে, এত সাত-সকালে? এখন তো ঠাণ্ডা!

রূপেন্দ্র বলে ওঠেন, না, না। টানা-পাখা টানতে হবে না।

কালিপদ আর কানাইয়ের মা ভিতর বাড়িতে চলে গেল।

একটি বিলাতী ঘড়ি ঢং ঢং করে ছয়বার শব্দে জানান দিল সময় বয়ে চলেছে। বাহিরের বাগানে অগুনতি পাখির প্রভাতী কলকাকলি। চুপচাপ বসে রইলেন রূপেন্দ্র। প্রায় এক দণ্ড পরে ভিতরবাড়ি থেকে আবির্ভূত হলেন গৃহস্বামী। দু-বছরে একটু স্থূলকায় হয়েছেন। সদ্য স্নান করে এসেছেন। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি রেশমের উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গে ফরাসডাঙ্গায় বোনা ধুতি। পায়ে চন্দনকাঠের খড়ম। তিনি ধীর পদক্ষেপ এগিয়ে এসে বসলেন পালঙ্কে। তাকিয়াটা টেনে নিলেন। হুঁকোবরদার আসছিল পিছন-পিছন। আলবোলাটা নামিয়ে রৌপ্যনির্মিত ফরসির নলটা এগিয়ে দিল কর্তামশায়ের দিকে।

রূপেন্দ্র উঠে এসে প্রণাম করলেন শ্বশুরকে। সাবধানে, স্পর্শ বাঁচিয়ে। ভবতারণ বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবাজীবনের?

—আজ্ঞে আপাতত কাশীধাম থেকে। নৌকায় প্রায় তিমনাস লাগল।

—অ। তা চুলদাড়ি কামানো হয় না কেন? অশৌচ? নাকি সময় হয় না? অথবা সংসারে বীতরাগ?

রূপেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, গৌড়মণ্ডলে আজই এসে পৌঁচেছি। এদিককার সংবাদ কুশল?

—না, বাবাজী। রাজনৈতিক সংবাদ আদৌ শুভ নয়। গৌড়দেশ একটি উদ্‌গীরণ-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে। কিন্তু সেসব প্রসঙ্গ থাক। তোমার বেশবাস দেখে মনে হচ্ছে না যে, দেশের হালচাল নিয়ে তোমার কোনও কৌতূহল আছে। তুমি বরং প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নাও। মনে হচ্ছে বাসিমুখে জলও দাওনি। সকালে প্রাতরাশের পূর্বে আহ্নিক-টাহ্নিক করা হয়?

রূপেন্দ্র জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। তার পূর্বেই ভবতারণ হাঁকাড় পাড়লেন, ওরে, কে আছিস্?

থামের আড়াল থেকে তৎক্ষণাৎ রঙ্গমঞ্চে যুক্তকরে আবির্ভূত হল একজন খিদ্‌মদ্‌গার। কর্তা তাকে বললেন, জামাই-বাবাজিকে অতিথিশালার গোছলখানায় নিয়ে যা। খাজাঞ্চিবাবুকে বলে এক জোড়া ধুতি আর...

কথার মাঝখানেই ভৃত্যটি বলে উঠল, যে আজ্ঞে!

রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রশ্ন করেন, আপনি দফতরে যাবেন কখন?

—কেন বল তো? সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন?

—মানে যে-কারণে আমি এসেছি, যে-কথা বলতে এসেছি...আপনি দফতরে বেরিয়ে যাবার আগেই সেই আর্জিটা পেশ করতে চাই।

—বেশ তো। একেবারে বাসিমুখে সে-কথা নাই বা বললে। বিনা এত্তেলায় তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যেতেও পার, আবার বিনা সংবাদে ফিরে আসতেও পার — কিন্তু তাই বলে আমরা তো ভুলতে পারি না — তুমি আমাদের জামাই। যাও ওর সঙ্গে।

স্নানান্তে রূপেন্দ্র তাঁর পুঁটুলির ভিতর থেকে একটি কাচা-ধুতি বার করে পরিধান করলেন। মার্বেল-পাথরে-মোড়া গোছলখানার আলনায় ঝিঙে-করা 'পৌন-ধনু*-বহরের শান্তিপুরে ধুতিখানি অস্পর্শিত পড়ে রইল। স্নানান্তে অতিথিশালার একটি কামদার কক্ষে ওঁকে নিয়ে গিয়ে বসালো সেই খিদ্‌মদগারটি। জমিদার-মশায়ের দেওয়া ধুতি পরিধান করবার জন্য সে কোনও আর্জি নিজে থেকে দাখিল করল না।

*একধনু = ষাট ইঞ্চি; ফলে পৌনধনু = 45" = 1.14 মিটার।

অতিথিশালায় পাশাপাশি তিন-চারখানি কক্ষ। বিভিন্ন মহাল থেকে জমিদারির কাজে যাঁরা আসেন, দু-চারদিন যাঁদের থাকতে হয়, তাঁদের ব্যবহারের জন্যই এই অতিথিশালা। রূপেন্দ্র ইতিপূর্বে এখানে কোনদিন আসেননি। তিনি বুঝলেন, কুসুমমঞ্জরীকে হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলে জামাই আদর পাওয়ার সৌভাগ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কর্তামশাই কয়টার সময় অশ্বারোহণে ফরাসীডাঙায় যাবেন; কিন্তু প্রশ্নটা করা হল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই পর্দাটা দুলে উঠল। বৃদ্ধা কানাইয়ের-মা একটি অল্পবয়সী পরিচারিকাকে নিয়ে ঢুকল ঘরে। অতিথিশালার কক্ষে মেজ ও কেদারা দুইই ছিল; কিন্তু কানাইয়ের-মা অন্য রকম ব্যবস্থা করল। মার্বেল মেঝের একাংশ মুছে নিয়ে পেতে দিল পশমের আসন। সঙ্গিনী এবার নামিয়ে রাখল পাথরের থালায় প্রাতরাশ: গৃহদেবতা 'শ্যামসুন্দরের' বালভোগের প্রসাদ। তিন-চার রকম কাটা ফল, মুগ ভিজে, লোচিকা, মিছরির সরবৎ, পায়েস।

রূপেন্দ্রনাথ বিনাবাক্যব্যয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। পাখা হাতে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকল কানাইয়ের-মা।

আচমন করে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, কর্তামশাই কি এখনো বৈঠকখানাতেই আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার অপেক্ষায়। আসেন আপনি—

কানাইয়ের মা উচ্ছিষ্ট পাথরের থালাখানা উঠিয়ে নিয়ে অন্দরের দিকে বিদায় হল। সেই খিদমদ্‌গারটি পথ দেখিয়ে ওঁকে আবার নিয়ে এল বড়কর্তার দরবারকক্ষে। ইতিমধ্যে সেখানে সাত-আটজন উমেদার বা প্রার্থী এসে জুটেছে। তারা বসে আছে কার্পেটের উপর উবু হয়ে। রূপেন্দ্রকে নিয়ে ভৃত্যটি সে-কক্ষে প্রবেশ করতেই কর্তামশাই ওদের বললেন, আজ এই পর্যন্তই। তোরা যা। আমার জরুরি কাজ আছে ঐ কোবরেজমশায়ের সঙ্গে। তোরা কাল আসিস।

রূপেন্দ্র বসলেন ওঁর মুখোমুখি। ঘর নির্জন হল।

ভাবতারণ প্রশ্ন করলেন, স্নানাদি হয়েছে? প্রসাদ পেয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আপনি অনুমতি করলে আমার আর্জিটা পেশ করতে পারি।

—তাড়া কী, বাবাজীবন? দু-চারদিন বিশ্রাম করে যাও না আমার এই গরিবখানায়। অতিথিশালা তো খালিই পড়ে আছে...

বোধকরি আর সহ্য হল না রূপেন্দ্রর। তাঁর নাসারন্ধ্র কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হয়ে উঠল এই দাম্ভিক ভূম্যধিকারীর বাচালতায়। বললেন, গাঙ্গুলীমশাই! আপনি প্রথমে স্থির করুন, আপনার-আমার মধ্যে সম্পর্কটা কী? কোবরেজমশায়ের সঙ্গে জরুরি কথা বলার অজুহাতে আপনি সমবেত প্রার্থীদের বিদায় করলেন। এখন আমাকে সম্বোধন করছেন 'বাবাজীবন' বলে। দুনিয়াদারীতে আপনি অভিজ্ঞ — প্রথমে মনস্থির করুন। 'বাবজীবন' হলে আমার স্থান অতিথিশালায় হয় না। হয় অন্দরমহলে, মায়ের কাছে। সেখানে কানাইয়ের-মা নয়, তুলসী আমার প্রাতরাশ নিয়ে আসবে। আর কোবরেজমশাই বলে মেনে নিলে আমার কিছু সম্মানদক্ষিণাও প্রাপ্য। অথচ না ডাকতেই আমি এসেছি — নিশ্চয় চিকিৎসক হিসাবে নয়।

ফলে, প্রথমেই স্থির হয়ে যাক আপনার-আমার সম্পর্কটা কী?

—তুমি এককালে আমার কন্যাপ্রতিম কুসুমমঞ্জরীর স্বামী ছিলে। যে স্ত্রীর সৎকারের ব্যবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ধৈর্য না ধরে তুমি পালিয়ে গেছিলে। এই তো আমাদের সম্পর্ক!

—এগুলো তো কতকগুলো বাস্তব তথ্যের উপর আপনার ব্যাখ্যা, আপনার টিকা-টিপ্পনি! আমার বিচারে যেমন: আপনি ছিলেন আমার পিসাশ্বশুর — যে ব্যক্তিটি কুসংস্কারের কৈঙ্কর্যে প্রসূতিবিদ্যায় বিশেষভাবে শিক্ষিত গোকুলানন্দ আচার্যর শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে সূতিকাগারে প্রবেশ করতে না দিয়ে আদরিণী কন্যাপ্রতিম প্রসূতিকে বস্তুত হত্যা করেছেন! যার ফলে আপনার জামাতা তীব্র ঘৃণায় একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল। এটাও আমাদের সম্পর্ক!

ভবতারণ ফরাসের নলটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, তখন তুমি বলেছিলে — কী একটা বিশেষ কথা আমাকে বলতে এসেছ। সেটা কী?

—আমি আমার কন্যাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কন্যা! তোমার কন্যা! সে জীবিতা আছে এ-কথা কেমন করে জানলে?

—এ-প্রশ্ন অবান্তর। আপনি অস্বীকার করতে পারেন: কুসুমমঞ্জরী একটি জীবিতা কন্যাসন্তানকে প্রসব করেনি? সেই দু-আড়াই বছরের মেয়েটি আপনার ভদ্রাসনে নেই।

—না নেই!

এ কথা বলেই গাত্রোত্থান করলেন ভবতারণ, বললেন, তোমার অভিরুচি হয় দু-চার-দশ দিন আমার এই ভদ্রাসনে অতিথিশালায় বাস করতে পার। তাতে স্বীকৃত না হলে এখনই স্থানত্যাগ করতে পার।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো গাত্রোত্থান করলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, নেই? রূপমঞ্জরী বেঁচে নেই?

—রূপমঞ্জরী! সে কে?

—রূপেন্দ্রনাথ আর কুসুমমঞ্জরী কন্যা।

—ও! না, না, সে আছে। আমার বাড়িতে এখন নেই। এই যা।

—কেন? আপনার এতবড় বাড়িতে ঐ একফোঁটা মেয়েটার স্থানাভাব ঘটল কেন?

—তার পূর্বে বল, সে এ বাড়িতে থাকলে তুমি কী করতে?

—তাকে নিয়ে যেতাম। সোঞাই গাঁয়ে। আমার পিতৃপুরুষের ভিটেতে। তাকে মৈত্রেয়ী-গার্গী-মদালসার উত্তরসাধিকা করে তুলব আমি। তার মন্ত্রমন্ত্র হবে শাক্যসিংহের সেই অন্তিম অনুশাসন: আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনন্যশরণো ভব!

ভবতারণ বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন বক্তার মুখমণ্ডলে কী একটা দীপ্তি ফুটে উঠেছে। বোধকরি উত্তেজনায়। বললেন, বুঝলাম না, বাবাজী—

—আপনার পক্ষে এ-কথার মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন। তার প্রয়োজন নেই। আপনি বরং বলুন — সে কোথায়? রূপমঞ্জরী?

—তোমার আগমনমাত্র আমি তাকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছি।

—সে কী! কেন?

—যাতে পিতৃস্মৃতি বলে তার মস্তিষ্কে কোন ছাপ না পড়ে। তাকে আমি অন্যভাবে মানুষ করতে চাই।

—অন্যভাবে। কী ভাবে?

—আর পাঁচটা মেয়ে যেভাবে মানুষ হয়। তোমার খপ্পরে পড়লে তা হবে না। সে 'একবগ্গা' হয়ে উঠবে!

বহুক্ষণ নীরব রইলেন রূপেন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, গাঙ্গুলীমশাই! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, বিচক্ষণ। আপনার তিন তিনটি কন্যা। আপনি তাদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী মানুষ করুন —আমি তো বাধা দিতে আসছি না; কিন্তু আমার সন্তানকে...

মাঝপথেই উনি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, তুমি সন্তানপালনের কী জান? কী তোমার অভিজ্ঞতা যে, ঐ এক ফোঁটা মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছ?

—হ্যাঁ, পিসেমশাই, এ-কথা আপনি বলতে পারেন। শিশুপালনের কোন অভিজ্ঞতা আমার নাই। কিন্তু পৈত্রিক ভিটাতে আমার পিসিমাতা আছেন, আমার পিসতুতো বোনও আছে। তারা...

একটা হাত সামনে বাড়িয়ে ভবতারণ রূপেন্দ্রনাথকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। বিচিত্র হেসে বললেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে তুমি কতটা সংসার-অভিজ্ঞ! শোন বাবাজী! তোমার পূজ্যপাদ পিসিমাতা ঠাকুরানী আজ একবছর হতে চলল স্বর্গলাভ করেছেন। তুমি সে খবরটুকুও রাখ না। তার উপর তোমার ভগিনী আর ভগিনীপতিও বর্তমানে সোঞাই গাঁয়ে থাকে না। বর্ধমানের পত্তনিদার নগেন দত্ত গঙ্গারামকে বর্ধমানের মানকরে ত্রিশবিঘে জমি লাখেরাজ বন্দোবস্ত দিয়েছে, একটি পাকা মোকামও বানিয়ে দিয়েছে। তার মাতৃশ্রাদ্ধের দান। তোমাকেই দেবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। তোমাকে না পেয়ে তোমার ভগিনীপতিকেই মাতৃশ্রাদ্ধে নিয়ে এসে দিয়েছে। কুসুম মরে বেঁচেছে। তার শ্বশুরের ভিটেতে আজ সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ জ্বালে না, শাঁখে ফুঁ পাড়ে না। যাও, বাবাজীবন, গাঁয়ে ফিরে গিয়ে দেখ — জানলাদরজাগুলো স্বস্থানে আছে কি না। গত বর্ষায় কখান ঘর মুখ থুবড়ে পড়েছে তার হিসেব করগে।

রূপেন্দ্রনাথ কোন প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না।

এবার সোজা হয়ে বসলেন ভবতারণ। বললেন, শোন, রূপেন্দ্রনাথ। একটি শর্তে আমি স্বীকৃত হতে পারি। তোমার শিশুকন্যাকে তোমার হাতেই সমর্পণ করতে পারি। তুমি শর্তটা রাখবে?

ওঁর চোখে চোখ রেখে রূপেন্দ্র বললেন, কী শর্ত?

—না, ধনুকভাঙা কোন পণ নয়। স্ত্রীবিয়োগে সাধারণ সুস্থমস্তিষ্কের মানুষে যা করে থাকে। স্ত্রী বর্তমানেও করে। তোমার ভগিনীপতি শ্রীমান গঙ্গারাম যা দেড় দুশ বার করতে পেরেছিল...

—পুনর্বিবাহ?

—হ্যাঁ! পাত্রীর সন্ধানে তোমাকে ভূ-ভারত দাবড়ে বেড়াতে হবে না। তার যোগান দেব আমিই। তোমার মেয়েকে যে মেয়েটি নিজের মেয়ের মতো এই আড়াই বছর ধরে মানুষ

pathagar.net

করছে, সেই তুলসীর কথাই বলছি আমি। আমরাও নৈকষ্য কুলীন, তোমাদের পাল্‌টি ঘর। তুলসীকে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে চেন, দেখেছ। কুসুমমঞ্জরীর মৃত্যুর পর আমি একটি দুগ্ধবতী ধাত্রীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলাম; কিন্তু তোমার কন্যা আজও তুলসীকে 'মা' বলেই জানে!

দীর্ঘক্ষণ রূপেন্দ্রনাথ নতনেত্রে চিন্তামগ্ন রইলেন। তারপর বললেন, আমাকে মার্জনা করবেন, পিসেমশাই। বিবাহ করব না এই রকমই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কৈশোরকালে। সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি — নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। আমি কুসুমমঞ্জরীকে বিবাহ না করলে তার সঙ্গে এক বৃদ্ধের...

—জানি বাবাজী, আমি পূর্ব-ইতিহাস সবই জানি। শোন। একবার উপরোধে পড়ে যখন ঢেঁকি গিলতে পেরেছ, তখন দ্বিতীয়বারই বা পারবে না কেন? এবারও তো তুমি নিতান্ত নিরুপায়। লাঠিয়াল নিয়ে এসে তোমার মেয়েকে আমার দেউড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, এ-কথা তুমিও জান, আমিও জানি। তাহলে দ্বিতীয়বার টোপর-মাথায় এসে এই শ্বশুরবাড়ি থেকেই সস্ত্রীক কন্যাটিকে স্বগ্রামে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হচ্ছ কেন বাবাজী?

রূপেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শিরশ্চালন করে তাঁর অসম্মতিটাই পুনরায় জ্ঞাপন করলেন।

ভবতারণ রূঢ়স্বরে কী-একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই বৃদ্ধা কানাইয়ের মা অতর্কিতে আবির্ভূত হল অন্তঃপুর থেকে। বললে, বড়-মা বললেন অঁরে ভিতর বাড়িতে নে যেতে।

ভবতারণ গর্জে উঠতে গিয়ে সামলে নিলেন। বুঝলেন, বাকি কাজটা তুলসীর মায়েরই বটে। পাইক-বরকন্দাজ-লাঠিয়াল দিয়ে আর যেকোন কাজই উদ্ধার করা যাক না যাক, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। বললেন, ঠিক আছে। যাও!

pathagar.net

কানাইয়ের মায়ের পিছন-পিছন অনেকটা পথ যেতে হবে। সদর আর অন্দর এই দুই মহলের মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তাতে হা-ডু-ডু খেলা যায়। রূপেন্দ্রের মনে পড়ে গেল প্রথমবার ঐ অন্দরমহলে পদার্পণের কথা। সেবার নতুন জামাইয়ের অবস্থা হয়েছিল সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো। না — উপমাটা ঠিক হল না। বরং বলা উচিত অভিমন্যুর বাপের মতো। প্রমীলারাজ্যে পদার্পণের পরে। নতুন জামাই দেখতে একঝাঁক প্রজাপতির মতো সুন্দরী ভিড় করে এসে জুটেছিল। ভবতারণের দুই বিবাহ, ফলে রূপেন্দ্রের দুই

পিসশাশুড়ী! কোনটি আসল, কোনটি নকল তখনো চিনে ওঠার অবকাশ পাননি। তার উপর তাঁদের দুই জা, তিন ননদ, পুত্রবধূ — সর্বোপরি রূপেন্দ্রের তিন শ্যালিকা। বড়দি বিবাহিতা, শ্বশুরবাড়িতে, মেজদি: পঞ্চদশী: তুলসী, আর কনিষ্ঠা একাদশী: শেফালি। সে এক প্রজাপতির হাট! কে যে প্রণম্যা আর কার প্রণাম গ্রহণ করতে হবে বুঝে উঠতে পারেননি।

এবার কিন্তু তা হল না। কানাইয়ের-মা ওঁকে নিয়ে এল একটি কক্ষে — যা বাহির-মহলেরও নয়, আবার অন্দর-মহলেরও নয়। বলা যায় তা: ঘরেও নহে, পারেও নহে!

প্রাক-ইংরাজ যুগে বাঙলার জমিদার বাড়ির স্থাপত্যে এই কক্ষটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন গবেষক আলোচনা করেছেন বলে জানি না। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই কক্ষটির নামকরণ: 'অন্তরাল'।

পাঠক-পাঠিকা আমাকে মার্জনা করবেন। ঔপন্যাসিককে থামিয়ে এখানে স্থপতিবিদ কিছুটা বকবক করবে। আপনারা ক্ষমা-ঘেন্না করে মেনে নেবেন।

মন্দিরের একটি অঙ্গের নাম: 'অন্তরাল'। মণ্ডপ থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের পথে ছোট্ট একটি স্থান। হিন্দু মন্দিরে মণ্ডপ বা জগমোহন থেকে সরাসরি গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। ঐ অন্তরালের ক্ষুদ্র পরিসরে থমকে দাঁড়াতে হয়। মনটাকে সংযত করতে হয়, তৎগত করতে নয়। তন্নিষ্ঠ করতে হয়। সূর্যের আলো থেকে প্রদীপালোকে অভ্যস্ত হতে, দৃষ্টিকে সূচীমুখ করতে, মস্তিষ্ক কিছুটা সময় চায়। তারপর তদ্গত চিত্তে গর্ভগৃহের মূলাধারে প্রবেশ করতে হয়।

'প্রাক-ফেরঙ্গ' যুগের স্থপতি ঐ ভাবটিই গ্রহণ করেছিলেন রাজপ্রাসাদ নির্মিতিতে। যদিও এখানে 'অন্তরালের' প্রয়োজন ও ব্যবহার ভিন্ন প্রকারের। রানী-মায়েদের অথবা বধূমাতাদের বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব নিয়ে বা তত্ত্বতালাশ নিতে কখনো কখনো এমন মানুষ আসেন —নায়েব, গোমস্তা, এমনকি দেওয়ানজী, অথবা দূর-সম্পর্কের খুড়ো, মামা, মামাতো-পিস্‌তুতো ভাই — যাঁদের সরাসরি অন্দরমহলে ঠাঁই দেওয়া যায় না। তাঁরা আশ্রয় নিতেন বাহির-মহলের সদর-সংলগ্ন অতিথিশালায়। তা তো হল, কিন্তু 'চোরে-কামারে' সাক্ষাৎটা হয় কোথায়? বহিরাগত আগন্তুক যেমন অন্দর-মহলে আসতে পারেন না, ঠিক তেমনি রানী-মা অথবা বধূমাতাও যেতে পারেন না সদর-সংলগ্ন অতিথিশালায়।

স্থপতিবিদ এই সমস্যার চমৎকার একটি সমাধান করেছিলেন, দুই মহলের মাঝামাঝি ঐ একটি 'অন্তরাল-কক্ষ' নির্মাণ করে। কখনো কখনো সে-কক্ষের মাঝখানে এড়োএড়ি একটি চিক্ টাঙানোর ব্যবস্থাও থাকে। শরদিন্দুর ভাষায় যা-নাকি 'স্বতাতন্ত্রীসদৃশ্য-স্বচ্ছ'! প্রোষিতভর্তৃকা অথবা বিগতভর্তা রানীরা যাতে দেওয়ান অথবা উকিলবাবুর সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনা করতে পারেন। তাই ঐ চিকের 'অন্তরাল'। হয়তো তা থেকেই কক্ষটির নামকরণ।

যাক ও-সব স্থাপত্যের কচকচি। যে-কথা বলছিলাম। কানাইয়ের মা বিরাট প্রাঙ্গণ পার হয়ে রূপেন্দ্রকে অন্দরমহলে নিয়ে এল না। চোখের পলকে একটি পর্দা সরিয়ে ওঁকে ডাক দিল: আসেন!

এখন দিবাভাগের প্রথম-প্রহর, তবু কক্ষটি আলো-আঁধারী। জানলা নেই, একটিই

দরজা। অনেক উঁচুতে পায়রাখোপ ফোকর, যেমন আছে সাসারামে শেরশাহ্ সূরের সমাধিতে। সেই ফোকর দিয়ে স্থপতির কেরামতিতে আলো এসে কক্ষটিকে স্নিগ্ধ মায়াজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘরে একটি মেজ, দুটি মাত্র কামদার কেদারা। পিছনের দেওয়ালে একটি ফরাসীদেশীয় দেওয়াল ঘড়ি।

রূপেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র কেদারা থেকে উঠে দাঁড়ালো তুলসী। তার পরিধানে এখন সিঁদূরবরন রেশমের শাড়ি। ব্রোকেডের কাজ করা জ্যাকেট। মাথায় এক-বিনুনী। দুই কানে ঢেঁড়ি-ঝুমকো। গলায় জড়োয়া শতনরী। দুই হাতে কাচের ও সোনার চুড়ি। কপালে কুমকুমের টিপ, নাকে নোলক।

রূপেন্দ্র সবিস্ময়ে তাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তারপর কানাইয়ের মাকে বললেন, তুমি যে তখন বললে বড়-মা আমাকে ডেকেছেন?

কানাইয়ের মাকে জবাব দিতে হল না। তার আগেই আগ বাড়িয়ে তুলসী বললে, ও মিছে কথা বলেছিল বাঁড়ুজ্জেমশাই। ওর দোষ নেই। আমিই ওকে মিছে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ফলে, আপনাদের শাস্ত্রে এজন্য যদি নরক দর্শনের বিধান থাকে তাহলে ও যাবে না, আমাকেই নরকে যেতে হবে। বসুন। অনেক কথা আছে।

তুলসী এবার এপাশ ফিরে কানাইয়ের-মাকে বললে, এবার তুমি নিজের কাজে যাও কানাইয়ের-মা। আমি দরজায় আগড় দেব।

কানাইয়ের-মা চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে যীশুখ্রিস্টের ভঙ্গিতে দুই হাত দুদিকে বাড়িয়ে চেপে ধরল দোরের দুই পাল্লা। অনুচ্চ অথচ দৃঢ়স্বরে শুধু বললে: না!

তুলসী সবিস্ময়ে বললে: 'না'? কী না?

—ঐ দোরে আগড়-দ্যাওনের কথাডা! আমি হেথায় ডাঁইরে থাকব, কিংবা বসব গে ঐ দূরের রোয়াকে। তোমরা কতা-কও, আশ মিটিয়ে কতা কও — আমি শুনতে আসপনি; কিন্তুক ব্যস! ঐ পয্যন্তই! দোরে আগড় দেওয়া চলবেনি!

তুলসী লজ্জিত হয়, অপমানিতও বোধ করে। রুক্ষস্বরে বলে, তুমি কী বলছ কানাইয়ের মা? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস...

কথাটা বৃদ্ধা শেষ করতে দিল না। মাঝপথেই বলে ওঠে। দেখ মেজদি, আমি না-বিইয়ে কানাইয়ের মা হইনি। তিন-কুড়ি বয়স হল আমার! তাই বলি, এডা বিশ্বেস-অবিশ্বেসের কতা নয়। এটাই হল নিয়ম। তোমার মা-মাসিরেও এই ঘরে পরপুরুষের সাথে কতা কইতে দেখিছি। তাতে দোষ নাই; কিন্তুক ব্যস। ঐ পয্যন্তই। দোরে আগড় দেওয়া চলবেনি। বাড়ির নিয়মডা তো মানবে? না কী?

রূপেন্দ্র বললেন, ও তো ঠিক কথাই বলছে, তুলসী। তোমার যদি বিশেষ কোন গোপন কথা বলার থাকে তাহলে পরিবারের হিতৈষিণী ঐ বৃদ্ধার সামনেই তা বলতে হবে।

কানাইয়ের মা বললে, অ্যা — অ্যাই! বলেন কেনে জামাইবাবু! আমি কি বে-হক কতা কইছি কিছু?

pathagar.net

জবাবের জন্য সে অপেক্ষা করল না। গটগট করে চলে গেল কিছুটা দূরে। শ্রুতিসীমার ওপারে, কিন্তু দৃষ্টিসীমার ভিতরেই, থাপন-জুড়ে বসে কানে একটা পাখির পালক গুঁজে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। নজর কিন্তু এদিক পানে।

রূপেন্দ্র তাগাদা দিলেন, এবার বল তুলসী, কেন ডেকেছ। সময় কম।

তুলসী সামলে নিল নিজেকে। বললে, সেটাই তো সমস্যা, জামাইবাবু। সময় বড় কম, জীবন বড় ছোট। তার মধ্যে 'অন্তরালে' আলাপচারী করার মতো দুর্লভ মুহূর্ত শুক্তির ভিতর মুক্তোর মতো দুষ্প্রাপ্য। বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাবো না। আর সে অধিকারই কি ছাই আছে নাকি আমার? আমি...

রূপেন্দ্র কথার মাঝখানেই বলে ওঠেন, একটা কথা। তুমি কিন্তু আমাকে বরাবর 'আপনি' বলে কথা বলে এসেছ, তুলসী।

—আজ্ঞে না হুজুর। আপনার ভুল হল। সেটা দু বছর অতীতের কথা। তখন আমি ছিলাম পঞ্চদশী, এখন সপ্তদশী। তখন আমি ছিলাম শুধুই শ্যালিকা, এখন...

—এখন?

—স্বকর্ণেই তো শুনে এলাম বাবামশাইয়ের প্রস্তাব আর তোমার প্রত্যাখ্যান। আর তাছাড়া ইতিপূর্বে 'অন্তরাল'-এ এমন নির্জন প্রেমালাপ তোমার-আমার তো কখখনো হয়নি, সোনাদা!

—সোনাদা! মানে?

—গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির পদস্পর্শ করার অধিকার আমি কোনদিনই পাব না জানি — তুমি সে অধিকার আমাকে দেবে না — কিন্তু এই 'অন্তরাল' পর্যন্ত যে আসতে পেরেছি এটাই বা সারাজীবন ভুলব কেমন করে? তাই আমার এই কিছুক্ষণের প্রগলভতাটুকু স্বীকার করে নিও — এ সম্বোধন মীনুদির অনুকরণে। কয়েকটা খণ্ডমুহূর্তের জন্য আমার রুপোদা হয়ে গেছে: সোনাদা!

—মীনুর কথা তোমার দিদি তোমাকে বলেছে দেখছি—

—শুধু মীনুর কথা? সে তো সব সময় তোমার কথাই বলত। তোমার প্রেমে পাগলিনী রাই সর্বক্ষণ শুধু বলত তোমার সব কথা, স—ব কথা! দিদি আমাকে রাধাদির গপ্পোও বলেছে।

—রাধাদি! কোন রাধাদি?

—বাঃ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে? রাধাবেষ্টমী! ফরসীডাঙা যাবার পথে যে তোমার ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। তুমি বাধা দিয়ে নিজের মুখ সরিয়ে নিতে পারনি। মনে নেই?

—আমাকে এইসব কথা বলবার জন্যই কি তুমি আমাকে এখানে ডেকে এনেছ?

—না তো কী? তুমি কি ভেবেছিলে রাধাবেষ্টমীর মতো সংযম হারিয়ে তোমার মুখে চুমু খাবার জন্য?...না, না, মুখখানা অমন প্যাঁচার মতো কর না, সোনাদা। আমি রাধাবেষ্টমীর মতো বোকাও নই, হ্যাংলাও নই! আমি অতীতে তোমার শ্যালিকা ছিলাম, ভবিষ্যতেও তাই থাকব। সুতরাং ঠাট্টা-তামাশা করবার অধিকারটা তুমি কেড়ে নিতে পারবে না। আরও একটা অধিকার তুমি কেড়ে নিতে পারবে না আজ। সেটা কী জান? তোমার চুন্নিমুন্নি মেয়ের মুখে

আমার 'মা'-ডাক! তোমার স্ত্রী আমি কোনদিন হব না, কিন্তু তোমার মেয়ের মা আমি ইতিপূর্বেই হয়ে গেছি।

রূপেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, শোন তুলসী! তোমাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, কেন আমি সংসারী হতে পারছি না।

তুলসী তার কাঁকন-পরা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে চেপে ধরল রূপেন্দ্রের মুখ। বলল, থাক সোনাদা! ঐ এক-কথা তুমি জীবন কতবার আর বলবে? আমি ওদের মতো বোকা নই। নিজের মনকে আমি ঠিক মতো বুঝ দিতে পারব।

—কাদের কথা বলছ তুমি? কাদের মতো বোকা নও?

—তোমাকে নিয়ে আর পারি না, সোনাদা! সমোস্কৃত-শাস্ত্রের অত কচকচি তোমার মাথায় ঢোকে আর এই সহজ সরল কথাটা বুঝতে পারছ না? শোন! তুমি কি জান যে, তুমি দেখতে খুব সুন্দর? দারুণ, দা-রুণ সুন্দর? মেয়ে-মন আপনিই মোহিত হয়ে যায় তোমার সেই পৌরুষময় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিতে। মীনুদি, দিদি, রাধাবোষ্টমী...আর হ্যাঁ, অস্বীকার করে লাভ কী...এই পোড়ারমুখি...জানি না, আরও কেউ-কেউ এসেছিল কি না তোমার গোপন জীবনে! লক্ষ্মীটি, তুমি আমাদের উপর রাগ কর না, সোনাদা! তোমার আগুন-বরন গায়ের রঙ, অথবা দাহিকাশক্তির জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, ঠিক তেমনি আমরাও আমাদের এই পতঙ্গবৃত্তির জন্য দায়ী নই। আমরা জানি, ঝাঁপ দিলে নিশ্চিত মৃত্যু — তবু লোভ সামলাতে পারি না। পুড়ে মরি।

রূপেন্দ্রনাথ অভিভূত হলেন। পঞ্চদশী তুলসী ছিল প্রগলভা, এখনো সে তাই; কিন্তু ওর কথার পিছনে কিছু জোরালো যুক্তিও আছে।

তুলসীই আবার বলে, মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর না যেন, বাবামশাই অত্যন্ত জেদী, সময়-সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুরও। পরাজয় স্বীকার করা ওঁর ধাতে নেই। কাজীর বিচারে যদি বাপের অধিকার স্বীকৃত হয় তাহলে হয়তো মেয়েকে পাবে, জীবিতা নয়। তার চেয়ে, অনিবার্য নিয়তিকে মেনে নাও। সে আমাকেই মা বলে জানে। তাই তাকে জানতে দাও। আর নাও — এটা ধর।

আঁচলের তলা থেকে একটা ভেলভেটের পুলিন্দা বার করে ধরে।

—কী আছে এতে?

—দিদির গায়ের গহনা। তোমাদের গাঁয়ের জমিদার-মশায়ের উপহার। দিদি আমাকে গিয়ে গেছিল।

—ও! কিন্তু সেগুলো তো আমি নিতে পারব না, তুলসী। এগুলো তোমার দিদি তোমাকে দিয়েছিল। এ তোমার।

—না! তা হয় না বাঁড়ুজ্জে-মশাই। আপনি নিজে হাতে এই আশীর্বাদ-অলঙ্কার আমার গায়ে পরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছেন। শালী হিসাবে এই করুণার দান আমি নেব কেন?

রূপেন্দ্রনাথ ওর দুটি হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। বললেন আমি মনে-মনে সন্ন্যাস নিয়েছি, তুলসী। তুমি এগুলো প্রত্যাখ্যান করলে কুসুমমঞ্জরী স্বর্গে বসে চোখের জলে ভাসবে।

pathagar.net

আমি তোমাকে মিনতি করছি 'রূপার-মা'!

—কী? কী বললে?

—হ্যাঁ, তাই! তুমি যখন নির্দ্বিধায় দিদির হাত থেকে একফোঁটা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছিলে তখন তো তুমি রূপমঞ্জরীর বাবার কথা ভাবনি, তুলসী। আমার অজ্ঞাতেই তুমি আমাকে কৃতার্থ করেছ। রূপমঞ্জরীর জননীত্ব তুমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছ। রূপার বিয়েতে এই অলঙ্কার পরিয়ে তুমি তাকে সাজিয়ে দেবে, রূপার মা!

তুলসী বাঁ-হাতে চোখটা মুছতে গেল। গণ্ডে লাগল কজ্জলচিহ্ন। নিচু হয়ে প্রণাম করল রূপেন্দ্রনাথকে। উনি তাকে দুই বাহুমূল ধরে তুললেন। মুদিতনেত্র কপালে একটি চুম্বনচিহ্ন এঁকে দিয়ে অস্ফুটে কী যেন আশীর্বাদ করলেন।

"অঙ্গাঙ্গী ভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামথ্যানর্ণয়ঃ?
পশ্য টিট্টিভমাত্রেণ সমুদ্রঃ ব্যাকুলীকৃত।।"

ছোট্ট টিট্টিভ-টিট্টিভী-পক্ষী। খঞ্জনার মতো জোড়া-পায়ে সমুদ্রের পারে ভিজা বালিতে দুজনে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। তারপর সমুদ্রতীরের খাড়া পাহাড়ের ফোকরে টিট্টিভী ডিম পাড়ল। বাপ-আর মা পালা করে পাহারা দেয়। ডিমে তা দেয়। এদিকে চাঁদ যতই প্রতিপদ থেকে অমাবস্যার দিকে এগিয়ে চলে সমুদ্র ততই ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে জোয়ারের টানে। টিট্টিভ-টিট্টিভনী কিচির-কিচির করে গাল পাড়ে। সমুদ্রকে সাবধান করতে চায়। না হলে সমুদ্রের ঢেউয়ে ওদের চুনমুন্নু ডিমটা ভেসে যাবে যে!...কোথায় দিগন্তচুম্বিত যাদঃপতি নীলাম্বুধি আর কোথায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টিট্টিভ-দম্পতি!

শেষমেশ টিট্টিভ দম্পতি এসে দরবার করল পক্ষিকুলতিলক গরুড়-এর কাছে। গরুড় মহা-শক্তিধর; কিন্তু সমুদ্রের কাছে তাঁর ক্ষমতাই বা কতটুকু? ফলে গরুড় দরবার করেন তাঁর প্রভু স্বয়ং নারায়ণের কাছে : দীনদয়াল! তুমি না বাঁচালে তো রক্ষা করা যাবে না ঐ টিট্টিভ-দম্পতির সন্তানকে।...শ্রীহরির যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল। সমুদ্রকে ডেকে অ্যাইসা কড়কে দিলেন যে, সমুদ্র ভাঁটার টানে পিছিয়ে গেল কয়েক যোজন!

তোমরা জান কি জান না জানি না, মহাপণ্ডিত এ. এল. ব্যাশমের মতে হিতোপদেশ রচিত হয়েছিল এই অতিভঙ্গ, তবু রঙ্গভরা বঙ্গভূমেই। লেখক জনৈক নারায়ণ-পণ্ডিত! বাঙালি! মোটকথা আমাদের নায়ক পণ্ডিত রূপেন্দ্রনাথের পড়া ছিল পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এই হিতোপদেশ কাহিনী।

এখানে একাধিক উপমান, একাধিক উপমেয়।

ক্ষমতাগর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন যিনি সেই ভবতারণ জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিতে চান টিট্টিভ-দম্পতির ভালবাসার শেষ অবশেষ, ঐ একফোঁটা মেয়েটাকে। যদি তার বাবা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিপদটা বুঝতে না পারে, তুলসীর মতো সুন্দরী মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে। কেন? ওঁর চেয়ে রূপেন্দ্রকে কৌলিন্যমর্যাদা আর করও দেবার হিম্মৎ আছে? রূপেন্দ্র কি বাজার যাচাই না করে কথা দেবে না? তিনিও দেখে নেবেন — কী করে ঐ এক ফোঁটা মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে যায় ঐ হাড়-হাবাতে একবগ্গা কোবরেজ!

কিন্তু রূপেন্দ্র জানতেন, ফরাসী-গভর্নর ডুপ্লেক্সের দক্ষিণহস্ত ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সখ্যতার সম্পর্ক। প্রাকবিবাহ জীবনে ঋষধ্বজ নামে এক ধনবান ব্যবসাদারের চিকিৎসা করতে রূপেন্দ্র একবার সোঞাই থেকে কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন। সেই সময়েই সখ্যতা হয়েছিল ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সঙ্গে। তিনি তখন 'অন্নদামঙ্গল' শেষ করে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করছেন। ঐ সূত্রে মহারাজের অন্দরমহলেও একদিন তাঁকে যেতে হয়। মহারানীকে পরীক্ষা করে ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা দিতে এবং মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ রাখতে। সেসব কথা অন্যত্র বিস্তারিত বলেছি। রূপেন্দ্র স্থির করলেন মহারাজের মাধ্যমে ইন্দ্রনারায়ণকে ধরবেন। ভবতারণ তাঁর নিয়োগকর্তার আদেশ অমান্য করতে পারবেন না নিশ্চয়।

ফরাসীডাঙার ঘাট থেকে আবার গঙ্গা বেয়ে উজানে চললেন নবদ্বীপ। সেখান থেকে জলাঙ্গী বেয়ে কৃষ্ণনগর তো একবেলার জলপথ। রাজবাড়ি থেকে খেয়াঘাট পর্যন্ত টানা উত্তর-দক্ষিণ খোয়া-বাঁধানো সড়কটার নাম সেকালে ছিল 'রাজপথ'। পরে যার চলিত নাম হয় 'হাই স্ট্রিট', স্বাধীনতার পর এখন যা 'আর. এন. টেগোর রোড'। তার দুপাশে অতি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিশুগাছ, মাঝে দুটি তালাও, তিনটি বড় ইঁদারা। তখনো গো-আড়ি গ্রামে জনবসতি বিশেষ ছিল না। ঐ খেয়াঘাটে ছিল কিছু মালো, মৎস্যজীবীদের আবাস। জলাঙ্গীর স্রোতধারা ধরে ক্রোশ দুই উজানে গেলে মৃৎশিল্পীদের গ্রাম। হাস্যার্ণব গোপাল ভাঁড়ের বাস সেখানে।

রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পুঁটুলি বগলে ঐ রাজপথ ধরে দক্ষিণমুখো রাজপ্রাসাদের দিকে চলেছেন। পথে লোকজন আছে। অধিকাংশই পদব্রজে চলেছে, কিছু গো-গাড়ি, ক্বচিৎ কখনো কোন রাজপুরুষ অশ্বারোহণে ধুলার ঘূর্ণী তুলে ছুটছেন। হঠাৎ একটি দু-ঘোড়ার সৌখীন গাড়ি এসে থেমে গেল ওঁর পাশে — 'রোখকে! রোখকে!' শব্দে।

গাড়োয়ান এবং আরোহী উভয়েই নির্ভেজাল বাঙালি; কিন্তু আদেশ ও গালাগালের সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্য-বাঙালি উত্তরভারতের ভাষা ব্যবহার করতেন। ক্ষমতায় কুলালে উর্দু, না-কুলালে হিন্দি!

গাড়ি থেমে গেল। পিছনের একমাত্র আরোহী সৌখিন লোক। উর্ধ্বাঙ্গে রেশমের পিরান, রেশমের উত্তরীয়। মাথায় উষ্ণীষ, পরিধানে মলমলের কোঁচানো ধুতি। তাঁর বাঁ হাতে একটি শিক্‌রে-বাজপাখি।

গাড়ি থেকে মুখ বার করে যুবকটি বললে, কোবরেজ-মশাই না?

রূপেন্দ্র চোখ তুলে দেখলেন। চিনতে পারলেন। উলার বর্ধিষ্ণু ভূম্যধিকারী রসিকলাল। তিনি বলেন, উঠে আসুন গাড়িতে। কবে এসেছেন? গঙ্গারাম কোথায়?

রসিকলাল ধনীব্যক্তি। আনুষঙ্গিক সবকয়টি চরিত্রদোষও আছে। রূপেন্দ্র ওঁর সঙ্গ পছন্দ করেন না বিশেষ। রাস্তায় দাঁড়িয়েই বলেন, আজ এইমাত্র এসেছি। গঙ্গারাম ভালই আছে।

—তা গো-আড়ি গাঁয়ে থাকবেন কোথায়? আপনার বয়স্যকে তো মহারাজ দেশছাড়া করেছেন, শুনেছেন নিশ্চয়।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যে আর কৃষ্ণচন্দ্র (তখনো তিনি মহারাজ নন, রাজা — কিন্তু মুখেমুখে সবাই মহারাজই বলে) রায়ের সভাকবি নন এ তথ্যটা জানা ছিল না। উনি স্থির করেছিলেন ভারতচন্দ্রের ভদ্রাসনেই আতিথ্য গ্রহণ করবেন; এখন বুঝলেন সেটা সম্ভবপর নয়। তাই বললেন, মহারাজের অতিথিশালায় উঠব স্থির করেছি।

—ইচ্ছে করলে আমার গরিবখানাতেও থাকতে পারেন। তবে সেটা রাজবাড়ি থেকে বেশ দূরে, উলায়।

—না। আমার প্রয়োজনটা গো-আড়িতেই।

—তা বেশ তো। উঠে আসুন। রাজবাড়িতেই নামিয়ে দেব। উলা যেতে সেটা তো আমার পথেই পড়বে।

অগত্যা উঠতে হল গাড়িতে। গাড়ি ছাড়ল। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, আমার বন্ধু তো দেশছাড়া, আপনার বয়স্য কেমন আছেন? ঝষধ্বজ দত্ত?

—ঝষা? হতভাগা ফৌত হয়েছে। কুষ্ঠ হয়েছিল। হবেই! পাপে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে থাকত ইদানীং।

রূপেন্দ্র বুঝতে পারলেন। কুষ্ঠ নয়। রতিজ রোগ উপদংশ। পরবর্তী শতাব্দীতে যার নাম হবে 'সিফিলিস!' কিন্তু সে-কথা বললেন না।

রাজবাড়িতে এসেও দুঃসংবাদ পেলেন। রাজামশাই মুর্শিদাবাদে গেছেন নবাবী তলব পেয়ে। কবে ফিরবেন তা দেওয়ানজী হয়তো জানেন, তাঁর দপ্তর জানে না। তবে অতিথিশালায় আশ্রয় পেতে কোনও অসুবিধা হল না। নায়েব ওঁকে চিনতে পেরেছে। কুশলপ্রশ্ন করে ওঁর যাবতীয় বন্দোবস্তের আয়োজন করল। একটু পরে স্বয়ং শিবচন্দ্র এল রূপেন্দ্রর তত্ত্বতালাশ নিতে। শিবচন্দ্র রায় কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র — যুবরাজ। রূপেন্দ্রকে প্রণাম করে বললে, বাবামশাই মুর্শিদাবাদ থেকে কবে ফিরে আসবেন তার স্থিরতা নেই। আপনার অভিরুচি হলে এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন। আর আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজনটা যদি আমাকে জানানো সম্ভবপর হয় তাহলে আমিও চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রূপেন্দ্র কী জবাব দেবেন স্থির করে উঠতে পারেন না।

শিবচন্দ্র নিজে থেকেই বলে, বুঝেছি! আপনাকে আর একটা কথা বলার আছে। আপনি এসেছেন সংবাদ পেয়ে বড়মা একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। কখন আপনি অন্দরমহলে পদধূলি দিতে আসবেন বলুন। আমি সেইমতো ব্যবস্থা করে দেব। সব চেয়ে ভাল হয় যদি স্নানান্তে বড়মার মহলে মধ্যাহ্ন-আহার সেবা করেন।

রূপেন্দ্র জানতে চাইলেন, কেমন আছেন তোমার বড়মা?

—ভালই আছেন। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের দুই বিবাহ। শিবচন্দ্রের জননীকে আগের বার চিকিৎসক হিসাবে পরীক্ষা করতে হয়েছিল। রূপেন্দ্র সম্মত হলেন।

কৃষ্ণনগর রাজবাটিতেও একটি 'অন্তরাল' আছে। ইতিপূর্বে রূপেন্দ্র সেখানে বসেই মহারাজের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-আহার করেছিলেন। তারপর রাজসমভিব্যাহারে বড়মার মহলে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। এবার শিবচন্দ্র তাঁকে সরাসরি বড়মার অন্দর-মহলে নিয়ে এসে একটি 'প্রতীক্ষা-কক্ষে' বসালো।

একটু পরেই বড়-রানীমা এলেন। রূপেন্দ্রের প্রায় সমবয়সী। উনি রানীমার প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাই রানীমা ঝুঁকে নমস্কার করলেন। রূপেন্দ্রও আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও নত হয়ে প্রতিনমস্কার করলেন।

রানী-মা জানালেন, এ তিনবছর তিনি অনেকটা ভাল আছেন। শিরঃপীড়া এবং বুকের ব্যথাটা আর হয়নি। জানতে চাইলেন, আপনার ঔষধ-বটিকা প্রায় বছরখানেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আমি বর্ধমানে সোঞাই গাঁয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি তীর্থ করতে গেছেন। এখন যখন ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল তখন বলুন — ঐ ঔষধবটিকা কি আরও খেতে হবে?

রূপেন্দ্র বললেন, না, রানীমা। মাথা বা বুকের বেদনা যখন সম্পূর্ণ সেরে গেছে তখন ঐ ওষুধটা আর খেতে হবে না। কিন্তু ঐ সঙ্গে আপনাকে আরও নির্দেশ দিয়েছিলাম রোজ প্রত্যুষে কুলুখকলাই ভিজানো এক ঘটি জল পান করতে। সেটা কি করছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আপনার নির্দেশে শিশির-ভেজা ঘাসে সূর্যোদয়ের পূর্বে খালি পায়ে বেড়াই। সে নির্দেশটাও মানি — মানে, বর্ষাকাল বাদে।

—খুব ভাল কথা। ও দুটি নির্দেশ মেনে চলবেন। তাতে উপকারই হবে। একটা কথা শুনলাম রানীমা, গো-আড়ি গাঁয়ে এসে — ভারতচন্দ্র নাকি আর মহারাজের সভাকবি নন?

রানীমা হেসে বললেন, কথাটা বুঝি ঐভাবে প্রচার পেয়েছে? তা নয়। আসল ব্যাপারটা শুনুন :

বিদ্যাসুন্দর রচনা শেষ করে কবি কিছু ক্লান্তি অনুভব করেন। পাঠকদের ভিতর কাব্যের মিশ্র প্রতিক্রিয়াতেও বোধ করি ওঁর মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। উনি শহর থেকে দূরে কিছুদিন থাকবেন বলে স্থির করেন। রাজা সানন্দে স্বীকৃত হন। কবিকে বিদ্যাসুন্দর রচনার পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ তাঁকে মূলাজোড় গ্রামখানি বার্ষিক ছয়শত টাকা রাজস্বের বিনিময়ে ইজারা দেন এবং ঐ গ্রামের যে কোন প্রত্যন্তদেশে একটি গৃহ নির্মাণের জন্য একশত টাকা দান করেন। কবি নাগরিক জীবন ত্যাগ করে গ্রামবাসী হলেন। আযৌবন প্রোষিতভর্তা প্রিয়াকে নিয়ে এসে মূলাজোড়ে বসবাস করতে থাকেন। রানীমা আরও জানালেন ইতিমধ্যে বর্গীর উৎপাতে ভীত হয়ে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র মূলাজোড়ের পার্শ্ববর্তী কাউগাছি গ্রামে এসে কয়েক মাস ছিলেন। গ্রামখানি বর্ধমানরাজমাতার পছন্দ হয়ে যায়। তিনি ঐ গ্রামটি নিজের

নামে পত্তনি নিলেন। আর একজন কর্মচারীকে পত্তনিদার নিযুক্ত করলেন। বর্ধমানরাজের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সদ্ভাব কোন কালেই ছিল না। কৈশোরে ভারতচন্দ্র বর্ধমানরাজের কারাগারে আবদ্ধও হয়েছিলেন। বিদ্যাসুন্দর রচনায় বর্ধমানরাজ বোধ করি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। মোটকথা, কাউগাছি গ্রামের পত্তনিদার রামদেব নাগ পার্শ্ববর্তী গ্রাম মূলাজোড়ের ইজারাদার অর্থাৎ কবি ভারতচন্দ্রকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করেন। নাগরিক জীবন ত্যাগ করে গ্রামে বাস করা কবির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতচন্দ্র নিরুপায় হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে সংস্কৃতে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে দেন। কবিতাটির নাম : 'নাগাষ্টক'। কবিতাটির প্রত্যেকটি স্তবকের শেষ পংক্তি ছিল—"সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।"[১]

মহারাজ বুঝলেন। তিনি কবিকে পরামর্শ দেন নাগ-মহাশয়ের নাগালের বাহিরে গুস্তে গ্রামে গিয়ে বাস করতে। গৃহনির্মাণের ব্যয়ভার দিতেও তিনি স্বীকৃত হয়েছিলেন।

রানীমা জানালেন, কবি এখন নূতন গ্রামে নূতন ভদ্রাসনে যাওয়ার আয়োজন করছেন।[২]

এবার রানী-মা বললেন, আপনি রাজামশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। শিবচন্দ্রকে সে কথা জানাতে আপনি ইতস্তত করেছেন — শিবচন্দ্রই বলল। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আমাকে তা জানাতে পারেন। আমার ক্ষমতায় কুলালে এখনি তার প্রতিবিধান করব। অন্যথায় মহারাজ প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে জানাব। আপনি অবশ্য তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে পারেন। কিন্তু ততদিন হয়তো আপনার সহধর্মিণী—

রূপেন্দ্র ওঁকে থামিয়ে দিলেন। স্থির করলেন রানীমাকেই সব কথা খুলে বলবেন। কুসুমমঞ্জরীর মৃত্যু, কন্যাসন্তান প্রসব, ভবতারণের বিরূপতা।

রানীমা সব শুনে একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেই ফেললেন, গাঙ্গুলী-মশায়ের দ্বিতীয়া কন্যা তুলসী দেখতে কেমন?

রূপেন্দ্র লজ্জিত হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, না, রানীমা। সেসব কারণে নয়। তুলসী খুবই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। যেকোন সংসারে সে বাঞ্ছনীয়, উপযুক্তা। কিন্তু আমি আর দ্বিতীয়বার সংসারী হব না বলে স্থির করেছি।

—এটা একটা কথা হল? আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ...

---

১. অনন্তনাগের উপর সুষুপ্ত শ্রীহরিকে স্মরণ করে কবি জানাচ্ছেন যে বিরাগবশত নাগেই কবির সব কিছু গ্রাস করছে।

২. কাহিনীর বহির্ভূত হলেও এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, মূলাজোড়ের গ্রামবাসী এ ব্যবস্থাপনায় বাধা দেয়। তারা কবিকে ভালবেসে ফেলেছিল। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় রামদেব নাগ বেশি বাড়াবাড়ি করলে গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে প্রতিবিধান করবে। আনন্দের কথা : কবি সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং মূলাজোড়েই বাকি জীবন সানন্দে কাটিয়ে যান।

pathagar.net

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, সমাজের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়াটাকেই আমি জীবনের পরমার্থ বলে মনে করি না। আমার ইচ্ছা রূপমঞ্জরীকে পণ্ডিতা করে তুলব। এটাই হবে আমার জীবনের ব্রত। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে হয়ে উঠবে নতুন যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী, মদালসা। একা সে নয় — গৌড়মণ্ডলের বালিকাদের বিদ্যাদানের সুযোগ এনে দেবার জন্য আমি প্রাণপাত চেষ্টা করব। আমার মতে সমাজের অধঃপতনের দুটি মূল হেতু। একটি জাতিভেদপ্রথা — সমাজের একটা বলিষ্ঠ এবং বৃহৎ অংশকে জল-অচল করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়টি, সমাজের অর্ধাংশকে — নারীদের — অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম সমস্যাটা নিয়ে লড়াই করেছিলেন, আচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন — কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটা নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউই কোনও চেষ্টা করেননি। এ বিষয়ে আমি মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। গ্রামে গ্রামে তিনি চতুষ্পাঠী খুলে চলেছেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে এই নদীয়াতেও কিছু কাজ আজ পর্যন্ত করা হয়নি।

রানীমা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, সেটা হবে না পণ্ডিতমশাই। গৃহাভ্যন্তরে ব্রাহ্মণকন্যার অক্ষর পরিচয়দানে মহারাজের আপত্তি নেই — এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বালিকাবয়সেও কোনও স্ত্রীলোক গৃহাবরোধের বাহিরে পাঠশালায় গিয়ে পড়াশুনা করুক — এটাতে তাঁর দৃঢ় আপত্তি। ওঁর স্থির বিশ্বাস : কলিযুগে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হলে সমাজের বনিয়াদ ধসে পড়বে। ফিরিঙ্গি মেমসাহেবদের মতো তারা ভ্রষ্টচরিত্রের বিবি বনে যাবে। তাঁর মতে কন্যাদের অষ্টমবর্ষেই গৌরীদান করা বিধেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রনাথের।

রানীমা বললেন, আপনাকে আরও একটা গোপন কথা বলি। অপ্রিয় সত্য; কিন্তু আপনাকে জ্ঞাত করানোই মঙ্গল। প্রথম কথা : ফরাসীডাঙার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে মহারাজের সম্পর্কটা ইদানীং ভাল নয়। দ্বিতীয় কথা : নৈতিক কারণেও সম্ভবত মহারাজ বোধহয় আপনার পরিবর্তে আপনার পিসাশ্বশুর গাঙ্গুলীমশাইকেই সমর্থন করবেন। হিন্দুধর্মে আবহমান কাল ধরে যেসব লৌকিক প্রথা প্রচলিত সেগুলি উনি পরিবর্তন করতে চান না। তাঁর মতে, কুলীন ব্রাহ্মণ হিসাবে আপনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে অস্বীকার করে সামাজিক বিধানকে অগ্রাহ্য করছেন।

রূপেন্দ্র বললেন, মহারাজের কথা বরং থাক, রানীমা। আপনি আমাকে নিজের কথা বলুন। আপনি কি অন্তর থেকে এইসব লোকাচারকে সমর্থন করেন?

—কোন সব লোকাচার?

—ধরুন সতীদাহ?

—'সতীদাহ' লোকাচার হতে যাবে কেন? এতো হিন্দুধর্মের একটা অঙ্গ।

—আদৌ নয়। কোনও প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থে এর সমর্থন নেই। অথবা ধরুন, বন্ধ্যানারী যে মানত করে থাকে সন্তানবতী হলে সে তার সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবে? এই কুপ্রথা আপনি সমর্থন করেন? মুসলমানেরা চারটির অধিক বিবাহ করতে পারে না, আর কুলীন ব্রাহ্মণেরা পঞ্চাশ-ষাট-একশটি মেয়েকে বিবাহ করছে! এগুলো কুপ্রথা নয়? মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিনি সমাজের মধ্যমণি — তাঁর পক্ষে এইসব কুপ্রথা রোধ করার চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করেন না আপনি?

রানীমা বললেন, আমার মনে করায় না করায় কিছুই যায়-আসে না পণ্ডিতমশাই। আমি বরং অন্য একটি প্রসঙ্গ আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

—বলুন?

—চিন্তা করে দেখুন, আপনার কন্যা রূপমঞ্জরীর বয়স মাত্র দুই আড়াই বৎসর। পাঠাভ্যাসের বয়স তার হয়নি। মায়ের অভাব সে অনুভব করে না; পিতার অভাব সম্বন্ধে এখনো সে অনবহিত। আপনার পিসাশ্বশুরের রাজবাড়িতে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে তার শৈশব কাটাচ্ছে। অপরপক্ষে আপনি নিজেই জানেন না, সোঞাই গাঁয়ে আপনার ভিটার কী অবস্থা। আপনার পিসিমা স্বর্গে গেছেন। জনমানব সেখানে বাস করে না। বাস্তুভিটাখানি খাড়া আছে কি না তাও আপনি জানেন না। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করে আপনি কোন বিচারে মেয়েটিকে সোঞাই নিয়ে যেতে চাইছেন?

রূপেন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।

ঠিকই বলেছিলেন রানীমা। রূপেন্দ্রনাথ যে নারীমুক্তি, নারীজাগরণ এবং সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ করতে চাইছেন, তাতে কোনক্রমে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পাওয়ার আশা নাই। কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ছিলেন। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, শঙ্কর তর্কবাগীশ, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী, শিবরাম বাচস্পতি, বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত ইত্যাদি প্রভৃতি অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সকলকেই নিষ্কর ভূখণ্ড দান করেছিলেন, চতুষ্পাঠী স্থাপনে অর্থসাহায্য করেছিলেন। সেকালে নদীয়াতে একটি প্রবচনই প্রসিদ্ধি লাভ করে : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান গ্রহণ যিনি করেননি তাঁর ব্রাহ্মণত্বেই সন্দেহ জাগে।

বলাবাহুল্য একমাত্র ব্যতিক্রম : রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—

'বুনো রামনাথ'!

সে-কালে পাঁচবছর বয়সে বালকদের চূড়াকরণ ও বিদ্যাকরণ শুরু হত। ইদানীং যাকে আমরা 'হাতে-খড়ি' বলি। প্রথমে তারা অ-আ-ক-খ, শুভঙ্করী আর নামতা মুখস্ত করত। তারপর ক্রমে ক্রমে ছাত্রকে শেখানো হত ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ (গণিত ও ফলিত), ষড়দর্শন, এবং বৈদিক ছন্দ তথা বৈদিক ব্যাকরণ। সারা বাঙলাতেই গ্রামে ও নগরে ছিল চতুষ্পাঠী। বঙ্গদেশের এইসব চতুষ্পাঠীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়দেশের বাহির থেকেও যথেষ্ট ছাত্র আসত — এতই খ্যাতি ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রামের চতুষ্পাঠী আর টোলের। কবি রামপ্রসাদ বর্ধমানের একটি চতুষ্পাঠীর বর্ণনায় লিখছেন :

চৌদিকে টোপাড়িময় পাঠ চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহুচ বাড়ি বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী।।[১]

সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান ছিল টোল। চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপনান্তে উৎসাহী ছাত্ররা টোলে উচ্চতর জ্ঞানের জন্য উপস্থিত হত।

ডঃ আলোককুমার চক্রবর্তী লিখছেন[২]

> তৎকালীন বাংলার চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া, কৃশদহ, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হাওড়ার বালী, ঢাকার রাজনগর ও বিষ্ণুপুর ইত্যাদি বহু স্থানে সংস্কৃতশিক্ষার টোল ছিল। ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, বেদ, পুরাণ, অভিধান ইত্যাদি পড়ানো হত। ছাত্ররা ন্যায়শাস্ত্র শিখবার জন্য নবদ্বীপ যেত। অনেকে আবার দর্শন ও স্মৃতিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মিথিলায় যেত। ব্যাকরণ, অলংকার ও বেদ-এ উচ্চতর জ্ঞানের জন্য ছাত্ররা কাশী যেত। শিক্ষান্তে সাধারণতঃ তারা নিজ নিজ গ্রাম বা শহরে ফিরে চতুষ্পাঠী ও টোল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা দিত। ...এডামের অনুমান তখন সারা বাংলায় ১,৮০০টি টোল ও ১২,৬০০ অধ্যাপক ছিলেন।
>
> কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা মক্তব ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।...ছাত্রদের মক্তবে আরবী, উর্দু, ফারসী বর্ণমালা লেখা ও পড়া, প্রাথমিক অংক এবং ইসলামী ধর্মশাস্ত্র শেখানোর ব্যবস্থা ছিল।...মাদ্রাসাগুলি বেশীর ভাগ মসজিদ বা ইমামবাড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রদের কোরাণ, হাদিস, সরাহ্, আরবী, ফারসী সাহিত্য, আরব দেশের বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র শেখানো হত। এগুলি নবাব, অভিজাত, আমির ও ধনী মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে পড়ানো হত।

---

১ 'সাধক কবি রামপ্রসাদ'—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 1954, পৃঃ 398-99.

২ 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'—ডঃ আলোককুমার চক্রবর্তী, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, 1989, পৃঃ 79.

তুলনায় সেযুগে — কী-হিন্দু, কী-মুসলমান — স্ত্রীজাতির শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, নাটোর, বা ঢাকার রাজবল্লভ তাঁদের এলাকায় স্ত্রী-শিক্ষার বস্তুত কোন ব্যবস্থাই করেননি। আট বছর পর্যন্ত হিন্দু বালিকারা পিতামাতা বা গুরুস্থানীয় কোনও পুরুষের কাছে পাঠগ্রহণ করত। সচরাচর সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনে যতটুকু পড়াশুনা দরকার, তার বেশি তাদের শেখানো হত না। শুভংকরী অংক, নামতা, কিছু ছড়া, চিঠি লেখার কায়দা। ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা হলে অশুদ্ধ উচ্চারণে কিছু স্তবস্তোত্র — গঙ্গার, শিবের। বছর-আষ্টেক বয়সের আগেই 'গৌরীদান' করে তাদের গোত্রান্তরের আয়োজন। তারপর তো ভিন্ন গোত্রের সদ্যপরিচিত একটি পুরুষের "ভুক্তেনবাচ্ছিষ্টংবধ্বৈ দদাৎ" [আহারান্তে যা খেতে পারলে না সেই ভুক্তাবশিষ্ট-সমেত এঁটো পাতাখানা ধর্মপত্নীকে ধরে দিও—(গৃহ্যসূত্র ১/৪/১১)] আইনে জীবনধারণের আয়োজন। যতদিনে না স্বামীসোহাগিনীরূপে তার চিতায় ওঠার সৌভাগ্য হয়। হিন্দু বালিকাদের তুলনায় দরিদ্রশ্রেণীর মুসলমান মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেত আরও অল্প। তাদের চিতায় উঠতে হত না, তালাক যেতে হত।

অথচ আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল, ধনাঢ্য পরিবারে অবস্থাটা সবসময় এমন ছিল না। কী হিন্দু, কী মুসলমান। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ধনবানদের গৃহাভ্যন্তরে স্ত্রীশিক্ষার অভাব সবক্ষেত্রেই ছিল না। সরফরাজ খাঁর জননী জিন্নতুন্নেসা, এবং ভগ্নী জাফিসা বেগম বিদুষী ছিলেন। সুজাউদ্দীনের কন্যা দরদানা বেগমও পড়াশুনায় আলিম ছিলেন। *রিয়াজ-উস্-সালাতীন* (লেখক, গোলাম হুসেন সলিম, ইংরেজি অনুবাদ আবদুস সালাম, 1904) আলিবর্দির প্রধানা বেগমসাহেবা : শরফ উন্নিসাকে বলেছেন সমকালীন বঙ্গদেশের "সুপ্রীম পলিটিকাল অফিসার"। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের (*মুর্শিদাবাদ কাহিনী*) মতে "...কর্মবীর আলিবর্দী খাঁর রাজনৈতিক জীবন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহায়তায় পূর্ণতালাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আলিবর্দ্দীর উচ্ছৃঙ্খল সংসার যেমন এই মহিলার তর্জনীতাড়নের অধীন ছিল, সেইরূপ বিপ্লব সাগরে নিমগ্ন সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনও তাঁহারই পরামর্শানুসারে চালিত হইত। জ্ঞান, ঔদার্য, পরহিতৈষিতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণে তিনি রমণীগণের মধ্যে অতুলনীয়া ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় হিতকর কার্য তাঁহারই পরামর্শের উপর নির্ভর করিত।"

মুসলিম-শাসনে প্রথম পর্যায়ে পাঠান যুগে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না; অন্তত এ গ্রন্থের লেখক ইতিহাসকারদের গ্রন্থ ঘাঁটাঘাটি করে তেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি; কিন্তু মুগল-জামানার আদি যুগ থেকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে হারেমের ভিতর বিদুষীদের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্তত গ্র্যান্ড-মুগল জমানায়। আওরঙজেবের পরবর্তী যুগে মুগলগরিমার সবকিছুর মতো এই স্ত্রীশিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্যও পশ্চিমে ঢলে পড়ে। তুলনায় বাবর থেকে আওরঙজেব প্রতিটি যুগে হারেমসারাই-র (বেগম-মহলের সর্বময়ীকর্ত্রী) সকলেই আরবী-ফার্সিতে আলিম। বাবুর-বাদশাহ্‌র আত্মজা গুলবদন বেগম দিয়ে তার সূচনা। তিনি আজীবন হুমায়ুনের সঙ্গেই বিচরণ করেছেন এবং "*হুমায়ুননামা*" রচনা করেছেন। বস্তুত তাঁর ঐ জীবনী গ্রন্থ থেকেই ইতিহাস বাবুরতনয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে। যেত

হুমায়ুনের ভাগীনেয়ী সালিমা সুলতানাও ফার্সিতে আলিম ছিলেন। জাহাঙ্গীরপত্নী নুরজাহাঁ, মমতাজমহল, জাহানআরা এবং জেব-উন্নিসা প্রত্যেকেই আরবী ও ফার্সী দুটি ভাষাতেই মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ জীবনীধর্মী গ্রন্থ, কেউ শয়ের, কেউ বা কাব্যগ্রন্থ। আলিমগীরের কন্যা জেব-উন্নিসা বেগমের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সঞ্চয় নাকি বিস্ময় উদ্রেক করত। জাহানআরার একটি শয়ের এত উচ্চমানের হয়েছিল যে, স্বয়ং সত্যেন দত্ত মুগ্ধ হয়ে তার বঙ্গানুবাদ করে যান। অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেটি উদ্ধৃত না করে থামতে পারছি না। হতভাগিনী জাহানআরা তাঁর সমাধিমূলে উৎকীর্ণ করার জন্য যে ফার্সি শয়েরটি রচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ কৃত তার অনুবাদ :

গরিব গোরে দীপ জ্বেল না
দিও না কেউ ফুল ভুলে ;
প্রজাপতির না পোড়ে পাখ্
দগ্ধ না পায় বুলবুলে।।

আরও বলি, এই মুগল যুগেই আকবরের হিন্দুপত্নী অম্বরমহিষীর প্রেরণায় শাহ্-এন-শাহ্ আকবর চেষ্টা করেছিলেন হিন্দুদের ভিতর প্রচলিত নিষ্ঠুর সতীদাহপ্রথা রদ করতে। সে-হিসাবে আকবর বাদশাহ রাজা রামমোহনের পূর্বসূরী।

হিন্দুসমাজের উচ্চকোটি মহলেও চিত্রটি একই রকম। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই রানীই বিদুষী ছিলেন। নাটোরের রানী ভবানী অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। রাজবল্লভের আত্মীয়া কবি ও পণ্ডিতা আনন্দময়ী সম্বন্ধে একটি তথ্য পাওয়া যায় : রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত-ধারণ উপলক্ষে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন কিন্তু যজ্ঞবেদীর মাপ কী হবে তা নির্ণয়ের সময় মতানৈক্য দেখা দেয়। বিদুষী আনন্দময়ী অথর্ব বেদ ঘেঁটে প্রামাণ্য মন্ত্রটি উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করে এ প্রতর্কের মীমাংসা করেন। সে-কথা শুনে মনে পড়ে যায় পৌরাণিক কালে রাজা জনকের সভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি কি-না তাই বিচার করতে সমবেত পণ্ডিতবর্গকে সরিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন মহাপণ্ডিতা গার্গী!

এ কিন্তু ব্যতিক্রমের চিত্র। সমগ্র বঙ্গভূমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে স্ত্রীলোকেরা অক্ষরপরিচয়হীনা। হিন্দুঘরের মেয়েরা বালিকাবয়সে 'পুন্নিপুকুর' করে, 'সুবচনী'র পুজো করে, ইতু করে, ভাদুপুজো করে। বামুনবাড়ির মেয়ে হলে বেস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো করে, পাঁচালী পড়ে অথবা মুখস্ত বলে। বড় জোর পুকুরে স্নানান্তে গামছায় ভিজে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে তোতাপাখির মতো আওড়ায়, "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে..."

মুসলমান মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ। তারা শাদির দলিলে মৌলভির নির্দেশে নির্দিষ্টস্থানে কালো কালির টিপছাপ দেয়।

প্রাক-পলাশীযুদ্ধের আমলে বঙ্গদেশে মেয়েদের জন্য কোনও পৃথক বিদ্যালয়ের উল্লেখ কোথাও পাইনি। কোম্পানির আমলে বোধ করি প্রথম স্কুলটি খোলেন কলকাতায়, মিসেস্ হজেস 1760 খৃষ্টাব্দে। তাতে বাঙালি মেয়ে — কী হিন্দু, কী মুসলমান — আদৌ পড়তে

যেত বলে মনে হয় না। সম্ভবত সেটি ছিল কোম্পানির ইংরেজ অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মচারীদের কন্যাদের শিক্ষার আয়োজনে!

আলোককুমার চক্রবর্তীর মতে (*মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, 1989) "এ যুগের (প্রাক-পলাশীযুদ্ধ) বিদ্যার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হলেন মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন, আলিবর্দী, বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ ও তিলকচাঁদ, বীরভূমের আসাদুল্লাহ ও বদিউজ্জামান খানের পরিবার, নাটোরের রামকান্ত ও তাঁর স্ত্রী রানী ভবানী, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহ, ঢাকার রাজবল্লভ সেন এবং নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এমন পৃষ্ঠপাষকতা বাংলার আর কোন ব্যক্তি করেছেন বলে জানা নেই।"

এই এতগুলি ধনকুবেরের মধ্যে কেউ কোথাও ব্যতিক্রম হিসাবেও বালিকাদিগের জন্য একটিমাত্র বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা করেছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের দৃষ্টির আড়ালে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত বাতাবরণে কোন কোন দূরদর্শী পণ্ডিত নিশ্চয় তা করেছিলেন। ক্ষুদ্র পরিসরে — হয়তো নিজের ভদ্রাসনেই। দু-পাঁচ-দশটি বালিকা বা রমণীকে নিয়ে তাঁরা বসেছেন। বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেছেন। আমার এ প্রতীতি অনেকটা 'প্লুটো' গ্রহকে দূরবীনে দেখতে পাওয়ার আগেই নেপচুন গ্রহের গতিচ্ছন্দে হেরফের লক্ষ্য করে 'প্লুটো'র অস্তিত্বকে মেনে নেওয়ার মতো। অথবা প্লুটোর চেয়েও দূরবস্থিত 'এক্স'-গ্রহকে স্বীকার করে নেওয়া। সেই অজানা-অনামা মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হচ্ছে বাস্তব কিছু সমকালীন পণ্ডিতাদের উপস্থিতিতে। না হলে কেমন করে ষোড়শ শতাব্দীর পাটবাড়ি-মৈমনসিংহে কবি চন্দ্রাবতী রচনা করেন : *মৈমনসিংহ-গীতিকা*? কেমন করে হটী বিদ্যালঙ্কার (1743?-1810) কাশীর পুরুষপণ্ডিতদের পরাজিত করেন? কেমন করে হটু বিদ্যালঙ্কার (1775-1875) স্বগ্রামে নরনারী নির্বিশেষে আর্তরোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে সক্ষম হন? এঁরা কেউ তো কৃষ্ণচন্দ্র-বর্ধমানরাজ-রানী ভবানীর দানধন্য নন!

সুতরাং রূপমঞ্জরীর পিতার, রূপেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা — অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা — অবাস্তব 'লেখককল্পনা' নয়। যদিও স্বীকার্য, আমরা তার প্রামাণ্য দক্ষিল প্রমাণ দাখিল করতে অক্ষম।

pathagar.net

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে লিখেছিলেন :

"বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।"

গঙ্গাতীরে সেই ত্রিবেণীতেই আমাদের কাহিনীর কালে বাস করতেন রূপেন্দ্রনাথের শিক্ষাগুরু ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, যাঁর পাণ্ডিত্য-মূল্যায়নে রামমোহন লিখেছেন,

"Jagannath was universally acknowledged to be the first literary of his day and his authority has as much weight as that of Raghunandana."

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা এবং শ্রুতিধরপ্রতিম স্মৃতিশক্তির বিষয়ে নানান কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। সংসদ 'বাঙালী চরিতাভিধানে' তাঁর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — "দীর্ঘজীবী এই পণ্ডিত একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রায় নিষ্প্রভ করে তোলেন।"

দীর্ঘজীবী — সন্দেহ নাই। — একশ তের বছর! শতাধিক বর্ষ বয়সের পণ্ডিত তবু দুই একটি দেখেছি; কিন্তু 'চেমবার্স বায়োগ্রাফিক্যাল ডিক্সনারী' ঘেঁটে আমি তো জগন্নাথ ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন প্রতিভার সন্ধান সারা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে পাইনি যাঁর পদপ্রান্তে একটা গোটা শতাব্দী বুড়িয়ে বুড়িয়ে ফুরিয়ে গিয়ে শেষ-প্রণাম জানিয়ে বাধ্য হয়ে বিদায় নিয়েছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্ম 1694 খৃষ্টাব্দে — সপ্তদশ শতাব্দীতে; প্রয়াণ 1807 খৃষ্টাব্দে—উনবিংশ শতাব্দীতে। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ইহলোকে তাঁর অনুজ — পরলোকে : 'সেথা তুমি অগ্রজ আমার!'

এই পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শিষ্য ছিলেন আমাদের কাহিনীর নায়ক, রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরে মহারানীর কাছে ব্যর্থ হয়ে রূপেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন ত্রিবেণীতে – গুরুদেবের আশ্রমে।

জগন্নাথ একই সঙ্গে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েছেন। তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি —যা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছিলেন — সুবল মিত্র মশায়ের অভিধানের হিসাবে

দেখছি, তা একটি পিতলের গাড়ু, একটি 'অমৃতি' জলপাত্র, অনধিক দশবিঘা নিষ্কর ভূমি এবং একটি একচালা পর্ণকুটীর। নিজের মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান : অন্যূন এক লক্ষ টাকা নগদ, বার্ষিক চারিসহস্র তঙ্কা লাভের নিষ্কর ভূমি, তিন পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং তস্যপুত্রদের।

আমাদের কাহিনীর কালে — যখন রূপেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, —পলাশীর যুদ্ধের নয় বৎসর পূর্বে – সেই 1748 খৃষ্টাব্দে, তখন তর্কপঞ্চাননের বয়স চুয়ান্ন। তখনই তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রের প্রচণ্ড ভিড়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীর টানা বারান্দায় কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি পঠন-পাঠনের আয়োজন। গৃহাভ্যন্তরে ন্যায়, নব্যন্যায়, দর্শন, বিশেষ করে বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা। পণ্ডিত মশাই এসব শ্রেণীতে পড়ান না। তাঁর একটি পৃথক গবেষণা-গৃহ আছে। উন্নত শ্রেণীর ছাত্ররা পর্যায়ক্রমে সেখানে আসে। কোনও অনুপপত্তি থাকলে তার মীমাংসা জেনে যায়। সচরাচর টোল ও চতুষ্পাঠীর শিক্ষকেরা সেখানে পাঠ নিতে আসেন। অবসর সময়ে পণ্ডিতমশাই অধ্যয়ন করেন, অথবা রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি — '*বিবাদভঙ্গার্ণব*' গ্রন্থ রচনা আরও চল্লিশ বছর পরের ঘটনা। বস্তুত ইংরেজ কোম্পানি বাঙলার দেওয়ানি লাভ করার পর এ দেশীয় বিচার পদ্ধতি ও আইন প্রস্তুতির জন্য জগন্নাথ পণ্ডিতের দ্বারস্থ হয়। স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে তর্কপঞ্চানন ঐ গ্রন্থটি রচনা করেন 1788 থেকে 1792 খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এজন্য তিনি মাসিক সাতশত তঙ্কা বেতন পেতেন।

রূপেন্দ্রনাথ সুযোগমতো গুরুদেবকে তাঁর সমস্যার কথা জানালেন। রূপেন্দ্রনাথের স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদ তর্কপঞ্চানন পেয়েছিলেন, কিন্তু সে যে একটি কন্যাসন্তান রেখে গেছে তা জানতেন না। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন, তা বাবা রূপেন্দ্রনাথ, ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় তো অন্যায় কিছু বলছেন না। তুমি যদি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না কর, তাহলে তোমার কন্যাকে সোঞাই নিয়ে যেতেই বা চাইছ কেন? একহাতে কী করে শিশুপালন করবে?

কৃষ্ণনগরে রানীমাকে যে যুক্তি শুনিয়েছিলেন এখানেও সেই একই কথা অনর্গল বলে গেলেন। দুর্ভাগ্য রূপেন্দ্রনাথের ; দেখা গেল পুরীর শঙ্করাচার্য, নদীয়ারাজ মহিষী এবং পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একই মতের পোষক।

দেশে এখন মুসলমান শাসন। শাসক সম্প্রদায় — কী হিন্দু, কী মুসলমান — কী অঙ্গে, বঙ্গে অথবা কলিঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। ইসলামের কী নির্দেশ জানা নেই, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ঘরানা ঘরের মুসলমান মহিলা গৃহাবরোধের বাহিরে আসেন না। নিতান্ত বাধ্য হলে বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে পথে নামেন।

হিন্দুস্থানে, প্রাক-মুসলমান যুগে, নারীসমাজের এতটা বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারা অনায়াসে অনবগুণ্ঠিতা অবস্থায় পথে ঘাটে যাতায়াত করত। অজন্তাগুহার কোনও প্রাচীর চিত্রে অবগুণ্ঠিতা নারী চিত্রায়িতা হয়নি। অজন্তা ষোড়শ গুহাবিহারে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের

পাঠশালায় একটি বালিকার চিত্র আজও দেখতে পাওয়া যায়। নারীর বিদ্যাভ্যাসে কোনও বাধানিষেধ ছিল না। প্রাচীরচিত্রটি প্রাক–মুসলমান যুগে, অষ্টম শতাব্দীতে অঙ্কিত।

কিন্তু ভারতের শাসনভার যখন ক্রমে ক্রমে বহিরাগত মুসলমান আগন্তুকদের কব্জায় চলে গেল তখন হিন্দুনারীরা হারালো তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা। পথে-ঘাটে অনবগুণ্ঠিত পরিভ্রমণ হয়ে উঠল অত্যন্ত বিপদজনক। আরব-পারস্য থেকে পুরুষ মুসলমানেরাই এসেছে দলে দলে, নারীরা নয়। ফলে হিন্দুনারী অপহরণের মাত্রা অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাধ্য হয়ে হিন্দুনারীদেরও গৃহাবরোধের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার আয়োজন হল। অনবগুণ্ঠ নিরঙ্কুশ মুক্তি এবং বোরখায় সর্বাঙ্গবরের বন্ধনদশার মাঝামাঝি ব্যবস্থা হল : অবগুণ্ঠন! মাপে তা ছোট-বড় করা যায় প্রয়োজন অনুসারে। বয়ঃকনিষ্ঠ ঠাকুরপোর সম্মুখে যা 'আধো-ঘোমটা', ঠাকুর বা ভাশুরের সামনে তাই 'আবক্ষ।'

মৈত্রেয়ী, গার্গী, বিশ্ববারা, মদালসার উত্তরসূরীরা সামাজিক বিবর্তনে ডাইনোসর-ডোডোদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠলেন। মনুসংহিতায় প্রক্ষিপ্ত হল কালোপযোগী নববিধান : 'অষ্টম বর্ষে তু ভবেৎ গৌরী;' 'পথি নারী বিবর্জিতা' এবং

'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।'

এই যুক্তিগুলিই শুনিয়ে গেলেন তর্কপঞ্চানন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে।

রূপেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করলেন না, তর্ক করলেন না, নীরবে নতমস্তকে শুধু শুনে গেলেন। সেটাই ছিল সে-কালের শিষ্টাচার। অগাধবিদ্য হওয়া সত্ত্বেও, অসীম প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর গুরু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সেই অনবদ্য বিনাসুতোয় গাঁথা 'ভারত-সংস্কৃতি মালার' একটি রত্নখণ্ড হতে পারবেন না কোনদিন — রূপেন্দ্রনাথের যে মালিকায় গাঁথা আছেন: বাল্মীকি — বশিষ্ঠ — বেদব্যাস — যাজ্ঞবল্ক্য —ঋষি গৌতম — বুদ্ধ গৌতম — অশোক — শঙ্করাচার্য — নানক — শ্রীচৈতন্য!

গুরুদেব প্রশ্ন করলেন, কী করবে অতঃপর? কী মনস্থ করেছ?

—এখনই তা স্থির করে উঠতে পারছি না।

—আমার কথা শোন : পুনরায় দারপরিগ্রহ কর। ভবতারণের কন্যাটিকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে আমাকে বল, আমি তোমার মনোমত একটি সৎবংশের সর্বাঙ্গসুন্দরী কুলীনকন্যার ব্যবস্থা করে দিই।

রূপেন্দ্র যুক্তকরে বলেন, এমন আদেশ করবেন না, গুরুদেব।

—না, না, আদেশ নয়, পরামর্শ।

—গুরুদেবের পরামর্শ মানেই আদেশ। আমি পুনরায় বিবাহ করব না, এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়েছি।

pathagar.net

—তাহলে এক কাজ কর। আমার বিদ্যানিকেতনে নিজেকে যুক্ত করে দাও। ত্রিবেণীতে নয়, উখুড়া পরগণায়। সেখানে নদীয়ারাজ আমাকে সাতশত বিঘা আউশ ধানের জমি দান করেছেন। তার ভিতর কিছু বন্ধ্যা ঊষর ডাঙা জমি আছে। তুমি সেখানে একটি গৃহনির্মাণ কর। সেখানে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের আয়োজন কর। চতুর্বেদের আলোচনা ত্রিবেণীতে আমিই করছি — তুমি পঞ্চমবেদ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ কর। যাবতীয় ব্যয়ভার আমার। তোমাকে উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা প্রদানের ব্যবস্থাও থাকবে।

এবারও অস্বীকৃত হলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, বাবামশাই আমাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে যখন পাঠিয়েছিলেন তখনই বলেছিলেন, সোঞাই গ্রামের ত্রিসীমানায় কোনও কবিরাজ নাই। তুমি স্বগ্রামে আর্তের সেবা করবে। এ জন্য নদীয়ারাজের প্রস্তাব পর্যন্ত আমি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় কথা : আমি যেখানেই বসবাস করি না কেন, সেখানে একটি পাঠশালা খুলব, ক্রমে চতুষ্পাঠী। তাতে শুধু বালিকা এবং কিশোরীরাই সারস্বত সাধনায় ব্রতী হবে। সে কাজ উখুড়ায় হবে না। নদীয়ারাজ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধে। আপনিও তো দেখছি তাই।

জগন্নাথ বাধ্য হয়ে রূপেন্দ্রকে বিদায় জানাতে স্বীকৃত হলেন। ভাল একটি অধ্যাপক হাতছাড়া হয়ে গেল। উপায় কী? লোকটা পণ্ডিত, কিন্তু ঐ : একবগ্গা!

বললেন, ঠিক আছে রূপেন্দ্রনাথ, তুমি যদি নিতান্তই সোঞাই গাঁয়ে ফিরে যেতে চাও আমি বাধা দেব না। তবে যাবার আগে আমার একটি আত্মীয়কে একবার দেখে যাও। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা তো দূরের কথা — রোগটা কী তাও নির্ণীত হয়নি। বড়ই দুর্ভাগা সে।

—রোগীটি কে? আর রোগের উপসর্গ কী?

—রোগী আমার ভাগিনেয়। আর রোগ — আমরা এ পর্যন্ত যা অনুমান করেছি তা বিচিত্র! সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে থাকে দু-তিন মাস অথবা বছরের পর বছর, তারপর হঠাৎ তার জ্ঞান ফিরে আসে, পাঁচ-সাত দিনের জন্য। তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। কেন যে উন্মাদ হয়ে যায়, আবার কেনই বা তার জ্ঞান ফিরে আসে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না।

—তাঁর বয়স কত? কতদিন ধরে এ রোগের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? তাঁর সম্বন্ধে আর কী কী তথ্য জানাতে পারেন?

—বলছি বাবা। শোন বিস্তারিত।

pathagar.net

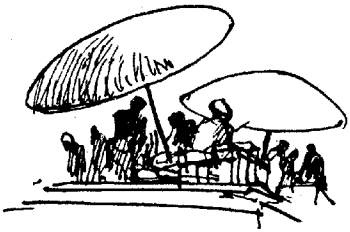

রোগীর নাম ঘনশ্যাম সার্বভৌম। আমাদের কাহিনীর কালে তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। ঘনশ্যাম ছিলেন অলোকসামান্য ক্ষণজন্মা এক মহাপণ্ডিত। বিশ্বাস করা কঠিন যে, তিনি সে-কালীন গৌড়মণ্ডলের সর্ববিখ্যাত মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে প্রতিটি বিষয়ে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন — বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা এবং, হ্যাঁ, স্মরণশক্তিতেও!

এখানে ঔপন্যাসিক হিসাবে কিছু কৈফিয়ৎ অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে 'ঘনশ্যাম সার্বভৌম' একজন ঐতিহাসিক বাস্তব চরিত্র। তিনি ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই অলোকসামান্য পৌত্রটির প্রসঙ্গে স্বয়ং জগন্নাথ লিখে গেছেন, "বাগ্‌দেবীর কৃপায় আমি তাঁহার প্রসাদ কিছু কিছু লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু পৌত্র ঘনশ্যাম যে প্রসাদ লাভ করিয়াছে তাহা আমার সৌভাগ্যকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনকালেই সে ঘোর উন্মাদ হইয়া যায়" ('*সংবাদপত্রে সেকালের কথা*' অনুসারে)।

অথচ '*সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*' অনুসারে, "প্রথম সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে প্রধান পণ্ডিতের পদগ্রহণে আহ্বান করা হয়। তিনি অস্বীকৃত হলে পৌত্র ঘনশ্যাম এই পদে নিযুক্ত হন।"

মনে হয়, কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে। "যৌবনকালেই ঘোর উন্মাদ" হয়ে গেলে জগন্নাথের শেষ জীবনে ঘনশ্যাম সুপ্রীম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত হতে পারেন না।

তবে এসব গবেষণা ঐতিহাসিকদের জন্য মুলতুবি থাকুক। আমরা সাহিত্যরসের কারবারী। ইতিহাসের কাছ থেকে একটি ব্যর্থ ক্ষণজন্মার নামটুকু গ্রহণ করেছি মাত্র। আমাদের কল্পনায় এই ঘনশ্যাম পৃথক চরিত্র। তিনিও অসাধারণ পণ্ডিত, যৌবনেই ঘোর উন্মাদ হয়ে যান। কিন্তু তিনি মহাপণ্ডিত জগন্নাথের পৌত্র নন, ভাগ্নিনেয়।

ঔপন্যাসিক-কল্পিত ঘনশ্যামের পিতা অর্থাৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভগিনীপতি গঙ্গাপ্রসাদ তর্কতীর্থের ঐ একটিই বৃদ্ধবয়সের সন্তান। আঠার বৎসর বয়সে পুত্রের পুনরায় মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখে জগন্নাথের পরামর্শেই তিনি তড়িঘড়ি পুত্রের বিবাহ দিলেন। পাত্রী ধনীর দুলালী, কুলীন এবং জগন্নাথের পৃষ্ঠপোষক যজমান। একটি বংশধরের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল গঙ্গাপ্রসাদের। দত্তকপুত্র গ্রহণে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। দানপত্রে দত্তকপুত্রের ব্যবস্থা নেই!

হেতুটি বিচিত্র, জটিল এবং মর্মান্তিক।

গঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী এক বিশাল দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত। সাতপুরুষ ধরে ওঁরা এই সম্পত্তি ভোগ করে আসছেন দেবতার অছি হিসাবে। বংশের আদিপুরুষ, প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে, ছিলেন নিতান্ত গরিব, জমিদারের গৃহদেবতার নিত্যপূজার পুরোহিত। কিন্তু তাঁর ছিল একটি রূপসী লক্ষ্মীপ্রতিমাপ্রতিম সুন্দরী কন্যারত্ন : সতী।

তদানীন্তন জমিদার মশাই পুরোহিত-কন্যার রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিনা পণে পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! রাজসুখ সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটির ভাগ্যে লেখা নেই। সর্পাঘাতে জমিদার পুত্রের মৃত্যু হল। সদ্যবিবাহিতা, স্বনামধন্যা সতী, সহমরণে গেল। বধূমাতার স্মরণে জমিদার শর্তসাপেক্ষে একটি ঁসতীমায়ের মন্দির ও একটি তালুক চক্রবর্তী পরিবারকে দান করেন যান। গোটা তালুকের আদায় থেকে রাজসরকারের খাজনা দিয়েও প্রচুর উদবৃত্ত থেকে যায়। শর্তটি অকিঞ্চিৎকর। আদি ঁসতীমায়ের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রতিটি পুরুষে বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রের দেহান্তে তাঁর সহধর্মিণীর ভিতর অন্তত একজনকে সহমরণে যেতে হবে। চক্রবর্তী পরিবার প্রায় ছোটখাটো একটি জমিদারই।

ঘনশ্যামের পিতামহী বংশের শেষ সতী। গঙ্গাপ্রসাদের দেহান্ত হলে তাঁর দুই সহধর্মিণীর মধ্যে যে কোন একজন সহমরণে যাবেন। কিন্তু তার পরের পুরুষে? ঘনশ্যাম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হলে চক্রবর্তী পরিবার সেবায়েতের অধিকার হারাবে। সম্পত্তি জমিদারে খাস হয়ে যাবে। জমিদার নূতন সেবায়েত নিয়োগ করবেন।

মাত্র সতের বৎসর বয়সেই ঘনশ্যাম 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেছে বাণেশ্বর বিদ্যাবিনোদের চতুষ্পাঠী থেকে। সে দিবারাত্র পুঁথি মুখে নিয়ে পড়ে থাকে। পাগলের মতো কীসব সাধন-ভজনও করে। পিতা চতুর্দশবর্ষীয়া যে মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন ঘনশ্যাম তার প্রতি কৌতূহলী হল না আদৌ। বাস্তবে সে তখন উন্মাদ; বছর-কয়েক অপেক্ষা করে পৌত্রের আগমন সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে ঁপুরুষোত্তমধামে চলে যান। পুত্রবধূর সন্তান কামনায় সাড়ম্বরে পুরশ্চরণাদি দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর উপর প্রত্যাদেশ হয়, "তোমার পুত্রবধূর গর্ভে এক অমূল্যরত্ন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার নাম রাখিও বলভদ্র।"

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ক্ষেত্রেও। প্রভেদ এই যে, জগন্নাথের পিতা রূদ্রদেব তর্কবাগীশের বয়স তখন ছিল ছয়ষট্টি বৎসর আর ঘনশ্যাম মাত্র বাইশ বৎসরের যুবক।

গঙ্গাপ্রসাদের স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাসের ভিতরেই তাঁর পুত্রবধূর গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ দেখা গেল। কালে তিনি নাতির মুখ দেখলেন। বলাবাহুল্য তার নাম রাখা হল : বলভদ্র চক্রবর্তী।

ঘনশ্যামের মস্তিষ্কবিকৃতির অবশ্য কোনও উন্নতি হল না। ক্রমে ক্রমে তিনি ঘোর উন্মাদ হয়ে গেলেন। শুধু কী-এক বিচিত্র কারণে বছরের মধ্যে দু-চারবার তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান।

সচরাচর পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তারপর পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উদিত হলেই পূর্ণচন্দ্রদর্শনে ঘনশ্যামের চিন্তার পারম্পর্য হারিয়ে যায়। আহারে রুচি থাকে না, পরিধানে থাকে না বস্ত্রখণ্ড। বাক্যালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ। পদ্মাসনে বসে থাকেন প্রহরের পর প্রহর। আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকেন। ইদানীং বছরে নয় মাস!

আজ বিশ বছর হল ঘনশ্যাম চিকিৎসার বাহিরে।

ইতিমধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ স্বর্গলাভ করেছেন। সহমরণে গেছেন ঘনশ্যামের বিমাতা। আইনত ঘনশ্যামই এখন সেবায়েত। তাঁর আমমোক্তারনামা নিয়ে বাস্তবে ঘনশ্যামের যুবকপুত্র বলভদ্রই এখন সতীমা-তালুকের আদায়পত্র দেখে, বস্তুত তালুকদারী করে।

রোগীর যাবতীয় পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হয়ে রূপেন্দ্র এবং তাঁর গুরু এসে উপস্থিত হলেন সতীমা-তালুকের 'মায়ের বাড়ি' গাঁয়ে। এখানকার তালুকদার-বাড়িই হচ্ছে চক্রবর্তীবাড়ি। জগন্নাথের বোনাইবাড়ি। ভগিনীপতি গঙ্গাপ্রসাদ গত হয়েছেন, ভগিনীও গেছেন সহমরণে ; কিন্তু ঘনশ্যামের প্রতি জগন্নাথের একটা দুর্বলতা বরাবরই আছে। আহা! কী প্রতিভার কী পরিণাম!

সে দিন সকালে জগন্নাথ এলেন পালকিতে, রূপেন্দ্র অশ্বারোহণে। সংবাদ দেওয়াই ছিল। বলভদ্র আদর-আপ্যায়ন করে ওঁদের নিয়ে গিয়ে বসালো বৈঠকখানায়। প্রণাম করল দুজনকেই।

জগন্নাথ বলভদ্রকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলভদ্রের পিতা সার্বভৌম, পিতামহ তর্কতীর্থ অথচ বলভদ্র পাঠশালার চৌকাঠ ডিঙাতে পারল না। বংশের কুলাঙ্গার! বলভদ্র সে-কথা জানে; তর্কপঞ্চাননকে শ্রদ্ধা না করলেও সে ভয় করে যথেষ্ট। উপরমহলে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি। কোতোয়াল তাঁর ইচ্ছামাত্র যেকোন মানুষের হাতে মাথা কাটে!

দ্বিতলের একটি কক্ষে বলভদ্র নিয়ে এল ওঁদের দুজনকে। শয়নকক্ষটি বাহির থেকে অর্গলবদ্ধ ছিল। অর্গল মোচন করে ওঁরা তিনজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। কক্ষটি বৃহৎ। ঘরের একপ্রান্তে বড় পালঙ্ক। কিন্তু গৃহের একমাত্র বাসিন্দা বসে আছেন পদ্মাসনে ভূশয্যায়। সম্পূর্ণ নগ্ন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। একমুখ দাড়ি-গোঁফ। রুদ্ধদ্বারের অর্গলমোচন হল, ঘরে তিনজন আগন্তুক প্রবেশ করলেন, কিন্তু কক্ষের একমাত্র বাসিন্দার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তর্কপঞ্চানন বললেন, কী? কেমন আছ ঘনশ্যাম?

উন্মাদ নির্বাক। নিস্পন্দ। জগন্নাথ তাঁর দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই বাধা দিল বলভদ্র। বলল, বাবামশাই মাঝে মাঝে একেবারে ক্ষেপে ওঠেন। আক্রমণ করে বসেন। ওঁর কাছে যাবেন না। দূর থেকে যা হয় করুন।

জগন্নাথ জানতে চাইলেন, সকাল-সন্ধ্যা ওকে আহার্য-পানীয় দিয়ে যায় কে? শৌচাগারে নিয়ে যায়, স্নান করিয়ে দেয় — কে?

—ছোট-মা। একমাত্র তাঁকেই উনি সহ্য করেন। আমাকে অথবা বড়মাকে একেবারেই সহ্য করেন না। ঝি-চাকর কেউ কাছে যেতে সাহস পায় না।

রূপেন্দ্র বলে ওঠেন, সে-ক্ষেত্রে তোমার ছোটমাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আর তুমি

pathagar.net

ঘরের বাইরে যাও। ওঁর মেজাজটা খারাপ করতে চাই না।

বলভদ্র এককথায় মেনে নিল। তার প্রস্থানের একটু পরেই একটি যুবতী আবক্ষ-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে দ্বারের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। জগন্নাথ তাঁকে বললেন, ভিতরে এস ছোট বৌমা। ইনি আমার একজন প্রিয় ছাত্র। বর্তমান গৌড়মণ্ডলের বিশ্রুতকীর্তি শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। ওকে আমি নিয়ে এসেছি ঘনশ্যামের চিকিৎসার জন্য। ও যা যা জানতে চাইবে অকুণ্ঠচিত্তে জানাবে...

রূপেন্দ্র বললেন, গুরুদেব! আপনি সম্পর্কে ওঁর মামাশ্বশুর। ওঁদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে আমি হয়তো এমন প্রশ্ন...

বাক্যটা শেষ হল না। জগন্নাথ বললেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমিও না হয় বাইরে যাই।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন তাই যান। বলভদ্রকে আগলে রাখবেন। দেখবেন, এ-ঘরে কোনমতেই কেউ যেন না আড়ি পাতে।

জগন্নাথ প্রখর বুদ্ধিমান। গ্রীবাসঞ্চালনে সম্মতি জানিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রূপেন্দ্র ভিতর থেকে কবাটটি অর্গলবদ্ধ করে যুবতীর দিকে ফিরে বললেন, মা! আমি চিকিৎসক। আপনার স্বামী মানসিক রোগী। আমার কাছে লজ্জা করলে তো চলবে না, মা! আপনি অবগুণ্ঠন অপসারিত করুন।

মেয়েটি লজ্জা পেল না। অকুণ্ঠচিত্তে মাথার ঘোমটা কিছুটা সরিয়ে রূপেন্দ্রর চোখে-চোখে তাকালো। এগিয়ে এসে রূপেন্দ্রর পদধূলি নিল। অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে স্বামীর পদপ্রান্তেও নামিয়ে রাখল অস্পর্শিত একটি প্রণাম। ঘনশ্যাম নির্বিকার। পদ্মাসনে বসে আছেন। চোখ দুটি কিন্তু খোলা। সে-চোখে পাগলের ঘোলাটে দৃষ্টি।

রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখলেন, মেয়েটির বয়স উনিশ-কুড়ি। শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী। পল্লীবাঙলার একটি শ্যামশ্রী যেন তার কানায়-কানায় ভরা তনুদেহকে ঘিরে আছে। ওর অঙ্গে আভরণ অল্প, পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ। বাঙলামায়ের প্রতিমূর্তি।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, উনি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন না?

অজান্তেই 'তুমি' সম্বোধন। ওঁর কেন যেন মনে হল ছোট বোন কাত্যায়নীর সঙ্গে কথা বলছেন, অথবা মৃন্ময়ী, কিংবা মঞ্জরীই।

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানালো : না।

—দুর্ব্যবহার তো করেন না, কিন্তু আদর-সোহাগ? নির্জন ঘরে?

নিরতিশয় লজ্জায় এবার নতনেত্র হল। জবাব দিল না।

রূপেন্দ্র বললেন, তুমি যদি আমাকে সব কথা খোলাখুলি না বল, মা, তাহলে আমি ঐ মানসিক রোগীর চিকিৎসা কেমন করে করব বল? ও পাগল তো নিজে থেকে কোন কথা বলবে না। এইমাত্র শুনলাম একমাত্র তোমাকেই সে বরদাস্ত করে, তোমার কথা শোনে। ফলে, তোমাদের দাম্পত্য জীবনের সব কথা, হ্যাঁ স—ব কথা আমাকে জানাতে হবে। আমি চিকিৎসক, ধন্বন্তরির কাছে আমার প্রতিজ্ঞা করা আছে যে, রোগীর গোপন কথা আমি গোপন

pathagar.net

রাখব। আমার কাছে লজ্জা করতে নেই, মা। বল, কত দিন হল বিবাহ হয়েছে তোমাদের?

—গত ফাল্গুনে। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়ায়।

—তার মানে তের মাস। দীর্ঘ সময়! বিবাহের সময় উনি সুস্থ ছিলেন?

নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করে মেয়েটি।

রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, তাহলে বিবাহের মন্ত্র উনি উচ্চারণ করলেন কেমন করে?

—করেননি তো!

—তাহলে বিবাহটা সিদ্ধ হয় কী করে? কুশণ্ডিকার প্রতিজ্ঞা, মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে তো বিবাহ সিদ্ধ বলে গ্রাহ্য হবে না!

মেয়েটি এতক্ষণ নতনেত্রে জবাব দিয়ে যাচ্ছিল, এবার হঠাৎ রূপেন্দ্রের চোখে-চোখ তাকিয়ে বললে, ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত বিধান দিলে সেই অশাস্ত্রীয় বিবাহও সিদ্ধ! অস্বীকার করবার হিম্মৎ কার আছে বলুন?

অবাক হলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, তার মানে ঐ পাগলটাকে তুমি অন্তর থেকে নিজের স্বামী বলে মান না, যেহেতু তোমাদের বিবাহটাই অসিদ্ধ। তবে যেহেতু ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত নিদান হেঁকেছেন তাই...

মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল, আপনি আমার কথা কিছুই বুঝতে পারেননি। আমি মোটেই তা বলতে চাইনি। ওঁকে আমি স্বামী বলেই মানি। আমার পতিদেবতা বলেই মনে-প্রাণে স্বীকার করি। উনি পাগল কি স্বাভাবিক, উনি কুশণ্ডিকায় কোন্ কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না! আমি নিজের বিবেকের নির্দেশে চলি।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, তোমার কথায় আমি ক্রমেই মুগ্ধ হয়ে উঠছি, মা! তুমি বস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। প্রথমে বল, তোমার নামটি কী?

—মালতী।

—বাঃ সুন্দর নাম। তুমি বললে, বিয়ের সময় তোমার স্বামীর মানসিক সুস্থতা ছিল না। তবে তিনি স্বাভাবিক হলেন কত দিন পরে?

মালতী নতনেত্রে বললে, ঐ ফাল্গুনের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে।

—বাঃ! তিথিটাও তোমার মনে আছে?

একটু চিন্তা করে পুনরায় বললেন, ও! বুঝেছি। তার হেতুটি কি এই যে, সেটা ছিল তোমাদের ফুলশয্যার রাত? তৃতীয়া থেকে ষষ্ঠী — তিনটি তিথি?

মালতী আঁচল দিয়ে মুখটা ঢাকল। গ্রীবা সঞ্চালনে স্বীকার করল কিন্তু। রূপেন্দ্রনাথ অম্লানবদনে পরস্ত্রীর মণিবন্ধটি ধরলেন। মালতী শিউরে উঠল। রূপেন্দ্র জোর করে ওর মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা' বলে ডেকেছি তোমাকে। আমাকে সবকথা বলতে হবে, মালতী! বল, কতদিন তিনি সেবার সুস্থমস্তিষ্ক ছিলেন?

মালতী বললে, পূর্ণিমা পর্যন্ত।

—তার মানে পঁচিশ দিন। সে তো দীর্ঘ সময়। তার মধ্যে তোমাদের ভাবসাব হয়নি? উনি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে কি মেনে নিয়েছিলেন এই পঁচিশদিনের ভিতর?

মালতী সঙ্কোচ করল না। বলল, জ্ঞান ফিরে আসার পর একবার মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কে? এখানে কেন?' তারপরেই ফুলে-ছাওয়া বিছানাটা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন 'ও! তোমার সঙ্গে আমার বুঝি বিয়ে হয়েছে? তোমার বুঝি আজ ফুলশয্যা?' —এই পর্যন্ত বলে মালতী থামল।

রূপেন্দ্র বলেন, তারপর?

—কী তারপর? আপনি কি সব কিছুই শুনতে চান? তা কি বলা যায়?

রূপেন্দ্র বললেন, না, বলা যায় না। আমি জানি—বুঝিয়ে তা বলা যায় না! সব কথা বলা যায় না। কিন্তু রোগনির্ণয়ের জন্য যেটুকু আমার জেনে নেওয়া দরকার সেটুকু যে আমাকে জানতেই হবে, মালতী।

মালতী অসহায়ের মতো তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখে। পদ্মাসনে নির্বাক বসে আছে পাগলটা। এঁদের কথোপকথন হয়তো ওর শ্রুতিতে প্রবেশ করছে, মস্তিষ্কে কোনও অনুরণন জাগাচ্ছে না। রূপেন্দ্র বলেন, তোমাকে বউ বলে চিনতে পারার পরে, ওটা তোমাদের ফুলশয্যা এ কথা বুঝতে পারার পরেও তোমাকে আদর-সোহাগ করেননি? চুমু-টুমু খাননি?

দুরন্ত লজ্জায় মেয়েটি আবার দু-হাতে মুখ ঢাকে। রূপেন্দ্র সহজ হবার জন্য বলেন, তোকে দেখতে ঠিক আমার ছোট বোন কাত্যায়নীর মতো। আমি কিন্তু কাতুর কাছে স্বীকার করেছিলাম যে, ফুলশয্যার রাত্রেই আমি...

মালতী মুখ থেকে কাঁকন-পরা হাত দুটি সরালো। কৌতূহলী দু-চোখ অন্যদিকে মেলে অপেক্ষা করল অসমাপ্ত বাক্যের শেষাংশ শোনার জন্য। রূপেন্দ্র নীরব আছেন দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার চোখে-চোখে তাকালো। বলল, কী? কী-কথা?

—ঐ যেকথা জিজ্ঞেস করছিলাম। চুমু খাওয়ার কথা।

আবার ওর মুখটা নেমে পড়ল বুকের উপত্যকায়।

রূপেন্দ্র এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, তোমার বিয়েতে বোধহয় বরপণ লাগেনি। না?

আবার চোখে-চোখে তাকালো। বলল, বরপণ! কী বলছেন আপনি! বলভদ্র আমার মামাকে পাঁচ শ সিক্কা তঙ্কা কন্যাপণ দিয়েছে! তাছাড়া পঞ্চাশ বিঘে ধানীজমি।

—কেন? মামাকে কেন? তোমার বাবা...

—না! কেউ নেই আমার! বাবা-মা-ভাই-বোন — নিজের বলতে কেউ নেই! মামার সংসারে মানুষ হচ্ছিলাম। মামার তিন-তিনটে আইবুড়ো মেয়ে। মামারা কুলীন। অনেক টাকা লাগবে। তাই তো আমি...

—কী? জেনে-বুঝে পাগলকে বিয়ে করলে?

মৌনতা যদি সম্মতির লক্ষণ হয় তবে বলতে হবে মালতী অভিযোগটা স্বীকার করে নিল। রূপেন্দ্র তখন প্রশ্ন করেন, পাগলকে বিয়ে করছ, শুধু এটুকুই কি জানতে? নাকি...

—নাকি?

pathagar.net

—বিয়ের আগে তুমি জানতে অত টাকা খরচ করে বলভদ্র কেন তার বাপের বিয়ে দিয়ে আনল?

রূপেন্দ্রের চোখে-চোখ রেখে মালতী বলল, জানি। জানতাম। ওর নিজের মাকে চিতার আগুন থেকে বাঁচাতে! না হলে সেবায়েতি হাতছাড়া হয়ে যাবে।

রূপেন্দ্র বিনাদ্বিধায় ওর শাঁখা-পরা হাতটা চেপে ধরে বললেন, তাও যদি জান মালতী, তাহলে কেন আমাকে সাহায্য করবে না? ঐ বলভদ্র আর তার মায়ের পৈশাচিক চক্রান্ত ব্যর্থ করতে? বল? সব কথা খুলে বল আমাকে। ঘনশ্যাম যখন স্বাভাবিক থাকেন তখন কি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন? তোমাকে নিয়ে বিছানায় শোন? তোমার নারীজন্ম সার্থক করতে...

মালতী হঠাৎ ঝরঝর্ করে কেঁদে ফেলে। রূপেন্দ্র সলজ্জে ওর হাত ছেড়ে দেন। মালতী ও-পাশ ফিরে তার স্বামীর দিকে চকিতে দৃকপাত করে। রূপেন্দ্রনাথ তিলমাত্র নড়াচড়া করেন না। কারণ তিনি প্রথম থেকেই এমন একটি স্থানে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন যেখানে দাঁড়িয়ে গ্রীবা সঞ্চালন না করেও প্রাচীরে প্রলম্বিত একটি দর্পণে রোগীকে দেখা যায়। না ঘনশ্যাম, না মালতী, কেউই জানে না — রূপেন্দ্র এতক্ষণ প্রশ্ন করছিলেন মালতীকে কিন্তু লক্ষ্য করে চলেছেন সে প্রশ্নের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তার পিছন দিকে উপবিষ্ট ঐ পাগলটার মুখে —দর্পণ প্রতিবিম্বে। এবারও দেখলেন ঘনশ্যাম না-য়ের ভঙ্গিতে গ্রীবা-সঞ্চালন করলেন। রূপেন্দ্র স্থিরসিদ্ধান্তে এলেন। বললেন, ঠিক আছে, মালতী, তুমি এবার যাও। কিন্তু তুমিও দেখ, কেউ যেন আড়ি না পাতে। তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য।

মালতী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শয়নকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। রূপেন্দ্র কবাটটি অর্গলবদ্ধ করে ঘনশ্যামের মুখোমুখি হলেন। ঘনশ্যাম নির্বিকার। রূপেন্দ্র উপবীতটিকে ব্যতিক্রম করে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হলেন। উদাম পাগলের অনুকরণে উদাম উলঙ্গ!

ঘনশ্যাম বসেছিলেন পদ্মাসনে। উনি বসলেন বদ্ধ-পদ্মাসনে। এক বদ্ধ পাগলের মুখোমুখি আর এক বদ্ধ পাগল!

pathagar.net

আমরা মনে ভাবি : পাগলে যা খুশি তাই করতে পারে। তা কিন্তু পারে না সে। সঙ্গত কারণে সে হাসতে পারে না, নিদারুণ দুঃখজনক ঘটনায় বেচারি কাঁদতেও পারে না। বিস্ময়কর ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখলে অবাক হবার অধিকার তার নেই। ঘনশ্যাম যেন পাগল, রূপেন্দ্র তো তা নন। তিনি যখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ওঁর সামনে বসলেন পদ্মাসনের উপর টেক্কা দিয়ে বদ্ধপদ্মাসনে, তখন ঘনশ্যাম বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রও হতে পারলেন না। সামান্য নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন, কস্তুম্?

পাগল মানুষ তো — তাই শাদা-বাঙলায়, 'তুমি কে?' প্রশ্নটা মাথায় এল না।

কিন্তু রূপেন্দ্র যে আরও বড় জাতের পাগল! পাগলামির প্রতিযোগিতায় হার মানবেন কেন? বললেন : 'যাজ্ঞবল্ক্যোহম'।

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ মেনে নিলেন। এমনটা তো হতেই পারে! ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এসে বদ্ধপদ্মাসনে বসেছেন ওঁর সামনে। তাই বিশুদ্ধ বৈদিক ভাষার প্রশ্ন করলেন, ভো ভো যাজ্ঞবল্ক্যঃ! এক্ষণে এই জটিল প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করহ! এই যে নভোলোকের ঊর্ধ্বস্থিত দ্যুলোক তাহারও ঊর্ধ্বে কী রহিয়াছে? এবং তৎসহ ইহাও কহ : এই যে অধস্থ পৃথিবী তাহার তলদেশে কী বর্তমান? অপিচ : এই যে নিরবলম্ব দ্যুলোক-ভূলোক তাহাদের অভ্যন্তরে কোন ধারণশক্তি রহিয়াছে যাহাতে তাহারা বিযুক্ত বা কক্ষচ্যুত হইতেছে না?

রূপেন্দ্র বললেন, শৃন্বন্তু সুপণ্ডিতা গার্গী! দ্যুলোক-ভূলোক আদৌ নিরবলম্ব নহে। তাহারা একমেবাদ্বিতীয় সূত্রাত্মায় গ্রথিত! অপিচ অবধান কর : সেই সূত্রাত্মাই ব্রহ্ম।

ঘনশ্যাম ঘন ঘন মাথা নাড়লেন। মনে হল উত্তরটি তাঁর মনমতো হয়েছে। তিনি আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পেলেন। রূপেন্দ্র একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ক্ষান্ত হোন, সার্বভৌম! আপনি আর অতি-প্রশ্ন করবেন না। এর পরেও পাগলের ঢং ধরে বসে থাকলে আপনার মস্তকপাতন হবে!

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ পদ্মাসন পরিত্যাগ করে শবাসনে শায়িত হলেন।

রূপেন্দ্রও যোগাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। রজ্জুতে প্রলম্বিত একটি গাত্রমার্জনী নিয়ে সার্বভৌমের কোলের উপর ফেলে দিলেন। নিজেও বস্ত্র পরিধান করতে করতে বললেন, এবার বলুন, এভাবে কেন পাগল সেজে বসে আছেন?

ঘনশ্যাম উঠে বসলেন। বস্ত্রখণ্ডটি কটিদেশে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, আপনি আমার অপরিচিত নন। আপনি যখন মাতুলশ্রীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতেন তখন আপনাকে দেখেছি...

রূপেন্দ্র বলেন, এটা আমার প্রশ্নের সদুত্তর হল না, সার্বভৌমমশাই।

—জানি। বলছি। তার পূর্বে বলুন, কেমন করে বুঝলেন যে, আমি উন্মাদের অভিনয় করছি মাত্র, উন্মাদ নই?

প্রাচীরে প্রলম্বিত দর্পণটিকে নির্দেশ করে রূপেন্দ্র বললেন, এ গৃহে প্রবেশমাত্র ঐটি আমার নজরে পড়েছিল। তাই এমন স্থানে মহড়া নিয়েছিলাম যেস্থান থেকে ঘাড় না ঘুরিয়েও পিছনে অবস্থিত আপনাকে লক্ষ্য করা যায়। আপনার স্ত্রীর নিকট পেশ করা প্রতিটি প্রশ্নে আপনার উপর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায়নি। শেষ প্রশ্নটিতে আপনি যে ঘাড় নেড়ে স্ত্রীকে নিষেধ করলেন তাও লক্ষ্য করেছি। এবার বলুন? কেন এমন পাগল সেজে আছেন?

ঘনশ্যাম প্রাচীরে প্রলম্বিত দর্পণটি লক্ষ্য করে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, বিচার্য বিষয়ের সংজ্ঞার্থ প্রথমে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। 'উন্মাদ'-এর সংজ্ঞা কী?

—যার চিন্তার পারম্পর্য নেই। নিজের মঙ্গল যে বোঝে না। যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে যে অশক্ত, সে : 'উন্মাদ'!

—এটাই যদি উন্মনাবস্থার সংজ্ঞা হয়, তাহলে স্বীকার করছি ভেষগাচার্য — আমি মাঝে-মাঝে উন্মাদ হয়ে যাই। কখনো দুই-তিন মাস, কখনো কয়েক বছর ঐ অবস্থায় থাকি। তখন যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নেওয়া তো দূরের কথা, নিদ্রা, মূত্রত্যাগ বা বিরেচন প্রভৃতি দেহকর্ম আমার নিয়ন্ত্রণানুসারে হয় না। আহারে স্পৃহা থাকে না। হয়তো দীর্ঘদিন ঐ অবস্থায় থাকি। তারপর কীভাবে জানি না — ঠিক যেমন মানুষের ঘুম ভাঙে, সুষুপ্তির অজ্ঞানবস্থা থেকে মানুষ জেগে ওঠে তেমনি নিজের অভিজ্ঞান ফিরে পাই। উন্মাদ অবস্থায় কী করেছি তা স্মরণে আনতে পারি না — কিন্তু প্রাগুন্মাদনাবস্থায় যা অধ্যয়ন করেছি, যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা সবই স্মরণে আনতে পারি। ঠিক যেমন ঘুম ভেঙে যাবার পর স্বপ্নরাজ্যে কী কী করেছি তা কখনো আবছা মনে পড়ে, কখনো কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু পূর্বদিনের সবকথাই স্মরণ করা যায়। আমার অবস্থাও ঠিক সে রকম হয়।

—এঁরা বলছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন পরবর্তী পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত। সেটা কি সত্য?

ঘনশ্যাম বললেন, আপনার প্রশ্নটা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রসম্মত কি না জানি না, ন্যায়শাস্ত্র সম্মত নয়।

—কেন?

—উপাধানের পার্শ্বে একটি বালু-ঘটিকা স্থাপন করলে আপনি কি পরদিন সকালে উঠে বলতে পারবেন ঠিক কয়টার সময় আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

রূপেন্দ্র বললেন, ঠিক কথা! না, পারব না! এমন অদ্ভুত রোগলক্ষণ আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। এটি সম্পূর্ণ মানসিক রোগ। দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে একত্র বসবাস করলে,

আপনার অন্তরের অন্দর-মহলের নির্জ্জন অঞ্চলে কী জটিলতা আছে তার হয়তো সন্ধান পাব। তখনই চিকিৎসার প্রশ্ন উঠবে। সে-ক্ষেত্রে আমাদের দুজনের মধ্যে বাধাবন্ধহীন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা প্রয়োজন। কেউ কারো কাছে কিছু গোপন করব না।

ঘনশ্যাম বললেন, তথাস্তু! তবে তার প্রথম পর্যায় এই মুহূর্তেই শুরু হতে পারে রূপেন্দ্র, যদি আমরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকি। 'তুমি'-র নৈকট্যে সরে আসি।

রূপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত। বলেন, প্রথমে বল তো ঘনশ্যাম, তোমার মনে আছে প্রথমে কবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলে?

ঘনশ্যাম বললেন, হ্যাঁ, আছে! আট বছর বয়সে। কী পারিপার্শ্বিক ঘটনায় মুহূর্তমধ্যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলাম সেটাও মনে আছে। কিন্তু তার পূর্বে বল : তুমি আমাদের সম্বন্ধে কতটা জান। এই যে আমাদের পরিবারের ধনৈশ্বর্য, এই প্রাসাদ, এই অনায়াস পরিশ্রমহীন ভোগের আয়োজন, এর মূলে কী আছে?

—কিছুটা শুনেছি।

—এই সব কিছুর বনিয়াদে আছে একটি মর্মান্তিক কুসংস্কার। বংশের আদিপুরুষ তাঁর একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে জীবন্ত দগ্ধ করে এই সম্পত্তি বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করার অধিকার লাভ করেছিলেন।

—হ্যাঁ, জানি। তার সঙ্গে তোমার এই মনোরোগের কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি এবং অতি ঘনিষ্ঠ। তাহলে আমার জীবনকথা বিস্তরিত শুনতে হবে।

—তাই তো শুনতে চাইছি, বন্ধু। রোগের ইতিহাস না জানা থাকলে রোগীর চিকিৎসা সম্ভবপর নয়। বিশেষত মনোরোগ!

ঘনশ্যাম তখন তাঁর জীবনেতিহাস বিস্তারিত জানাতে থাকেন।

আঁতুড় ঘরেই ঘনশ্যাম মাতৃহীন। তাঁকে মানুষ করেন তাঁর মাসি আর পিতামহী। অতি শৈশবকাল থেকেই বংশের এই সন্তানটি প্রখর বুদ্ধিমান বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। মাত্র চার বছর বয়সেই জগন্নাথ তাঁর ভগিনীপতির কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন — এ ছেলে জীবিত থাকলে ভারতজোড়া খ্যাতির অধিকারী হবে। নিতান্ত শিশুকালেই ঘনশ্যাম বুঝতে পেরেছিলেন — কীভাবে ওঁদের বংশের সমৃদ্ধি। জ্ঞানবুদ্ধি হবার বয়স তখনো হয়নি—মাত্র ছয় বৎসরের বালক — কিন্তু ক্ষণজন্মা পুরুষদের কীর্তি-কাহিনী ঐ রকমই হয়। একদিন ছয় বৎসরের শিশু তার পিতার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল 'সতীদাহ' প্রথা নিয়ে। শিশুর মতে — এটা একটা বর্বর ব্যবস্থা। গঙ্গাপ্রসাদ শিশুপুত্রকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যা বুঝিস্ না, ইঁচড়ে পাকার মতো তা নিয়ে কথা বলিস্ না। হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ তুই কী বুঝিস্ রে? সমস্ত ভারত-ভূখণ্ডে এই প্রথা প্রচলিত আছে, তা জানিস? বিনা হেতুতে?

ছয় বছরের বালক বলেছিল, সারা দেশের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের পরিবারে এই কুপ্রথাটি কেন আপনি এবং আপনার পিতা-পিতামহ বংশানুক্রমে জিইয়ে রেখেছেন? সেটা ধর্মের অঙ্গ বলে? না, নিজেদের স্বার্থে?

কে বলবে ছয় বৎসর বয়সের বালকের কথা! রুখে উঠেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ : কেন?

—না হলে 'সতীমায়ে'র সেবায়তী আমাদের বংশের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি পুরুষে এক-একটি বিধবাকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। আপনাদের এই জমিদারীর ঠাট বজায় রাখতে!

—কে? কে বলেছে তোকে এসব অবান্তর কথা?

—কে বলেছেন, সেটা বড় কথা নয়, বাবামশাই। কথাটা যে মিথ্যে নয় তা তো মানছেন?

গঙ্গাপ্রসাদ গর্জে উঠেছিলেন, বেরিয়ে যা! দূর হ আমার সমুখ থেকে! তুই...তুই আমাদের বংশের কুলাঙ্গার!

ঐ বালক বয়সেই পিতার সঙ্গে প্রথমে মতান্তর, পরে মনান্তর হয়ে যায়। ভাগিনেয়র এই সব দুর্বিনীত প্রশ্নের কথা শুনে স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এসেছিলেন তাকে বোঝাতে। ফলে শুধু পিতা নয়, মাতুলের সঙ্গেও বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় থেকেই উনি ঠাকুমার আরও ন্যাওটা হয়ে পড়েন। বস্তুত মায়ের নিজের ছোট বোন, মাসিমা — যাঁকে শৈশবকাল থেকেই উনি 'মা' ডাকতেন — এবং ঐ বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে ঘিরেই ওঁর শৈশবকাল গড়ে ওঠে। মাসিমা অবশ্য সংসারের নানা কাজে সর্বদা ব্যস্ত। গৃহস্বামিনীর বিকল্প তিনি। কুলীন ব্রাহ্মণঘরের অরক্ষণীয়া অনূঢ়া কন্যা। এসেছিলেন এ সংসারে বড়বোনের দেহান্তে তার ছেলেটিকে কোলে তুলে নিতে। আর বাপের সংসারে ফিরে যাওয়া হয়নি। তিনি সদা-ব্যস্ত। তাই ঘনশ্যামকে কাছে টেনে নিলেন তাঁর পিতামহী। তাঁরই কাছে মুখে-মুখে রামায়ণ-মহাভারতের নানান কাহিনী শুনেছেন। ধ্রুব-নালক-নচিকেতার উপাখ্যান। বস্তুত অক্ষর-পরিচয় হবার পূর্বেই। পিতামহীর নিজেরও অক্ষরপরিচয় ছিল না। কিন্তু কথক ঠাকুরদের কল্যাণে সে-কালীন যাবতীয় বামুন-ঘরের বর্ষীয়সীর মতো পুরাণ-ভাগবতের নানান কাহিনী ছিল ঠাম্মার ঠোঁটস্থ!

ঘনশ্যামের পিতামহ ছিলেন দীর্ঘদিনের শয্যাশায়ী রোগী। তাঁর সঙ্গে ঘনশ্যামের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তবে মাঝেমাঝে তাঁর শিয়রের কাছে গিয়ে বসতেন। পাখার হাওয়া করতেন। তিনি ইঙ্গিত করলে গঙ্গাজল ঢেলে দিতেন বৃদ্ধের কণ্ঠনালীতে।

ঘনশ্যামের বয়স যখন আট তখন তাঁর পিতামহের দেহান্ত হল। ঠাকুমা নাতিটিকে ছেড়ে সহমরণে যেতে চাননি। কিন্তু কেউ সেকথায় কর্ণপাত করেনি। ঘনশ্যাম বিদ্রোহ করলেন। প্রথমে পিতা ও মাতুলের চরণযুগলের উপর আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না : '—বাবাগো! মামাগো! ঠাম্মাকে আপনারা পুড়িয়ে মারবেন না!' অবোধ বালকের কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। তখন ঘনশ্যাম পিতামহের পরিত্যক্ত লাঠিগাছখানা কুড়িয়ে নিয়ে লড়াই করতে এগিয়ে এল। মাটির কলসী, ঘড়া, সরা, কাচের সেজবাতি চূর্ণ হয়ে গেল যষ্টিপ্রহারে। পাঁচ-সাত জন জোয়ান মানুষ জড়িয়ে ধরল বালককে।

ঠাকুর্দার নিস্পন্দ দেহটা ওরা খাটিয়ায় তুলে নিল : বল হরি, হরি বোল!

তারপরেই একটা পাল্কিতে সিন্দূরচর্চিত ও অলক্তকরঞ্জিত এক পক্ককেশা বৃদ্ধা। তিনি চীৎকার করে কী-যেন বলছেন, শোনা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে আর শতশত ধার্মিকের সমবেত পুকারে : 'সতী মাঈকী জয়!'

বালক ঘনশ্যাম সুকৌশলে খড়ো-চাল ঘরের বাঁশের বাতা আর উলুখড় ভেদ করে

বেরিয়ে এসেছিল রুদ্ধদ্বার-কক্ষের বাহিরে। ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হয়েছিল শ্মশান ঘাটে। বৃদ্ধার সেই মর্মান্তিক সহমরণ প্রত্যক্ষ করেছিল আড়াল থেকে। সহসা বৃক্ষান্তরাল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে — বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ছুটে যায় জ্বলন্ত চিতার দিকে। বৃদ্ধার তখনো জ্ঞান ছিল। চিৎকার করে উঠেছিলেন : পাগলা, এখানে আসিসনি। পুড়ে মরবি!

তিন-চারজনে ওঁকে চেপে ধরে; কিন্তু তার পূর্বেই বিশ্রীভাবে ওঁর হাত-পা পুড়ে যায়। উনি অজ্ঞান হয়ে যান। পুরোপুরি তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন। তারপর যখন উঠে বসলেন তখন বালক ঘনশ্যাম ঘোর উন্মাদ।

সেই তাঁর প্রথম আক্রমণ।

সেবার যে কতদিন ঐ অবস্থায় ছিলেন কেউ তার হিসাব রাখেনি। উন্মাদ, কিন্তু কোনও উপদ্রব নেই। আপন মনে বসে থাকে। খেতে দিলে খায়, না দিলে খায় না। ঠাম্মা নেই, মাসিমা সংসারের পঞ্চাশটা কাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বালক ঘনশ্যামকে সেবা-যত্ন করত প্রতিবেশিনীর একটি অনূঢ়া কন্যা। বয়সে সে ঘনশ্যামের চেয়ে মাত্র দু-বছরের ছোট। প্রতিবেশী বিশ্বম্ভর ঘোষালের আত্মজা। বিশ্বম্ভরও ব্রাহ্মণ, তবে কুলীন নন, শ্রোত্রীয়। উন্মাদ ঘনশ্যামের কাছে যেতে অনেকেই ভয় পায়, সুভা পায় না। সুভা যে ওর খেলার সাথী নিতান্ত শৈশবকাল থেকে। মেয়েটির ডাক নাম সুভা — 'সুভাষিণী' নামের অপভ্রংশ। নিদারুণ দুঃখের কথাটা এই : বিশ্বম্ভর যখন কন্যার নামকরণ করেন তখনো বালিকার বোল ফোটেনি। তাই পরে ঘোষালমশাই প্রণিধান করেছিলেন বিশ্বনিয়ন্তা কী নিষ্ঠুর কৌতুক করেছেন তাঁকে নিয়ে। বোল ফোটার বয়স হলে দেখা গেল : সুভাষিণী মূক ও বধির!

সে ছিল ঘনশ্যামের শৈশবের নির্বাক খেলার সাথী, উন্মত্তাবস্থায় নীরব সেবাব্রতী।

কবে জ্ঞান ফিরে এল মনে নেই; তবে এটুকু মনে আছ যে, জাগতিক সব কিছুর উপরেই তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মেছে। পিতা, মাতা, মাতুল, সহাধ্যায়ী — কারও সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না, বন্ধুত্ব তো নয়ই। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ অসহায়া মূক মেয়েটি। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নে অস্বীকৃত হওয়ায় গঙ্গাপ্রসাদ বালককে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যাবিনোদের চতুষ্পাঠীতে। ঘনশ্যাম দিবারাত্র আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন পুঁথির জগতে। ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, ষড়দর্শন, ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করলেন সবকিছুই। চতুষ্পাঠীতে সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে বিশেষ বাক্যালাপ করতেন না, বাড়িতেও কারও সঙ্গে কথাবার্তা নেই। একমাত্র ঐ মূক-বধির শুভাকে দেখলেই উনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। চতুষ্পাঠী ও টোলের শেষ পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হলেন তখন ঘনশ্যামের বয়স অষ্টাদশ। সুভা তখন ষোড়শী। এ বাড়ি যাতায়াত তার বন্ধ হয়ে গেছে। হোক পাশের বাড়ি। তবু খরজিহ্ব প্রতিবেশিনীদের বাক্যবাণ থেকে রক্ষা করতে ওর মা বোবা মেয়েটাকে আগলে রাখতেন।

এই সময় ঘনশ্যাম তাঁর মামিমার কাছে সংবাদ পেলেন যে, গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করছেন। মাতুলশ্রী জগন্নাথের সঙ্গে এ বিষয়ে পিতৃদেবকে দু-একবার ঘনিষ্ঠ আলোচনা করতে শুনলেন।

ঘনশ্যাম সোজা কথার মানুষ — ওঁদের সেই গোপন আলোচনা সভায় একদিন অযাচিত উপস্থিত হয়ে দুজনকে প্রণাম করে বললেন, মামিমার কাছে শুনলাম আপনারা নাকি আমার বিবাহের আয়োজন করছেন। সে বিষয়ে দু-একটি কথা নিবেদন করতে এলাম। আপনারা অনুমতি দিলে...

গঙ্গাপ্রসাদ গর্জে ওঠেন, এমন দুর্বিনীত, নির্লজ্জ কখনো দেখিনি। নিজের বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তা নিজেই বলতে এসেছ তুমি! লজ্জা হল না! যাও! অনুমতি দিলাম না।

তর্কপঞ্চানন ওঁকে থামিয়ে দিলেন; আহা হা! মাথা গরম করছে কেন গঙ্গা? এ কি মাথা-গরম করার বিষয়, না সময়?... হ্যাঁ, বল ঘনশ্যাম, তোমার বিবাহ সম্বন্ধে কী বলতে এসেছ?

—আমি বলছিলাম যে, আমি তো ঠিক স্বাভাবিক নই। মাঝে-মাঝে উন্মাদ হয়ে যাই। এ-ক্ষেত্রে একটি অনূঢ়া কন্যার ভাগ্য কি আমার ভাগ্যের সঙ্গে বিজড়িত করা উচিত?

জগন্নাথ বললেন, তুমি বুদ্ধিমানের মতোই কথাটা বলেছ, ঘনশ্যাম। তোমার অস্বাভাবিকত্বের বার্তাটা আমরা কন্যার পিতার কাছে গোপন করব না। তিনি যদি সব জেনে-বুঝেই কন্যা সম্প্রদান করেন তাহলে আপত্তির কথা ওঠে না।

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলেছিলেন, ওঠে বইকি, মতুলশ্রী! পাগলের ঘর করতে তো পাত্রীর অভিভাবক আসবেন না। আর মেয়েটির মতামত গ্রহণের কথা নিশ্চয় আপনাদের পরিকল্পনায় নেই, তাই না?

গঙ্গাপ্রসাদ রুখে উঠে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে আবার থামিয়ে দিয়ে জগন্নাথ বলেন, তুমি চুপ করে থাক গঙ্গা, কথাবার্তা আমাকেই বলতে দাও।... হ্যাঁ, তাহলে তোমার কী সিদ্ধান্ত, বাবা ঘনশ্যাম? চিরকুমার থাকা? ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা? সন্ন্যাস নেওয়া?

—আজ্ঞে না। তেমন কোন সিদ্ধান্ত এখনো করিনি। আমি বরং চাইছি এমন একটি পাত্রীকে আপনারা নির্বাচন করুন যে, এই পাগল মানুষটাকে সেবাযত্ন করতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত!

গঙ্গাপ্রসাদ আর স্থির থাকতে পারেন না। বলেন, সেটা কীভাবে হবে? গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেঁড়া দিতে হবে বোধকরি : ওগো তোমাদের গাঁয়ে কোন আধাপাগলী পাত্রী কি আছে, যে আমার পুরোপাগল ছেলেটিকে বিবাহ করবে?

ঘনশ্যাম প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই গর্জে উঠলেন তর্কপঞ্চানন। গঙ্গা! তুমি ওঠো। ভিতর বাড়িতে যাও! যা—ও!

গঙ্গাপ্রসাদ এ কণ্ঠস্বরকে চেনেন। গোটা ত্রিবেণী চেনে। মাথা নিচু করে তিনি ভিতর বাড়িতে চলে যান। জগন্নাথ অন্দরের দিকের কবাটটা রুদ্ধ করে দিয়ে ফিরে এলেন। নিজ আসনে বসে শান্তস্বরে বললেন, বেশ তো ঘনশ্যাম। এ উত্তম প্রস্তাব। কন্যা যদি স্বেচ্ছায় এ রকম রোগাক্রান্ত স্বামীকে বরণ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে আমরা আপত্তি করব কেন? এমন কোন পাত্রীর সন্ধান কি তোমার জানা আছে?

ঘনশ্যাম বলছিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘোষালখুড়োর একমাত্র কন্যা সুভা : সুভাষিণী।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, কী বলছ ঘনশ্যাম! বিশম্ভর ঘোষালের কন্যাটি

pathagar.net

তো মূক এবং বধির! না, না, না! এ বিবাহ সম্ভবপর নয়! তাছাড়া বিশ্বম্ভর কুলীন নয়, শ্রোত্রীয়। কুলীন পাত্র যদি শ্রোত্রীয় ঘরের কন্যাকে বিবাহ করে তাহলে কুলীনঘরের অরক্ষণীয়াদের গতি হবে কী? কৌলীন্যপ্রথা তো ক্রমে ক্রমে ভেঙে যাবে!

ঘনশ্যাম বলেছিলেন, মামা! আপনাকে এ-কথার প্রত্যুত্তরে যে-কথা জানাব তা আমার মাতুলকেই শুধু বলছি না আমি, বলছি গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের অন্যতম স্তম্ভকে। আপনি বিবেচনা করে দেখুন, সুভা, অর্থাৎ সুভাষিণী মূক-বধির হওয়ার জন্যই হয়তো আজীবন উপেক্ষিতা অনূঢ়া হয়ে থাকবে। তার বিবাহ হবে না। এদিকে আমিও সুভার মতো একদিক থেকে পঙ্গু — আমার মানসিক ভারসাম্য মাঝে-মাঝে হারিয়ে যায়। আমরা দুজনে আংশিকভাবে পঙ্গু। কিন্তু হয়তো যৌথভাবে নয়। স্কন্ধস্থিত খঞ্জ সহধর্মিণীর নির্দেশে অন্ধমানুষ সংসারে উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করতে পারে। আমাদের দু-জনের এ রাজযোটকে কেন বাধা দিচ্ছেন আপনারা? আর কৌলীন্যপ্রথা? আমি তো অন্তর থেকে বিশ্বাস করি এই বর্বরপ্রথা বিলুপ্ত হলেই হিন্দু-সমাজের, ব্রাহ্মণ্যসমাজের মঙ্গল। গৌড়মণ্ডলের অন্যতম সমাজপতি হিসাবে আপনি কি তা উপলব্ধি করেন না?

জগন্নাথ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, কৌলীন্যপ্রথা বা গোটা ব্রাহ্মণ্যসমাজের ভালমন্দ বিষয়ে আলোচনা আমি তোমার সঙ্গে করতে বসিনি, ঘনশ্যাম। আমরা তোমার বিবাহের প্রস্তাব আলোচনা করছিলাম। আমাদের বংশে এবং তোমাদের বংশেও কেউ কোনদিন স্বয়ং পাত্রী নির্বাচন করেনি। পিতৃস্থানীয়দের নির্বাচন আবহমান কাল ধরে মেনে এসেছে। দ্বিতীয়ত, না আমাদের বংশে, না তোমাদের বংশে — কেউ কখনো কোন মূকবধির কন্যাকে সজ্ঞানে গৃহবধূ করে আনেনি।

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না মামাশ্রী! আপনার বক্তব্যটি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নয়! 'কেউ কোনদিন করেনি' এটা কোনও যুক্তি নয়! আমাদের বংশে কেউ কোনদিন গৌড়মণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে ইতিপূর্বে স্বীকৃতি গ্রহণ করেননি। 'কেউ কোনদিন করেনি' যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে আপনি তা করেছেন। তাতে ক্ষতি তো কিছু হয়নি। আমরা গর্বিত হয়েছি। ঠিক তেমনি একটি মূক-বধির কিশোরীর নারীত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে স্ত্রী হয় আমিই প্রথম ব্যতিক্রম হলাম। স্ত্রীর মূকবধিরত্বের জন্য অসুবিধা যখন আমি স্বেচ্ছায় সহ্য করতে রাজি, তখন আপনাদের অনুমতি দিতে বাধা কোথায়?

ঘনশ্যাম জানেন না প্রকৃত বাধাটা কোথায় ছিল। মাসিমা সম্মত হয়েছিলেন : আহা। আবাগিটা খোকাকে সত্যিই প্রাণ ঢেলে ভালবাসে!

গঙ্গাও শেষপর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছিলেন, ছেলেটা পাগল। যা হয় করুক।

কিন্তু সম্মত হতে পারেননি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ঘনশ্যামের মনে হল — জগন্নাথ এটাকে ভাগিনেয়র নিকট পরাজয় বলে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত!

অচিরেই এক অন্তর্জলী-যাত্রী বিপত্নীক বৃদ্ধের সঙ্গে সুভাষিণীর বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের এক সপ্তাহের মধ্যেই বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠলোকে যাত্রা করলেন। সুভাষিণী গেল সহমরণে! এমন "সতী" কেউ কোনদিন দেখেছ! লেলিহান অগ্নিশিখার আবেষ্টনীতে মূকবধির মেয়েটি

Pathagar.net

আর্তনাদ করেনি একটুও।।

এবারও সেই সহমরণ রুখতে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ছুটে গিয়েছিলেন ঘনশ্যাম। ফিরে এলেন পুনরায় বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায়, পালকিবাহকদের কাঁধে চেপে।

অষ্টাদশ থেকে চতুর্বিংশতি—দীর্ঘ ছয় বৎসর উনি উন্মাদ হয়ে গৃহবন্দি অবস্থায় পড়েছিলেন। এবার কী করে ওঁর অভিজ্ঞান ফিরে এল তা মনে নেই; কিন্তু ক্রমে ক্রমে ওঁর দৃষ্টি হল স্বচ্ছ। আশপাশে যেসব কথাবার্তা কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে তার অর্থ বুঝতে পারছেন। ঐ সময়ে লক্ষ্য করেন; একটি সুন্দরী যুবতী মহিলা অনায়াসভঙ্গিতে ওঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন, নানান জিনিসপত্র নাড়াচাড়ি করছেন, আবার বেরিয়েও যাচ্ছেন। মেয়েটির বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হবে — ওঁদের আত্মীয়-স্বজন নিশ্চয় নয়, তাহলে চিনতে পারতেন। মহিলা সধবা, মাথায় আবক্ষ অবগুণ্ঠন; কিন্তু ঘনশ্যামের নির্জন শয়নকক্ষে এসে মাঝে-মাঝে মাথার ঘোমটা ফেলেও দিচ্ছেন। তখনি নজরে পড়ছে — ওঁর সিঁথিতে সিঁদুর, নাকে নোলক, কপালে কুমকুমের টিপ্ আর মুখে শ্বেতীর বিশ্রি দাগ। কথা বলছেন না, কিন্তু মাঝে-মাঝে ওঁর দিকে তাকিয়ে মৃদুমৃদু হাসছেন। সন্ধ্যার পর একবার পাথরের বাটিতে কী-একটা পানীয় নিয়ে এসে ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, খাও!

ঘনশ্যাম একটু অবাক হলেন। অপরিচিতা যুবতী মহিলাটির 'তুমি' সম্বোধনে। পানীয়টি গ্রহণ করলেন। কপিত্থ সুরভিত তক্র। পানান্তে ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মেয়েটি খিলখিল্ করে কিছুক্ষণ হাসল। হাসির দমকে সে পালঙ্কে লুটিয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে রুদ্ধদ্বারের অর্গল মোচন করে বেরিয়ে গেল বাইরে। ফিরে এল পরক্ষণেই। তার ক্রোড়ে একটি নিদ্রিত শিশু। বৎসরখানেক বয়স। পুত্রসন্তান। দেখ্-না-দেখ্ শিশুটিকে ওঁর কোলে নামিয়ে দিয়ে বললে, এটি তোমার পুত্র, নাম 'বলভদ্র'। এখন বুঝতে পারছ আমি কে? হুঁশ ফিরেছে?

দুরন্ত বিস্ময়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন ঘনশ্যাম। ডাকলেন : মা!

মাসিমা বোধকরি রান্নাঘরে ছিলেন। নিদারুণ চমকে উঠলেন। এ কণ্ঠস্বর তো ভুল হবার নয়! ছুটে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে, কী বাবা?

মাসিমা দেখছিলেন, ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে আছেন অন্দরমহলের বারান্দায়, একটা কাজকরা খাম্বিরার পাশে। দেখছিলেন ঘনশ্যামের ধুতি মাটিতে লুটাচ্ছে না, তার চোখে আর সেই পাগলের ঘোলাটে দৃষ্টি নেই। ছেলে ওঁর ভাল হয়ে গেছে।

ঘনশ্যামও দেখছিলেন, মাসিমা দাঁড়িয়ে আছেন পাকঘরের সমুখে। তাঁর পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা-খাড়ু, মাথায় ঘোমটা আর সিঁথিতে সিঁদুর।

বিমাতা বারান্দার ও-প্রান্ত থেকে ছুটে এসে বললেন, খোকা! তুই ভাল হয়ে গেছিস্? চিনতে পারছিস্ আমাকে?

ঘনশ্যাম ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন জিজ্ঞেস্ করতে যে, ঘরে ঐ মহিলাটি কে, শিশুটি কার সন্তান। কিন্তু সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করা হল না। বললেন : মা! তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? বাবার সঙ্গেই তো?

pathagar.net

ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এল যুবতী নারীর খিলখিল হাসি আর শিশুর কান্না!

ক্রমে বুঝলেন। তীক্ষ্ণধী ঘনশ্যাম তিল-তিল করে প্রণিধান করলেন পরিস্থিতিটা। তাঁর দীর্ঘদিনের বিস্মরণকালের মধ্যে কী কী ঘটেছে!

ঘনশ্যামের পিতা ইতিমধ্যে বিবাহ করেছেন তাঁর মাসিমাতাকে — তাঁর গর্ভধারিণীর অনুজাকে। এবং মাতুলশ্রীর ব্যবস্থাপনায় উন্মাদ অবস্থাতেই তিনি নিজে বিবাহ করেছেন জগন্নাথের এক ধনী যজমানের একমাত্র কন্যাটিকে। বলভদ্রজননীকে! ক্রমে সকলকেই চিনলেন। বলভদ্রের গর্ভধারিণী সুভদ্রাকে, শ্বশুর-শাশুড়িকে, মায় বলভদ্রকেও। নিজের সন্তান! না চিনবেন কেন? শুধু একটা সমস্যার সমাধান হল না : সুভদ্রার পিতা হৃষীকেশ রায়চৌধুরী প্রচুর সম্পত্তির মালিক — জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের একজন প্রধান শিষ্য! কুলীন তিনি; কিন্তু সব জেনে বুঝে কেন তিনি এমন উন্মাদকে জামাই করলেন?

ঘনশ্যামের সুদীর্ঘ রোগ-ইতিহাস শুনে রূপেন্দ্রনাথ বললেন, ভাই ঘনশ্যাম, তোমার সমস্যার অনেক কিছু বুঝেছি, অনেক কিছু বুঝিনি। তাতে ক্ষতি নেই। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমাকে আমার সঙ্গে সোঞাই যেতে হবে। তোমাকে থাকতে হবে আমার চোখের সম্মুখে। তাছাড়া তোমার মতো দুর্লভ প্রতিভা তো এখানে পড়ে নষ্ট হতে পারে না। তুমি সর্বান্তঃকরণে আমার কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড় — দেখবে উন্মাদ হবার অবকাশই পাবে না।

ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে বলেন, সোঞাই গ্রামে তুমি কী জাতির কর্মযজ্ঞ শুরু করতে চাও? চতুষ্পাঠী, টোল, না মন্দির-টন্দির ঘিরে আশ্রম?

—তিনটের একটাও নয়। শোন বলি—

ওঁর যা জীবনের লক্ষ্য, যে সাধনা তা বললেন — কী কারণে হিন্দু সমাজ ক্রমাবনতির অতলান্ত গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। তার দুটি হেতু। এক: দেশবাসীর সুবৃহৎ অংশকে ব্রাহ্মণ্যসমাজপতিরা দূরে সরিয়ে রেখেছে। জল-অচল, অচ্ছুৎ আখ্যা দিয়ে। দুই: সমাজের অর্ধাংশ — নারী জাতিকে — যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সারা দেশে কোথাও নেই। এ ছাড়া আছে নানান জাতির কুসংস্কার। সর্বপ্রধান : সতীদাহ। তারপর কৌলীন্য প্রথা — কুলীনদের বিশ-পঞ্চাশ-শতাধিক বিবাহ মেনে নিচ্ছে সমাজ। অভ্যন্তরভাগে এখনো বহু কালীমন্দিরে নরবলি হয়। প্রকাশ্যে মানত করে সন্তান বিসর্জন দেয় বন্ধ্যা নারী, গঙ্গার জলে! যারা সমাজপতি হয়ে এসব কুপ্রথা রদ করতে পারতেন, তাঁরা আশ্চর্যভাবে নীরব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সতীদাহ ও গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী, গৌরীদান

প্রথার সপক্ষে। তিনি শুধু সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খুলে যাচ্ছেন একের পর এক। বর্ধমান মহারাজও একই পথের পথিক। এমন কি নাটোরের মহারানীর মতো বিদুষীও এ বিষয়ে উদাসীন। একের-পর-এক মন্দির গড়ে যাওয়ার মধ্যেই তিনি ধর্মসেবার পরমার্থ খুঁজে পেয়েছেন! সকলেই গড্ডলিকাপ্রবাহে স্বর্গে দুন্দুভি বাজানোর আয়োজনে ব্যস্ত!

রূপেন্দ্র বললেন, সোঞাই ফিরে যাচ্ছি আমি। সেখানে আমার প্রথম কাজ হবে গৌরমণ্ডলে এই সহস্রাব্দিতে প্রথম নারী পাঠশালার উদ্বোধন। যেখানে ছাত্র থাকবে না, থাকবে শুধু ছাত্রী। আমার প্রস্তাব : এখানকার সব কিছু বলভদ্রকে লিখে দিয়ে তোমরা দুজন আমার সঙ্গে চল। আমি বিপত্নীক, আমার ভিটায় স্ত্রীলোক নেই। তোমরা দুজন যদি বালিকাদের সারস্বত সাধনায় সহায়তা কর...

ঘনশ্যাম বাধা দিয়ে বললেন, দ্বিবচন নয়, বয়স্য, একবচন! তোমার বৌঠান সাক্ষর নন। তা হোক তিনি তোমাকে অন্য নানাভাবে সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু প্রথমে, বল, এতগুলি সমস্যার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থাপনাটাই কেন প্রথম কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে চাইছ?

রূপেন্দ্র জানালেন, কাশীধামের পরপারে ব্যাসকাশীতে তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এক ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগীর: ত্রৈলঙ্গস্বামী! সেই অলৌকিক-ক্ষমতাসম্পন্ন মহর্ষির কাছ থেকে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছেন: গৌরমণ্ডলে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের মধ্যেই তাঁর সাধনার সূচনা হওয়া উচিত। রূপমঞ্জরীকে বেদাশ্রয়ী করে তোলা!

যে যুক্তির কোন অর্থ খুঁজে পাননি ভবতারণ গাঙ্গুলী, নদীয়ার বিদুষী রাজমহিষী, কাশীর শঙ্করাচার্য, এমনকি ক্ষুরধারবুদ্ধি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, সে যুক্তি বিনা তর্কে, বিনা ব্যাখ্যায় সর্বান্তঃকরণে প্রণিধান করলেন ঘনশ্যাম সার্বভৌম। বললেন, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, বন্ধু। কিন্তু বিশেষ হেতুতে আমি তোমার সহযোগী হিসাবে এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারছি না। মালতী হয়তো পারবেন — যদি তিনি স্বীকৃতা হন, যদি তুমি তাঁকে স্বীকার করে আশ্রয় দাও!

রূপেন্দ্র বলেন, কী বলছ পাগলের মতো! তুমি না গেলে তিনি কেমন করে যাবেন?

সার্বভৌম বলেন, পাগল মানুষ তো! পাগলের মতো কথাই বলব ভাই! আচ্ছা সেসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে, আপাতত এস, আমরা আলোচনা করি: স্ত্রীজাতীয়ার বিদ্যায়তনে কী ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে?

রূপেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলেন, একই ধরনের। সারা দেশে শত শত চতুষ্পাঠীতে ছাত্ররা যা-যা শেখে — এমনকি বৈদিক শাস্ত্র — মেয়েরাও ঠিক তাই তাই শিখবে। কোন প্রভেদ থাকবে না। আমার মতে পুরুষ-স্ত্রীর অধিকার ও স্বাধীনতা অভিন্ন। কোনও পার্থক্য থাকবে না।

ঘনশ্যাম বললেন, উত্তেজিত হয়ো না, বন্ধু। সামাজিক অধিকার নিয়ে আমি এ তর্ক করছি না; কিন্তু এ-কথা তো মানবে যে, সৃষ্টিকর্তার বিধানে পুরুষ ও স্ত্রী কখনই সমান নয়? তাদের ক্ষমতা, তাদের অধিকার, সমাজে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমান নয়?

রূপেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি তা মানি না! এ-সমস্তই পুরুষশাসিত সমাজ-অধিপতিদের একদর্শী চিন্তাধারার প্রতিফলন।

—না, রূপেন্দ্র, স্ত্রীজাতীয়ার গর্ভধারণের ক্ষমতা আছে, সন্তান প্রসবের ক্ষমতা আছে। পুরুষের নেই। কিন্তু প্রমীলারাজ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে-রাজ্যে পুরুষের পদার্পণ ঘটে।

রূপেন্দ্র বললেন, সে তো দৈহিক পার্থক্য। জৈবিক হেতুতে।

—মানলাম! তা থেকেই 'গুণকর্মবিভাগ' হয়েছে। প্রতিটি সংসারে। পুরুষ উপার্জনে সক্ষম হবার প্রয়োজনে নানান শিক্ষা গ্রহণ করে — কামারের ছেলে হাতুড়ি চালানো শেখে, সূত্রধরের ছেলে শেখে করাত চালাতে, তন্তুবায়ের পুত্র তাঁত চালাতে। কোনও শাঁখারির মেয়ে যদি শাঁখা কাটে, বা কোন তাঁতির বৌ যদি তাঁত চালায় তাহলে বুঝতে হবে সে কর্তব্যের বেশি করছে; ঠিক যেমন চাষীভাই মাঠ থেকে ফিরে এসে যদি বলে, কই দুধের বাটি আর ঝিনুকটা দাও খোকনকে আমিই খাইয়ে দিচ্ছি। তাই পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয়ারা পাঠশালায় একই বিষয়ে শিখবে না। শুধুমাত্র ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, আর দর্শন নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে না, রূপেন। বিজয়সিংহের মধুকর, সপ্তডিঙা, ময়ূরপঙ্ক্ষী হারিয়ে গেছে — সমুদ্র জয় করে হাজার হাজার যোজন দূর থেকে যারা এদেশে বাণিজ্য করছে সেইসব পর্তুগীজ, দিনেমার, ইংরেজ শিক্ষিত; কিন্তু তারা ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় পড়েনি! সংক্ষেপে আমার বক্তব্য হল: আগামীযুগে গৌড়মণ্ডলকে উন্নততর করতে হলে পুরুষ ও স্ত্রী-জাতীয়া বাঙালির পাঠক্রম ভিন্ন ধরনের হবে। স্ত্রীলোকের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে এ নিয়ে তোমাকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। মেয়েরা শিখবে ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, গার্হস্থ্যবিধির স্বাস্থ্যসম্মত বিধান ইত্যাদি...শুধু তর্ক, ন্যায়, নব্যন্যায় নয়!

রূপেন্দ্র বললেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য। এ-ভাবে তো ভাবিনি কোনদিন। তুমি আমার জীবনে এত দেরি করে কেন এলে, ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম সহাস্যে বলেন, ফুলশেযের রাত্রে এ প্রশ্নের জবাবে নববধূ বলে, আজকের এই মিলনমধুর রাত্রিটি সার্থক হবে বলে!

রূপেন্দ্র বন্ধুর দুটি হাত সাগ্রহে নিজ করমুষ্টিতে গ্রহণ করে বললেন, কথা দাও, আমার সঙ্গে সোঞাই যাবে। আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে?

ঘনশ্যাম হঠাৎ কী-জানি কেন ম্লান হাসলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, কাল তোমার এ-প্রশ্নের জবাব দেব। একটা রাত আমাকে একটু ভাবতে দাও। কিন্তু আমারও একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে, বন্ধু: কথা দাও! আমি যদি কোনও অনিবার্য কারণে তোমার আশ্রম নির্মাণের কাজে যোগ দিতে না পারি, তাহলে তুমি তোমার ঐ বৌঠানকে এই 'সতী-মা' গাঁ থেকে নিয়ে যাবে? তোমার আশ্রমে ঠাঁই দেবে?

—সে কী! তুমি যদি পুনরায় তোমার অভিজ্ঞান হারিয়ে ফেল, যদি উন্মাদ হয়ে যাও, তখন তাঁর উপস্থিতিটাই যে সবচেয়ে প্রয়োজন হবে তোমার...

—না। উন্মাদ নয়, ধর আমি যদি সন্ন্যাস নিই, অথবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে আমার যদি আকস্মিক মৃত্যু হয়, তাহলে কথা দাও বলভদ্রের ঐ কারাগারে ওকে রেখে যাবে না?

ভ্রূকুঞ্চন হল রূপেন্দ্রের। বললেন, আমরা দু-জনেই পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুত যে,

কোন কিছু গোপন রাখব না...

—ঠিক কথা। কিন্তু আমরা দুজনেই বিবাহিত। স্ত্রীর গোপন কথা তো বন্ধুকেও বলা যায় না।

—ঠিক আছে। তাহলে তোমার ঐ প্রশ্নটির প্রত্যুত্তরও মুলতুবি থাক। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে বৌঠানের দায়িত্ব আমি নেব কি নেব না।

ঘনশ্যাম বললেন, তাহলে আজ রাত্রিটা তুমি এখানেই বিশ্রাম নিয়ে যাও। এস আমরা তোমার ঐ স্ত্রীশিক্ষার পরিকল্পনাটা আজকেই মোটামুটি ছকে ফেলি। কী হবে ওদের পাঠক্রম? ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণদের পাঠক্রম কি একই জাতির হবে? ওরা কি একই সঙ্গে পড়তে বসবে, না কি একই পাঠশালায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে? স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করছি শুনলেই গোঁড়া বামুনেরা তেড়ে আসবে, বাধা দেবে, তার উপর কি একই সঙ্গে জাতের বাধা দূর করার প্রচেষ্টা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে? সব কথাই আলোচনা করি। কে বলতে পারে — আগামী কাল এসব আলোচনা করার মতো মানসিক স্থৈর্যই হয়তো আমার থাকবে না।

দুই বন্ধু নানান বিষয়ে আলোচনা করলেন। সতীদাহ প্রথা থেকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, তা থেকে ক্রমে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন। ওঁরা জানতেও পারলেন না অজাত রামমোহন-মদনমোহন তর্কালঙ্কার-বিদ্যাসাগর-ডেভিড হেয়ারের জীবনব্যাপী সাধনার অঙ্কুরোদগম হতে থাকে ওঁদের দুজনের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নৈশ আহারান্তেও দুই বন্ধু উঠে গেলেন ছাদে। সূর্য এখন মেষরাশিতে। প্রায় মধ্যরাত্রে — যখন খ-মধ্যবিন্দুর দিকে হাত বাড়িয়েছে বৃশ্চিকরাশির অনন্ত জিজ্ঞাসা — তখন দুজনে নেমে এলেন নিচে। ঘনশ্যাম বন্ধুকে পৌঁছে দিলেন নিচের বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে একটি চৌকিতে মশারি পাতা। ঘনশ্যাম দেখে নিলেন শয্যাপার্শ্বে পানীয় জল ও ঘটি আছে কি না, চিনিয়ে দিলেন শৌচাগারের দিকে যাবার গলিপথ, তারপর প্রদীপে তৈলের পরিমাণ লক্ষ্য করে সেটিকে এমনস্থানে স্থাপন করলেন যাতে শায়িত রূপেন্দ্রের চোখে আলো না লাগে।

রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ছোট বৌঠান কোথায়?

—সারাদিন পরিশ্রম করে, এতক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়ে কাদা। এবার তুমিও শুয়ে পড় বন্ধু!

—আর তুমি?

—আমার এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। যাই, তাহলে?

রূপেন্দ্র বললেন, 'যাই' বলতে নেই, বল, 'আসি'।

হঠাৎ কী যেন হল। ঘনশ্যাম সার্বভৌম নিতান্ত ভাবাবেগে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন রূপেন্দ্রকে। পরক্ষণেই আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বিস্মিত রূপেন্দ্রনাথ এর কোনও কার্য-কারণ সূত্র খুঁজে পেলেন না।

boiRboi.net

ঘুমটা ভেঙে গেল কোলাহলে।

শয্যাত্যাগমাত্র সচরাচর ইষ্ট-স্মরণ করেন রূপেন্দ্র। আজ ভুল হয়ে গেল তাঁর। মনে হল, দ্বিতল থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল।

সূর্য ওঠেনি, কিন্তু আলো ফুটেছে। বাসিমুখে জল দেওয়াও হল না। দ্রুতপদে রূপেন্দ্রনাথ উঠে এলেন দ্বিতলে। ঘনশ্যামের গৃহের সম্মুখে একটা জটলা। কক্ষের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ক্রন্দনধ্বনি। এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

নিদারুণ দুঃসংবাদ! গৃহস্বামী উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁকে সদ্য উদ্‌বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করে পালঙ্কে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশেই মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে মালতী।

রূপেন্দ্র ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এলেন। ঘনশ্যামকে পরীক্ষা করার কিছু নেই। দেখেই বোঝা যায় মেরুদণ্ডের সঙ্গে তাঁর মস্তকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন — তিনি মৃত। মালতীর হাতটি তুলে নিয়ে মণিবন্ধে নাড়ির গতি লক্ষ্য করলেন। সে মূর্ছাগতামাত্র। হাতটি তুলে ধরার সময় লক্ষ্য হল ওর মুঠিতে কয়েকটি ভূর্জপত্র। পুঁথির পৃষ্ঠা। সাবধানে সেটি খুলে নিয়ে অঙ্গরাখার পকেটে রেখে দিলেন। কক্ষে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। একজন মাত্র ভৃত্যশ্রেণীর পুরুষ। তাকে প্রশ্ন করলেন, বলভদ্র কোথায়?

—কোতোয়ালরে খপর দিতি ঘোড়া ছুইটে তিনি চলি গ্যালেন আইজ্ঞে।

—আর তোমাদের বড়-মা?

—তা তো জানি না, কোবরেজমশাই। আছেন ভিতরবাগে, কুথাও। দেখপ?

রূপেন্দ্র পরিচারিকাদের বললেন, মালতী মূর্ছা গেছে মাত্র। ভয়ের কিছু নাই। তার মুখে-চোখে জল দাও। নীবিবন্ধের বাঁধন আলগা করে দাও। ভিড় করে ঘিরে ধর না। ওকে বাতাস থেকে নিশ্বাস নিতে দাও।

ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। বাড়ি থেকে উদ্যানে। সূর্য উঠেছে। গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির সদ্য-জাগরিত কলকাকলি। ঘনশ্যাম সার্বভৌম নামের এক উন্মাদ — যার সম্ভাবনা ছিল জগন্নাথোত্তর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার — সেই লোকটা ঐ শুকতারার সঙ্গে ডুবে গেল আকাশের নীলিমায়। প্রকৃতিতে সে জন্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। পুব-

pathagar.net

আকাশ প্রতিদিনের মতোই লালে-লাল। ইতিমধ্যে খবরটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে কৌতূহলী জনতা সহানুভূতি জানানোর অছিলায় ভিড় করে ছুটে আসছে। উদ্যানের এক দূরতম অর্জুন গাছের তলায় গিয়ে বসলেন।

কেন ঘনশ্যাম আত্মহত্যা করলেন? কিন্তু আত্মহত্যাই তো? হত্যা নয়? আগে খুন করে পরে কেউ দড়ি থেকে ঝুলিয়ে দেয়নি?

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল রূপেন্দ্রের। এত তড়িঘড়ি বলভদ্র কোতোয়ালিতে খবর দিতে নিজে ছুটল কেন? বোধহয় লোক জানাজানি হবার পূর্বেই কোতোয়ালের উপস্থিতিতে মৃতদেহটা সৎকার করে ফেলতে চায় — আর ঐ সঙ্গে জ্ঞানহীন মালতীর দেহটা চিতায় তুলে দেওয়া চাই। তাহলেই শর্তানুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বলভদ্র।

ওঁর মনে হল কালবিলম্ব না করে এখনি ত্রিবেণীতে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে পড়া দরকার। একটা তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন — এটা হত্যা, না আত্মহত্যা?

উঠে দাঁড়াতেই অঙ্গরাখা থেকে একটুকরো ভূর্জপত্র পড়ে গেল মাটিতে। তখনই মনে পড়ে গেল রূপেন্দ্রের — এটি মূর্ছাতুরা মালতীর মুঠি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আবার বসে পড়েন গাছতলায়।

কী আশ্চর্য! মূর্ছাতুরা মালতীর মুঠিতে যা ধরা ছিল তা কোন পুঁথির ছিন্নপত্র নয়! এটি একটি লিপি। মৃত্যুকে বামমুঠায় কব্জা করে মহাপণ্ডিত ঘনশ্যাম তা রচনা করেছেন খাগের কলমে, ভূর্জপত্রে। এটি ঘনশ্যামের শেষ পত্র। সার্বভৌমের স্বেচ্ছায় আত্মহননের স্বীকৃতি পত্র। কিন্তু লিখেছেন তাঁর অহোরাত্রের বন্ধু রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মণঃকে সম্বোধন করে। ভাষা সংস্কৃত কিন্তু লিপ্যক্ষর ব্রাহ্মী। যে লিপ্যক্ষরে সম্রাট অশোক লিখিয়েছিলেন তাঁর যাবতীয় শিলালেখ-অনুশাসন। সম্ভবত সার্বভৌম এ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। যাতে ওঁর পত্রটি কোন অর্বাচীনের হাতে পড়লে সে পাঠোদ্ধার করতে না পারে। বুঝবেন রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য। এবং বুঝবেন মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন:

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো,
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।

বন্ধুবর রূপেন্দ্রনাথ,

আত্মহননের অন্তিম সমাধান ভিন্ন আর কোন পথ ছিল না বলিয়াই এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত। তুমি আমার বাল্য, কৈশোর, ও যৌবনের গোপনকথা জানিয়াছ। নিশ্চয় ভেষগাচার্য হিসাবে প্রণিধান করিয়াছ যে, আমার যে-রোগ — মাঝে-মাঝে আমি যে মানসিক ভারসাম্যচ্যুত হইয়া যাই, — তাহার জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী একটি সর্বব্যাপী সামাজিক কুসংস্কার: সতীদাহ! আমার ব্যক্তিগত জীবনে সে জন্য দায়ী আমার স্বর্গত পিতৃদেব এবং পরমপূজ্য মাতুলশ্রী মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

boiRboi.net

তোমাকে বলিয়াছি, আমি প্রথমবার বিবাহ করি উন্মাদ অবস্থায়। কুশণ্ডিকায় প্রতিজ্ঞা করি নাই, কোন মন্ত্রোচ্চারণের ক্ষমতাই আমার ছিল না। কিন্তু পিতৃদেবের একটি পৌত্রের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাই এই অশাস্ত্রীয় বিবাহের আয়োজন। যেহেতু স্বয়ং দ্বিভুজ জগন্নাথ এ বিবাহ-বাসরে বরকর্তা, তাই এই অশাস্ত্রীয় বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইল।

অভিজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর স্ত্রীকে প্রথম দেখিলাম। সপুত্র! লোকমুখে শুনিলাম, পিতৃদেব সদ্যবিবাহিত দম্পতিকে বিবাহের অব্যবহিত পরে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেখানে সাড়ম্বরে পুরশ্চরণাদি যজ্ঞ করার ফলশ্রুতি হিসাবে আমার অজ্ঞাতে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হন। আমার প্রথমা পত্নী একথা জানিয়াই আমাকে বিবাহ করেন যে, আমি ঘোর উন্মাদ। তিনি মাতুল মহাশয়ের এক ধনবান যজমানের কন্যা। দুর্ভাগ্যবশত মুখে বীভৎস শ্বেতীর দাগ থাকায় তাঁহার কোনও কুলীন পাত্রে বিবাহ হওয়া অসম্ভব ছিল — একেবারে অন্তর্জলিযাত্রার জ্ঞানহারা কুলীন বৃদ্ধ ব্যতিরেকে। কন্যার পিতা তাই আমাকে জামাতা হিসাবে গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন নাই। কৌলীন্যও বজায় রহিল, কন্যাও শাঁখা-সিঁদুর লইয়া সধবার জীবন যাপনের অধিকার পাইল।

তুমি জান, জন্ম-সময়েই আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যু হইয়াছিল। ফলে মাসিমাতার নিকট মানুষ হইয়াছি। আমি পুনরায় উন্মাদ হইলাম আমার পিতার মৃত্যুতে। ততদিনে আমার ক্ষেত্রজ পুত্র বলভদ্র উঠতি জোয়ান। পাইকের সাহায্যে তাহার উন্মাদ পিতাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আমার মাসিমা তথা বিমাতাকে পুড়াইয়া মারিল: সহমরণ! বলাবাহুল্য 'ত্রিবেণীর গর্ব' পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুমতানুসারেই শুধু নয়, বর্বর উপস্থিতিতে। সেবার আমি দীর্ঘদিন উন্মাদ হইয়া রহিলাম। সকলে স্থিরসিদ্ধান্তে আসিল, আমি চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছি। বলভদ্র আমাদের ভদ্রাসনেই একটি কারাকক্ষ বানাইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বেশ কয়েক বৎসর সেখানে পড়িয়া ছিলাম। হয়তো এভাবেই জীবনের শেষ হইত। হইল না! কেমন করিয়া হইবে? মাতুল মহাশয়ের সেই ধনী যজমানের কন্যার তো একটা গতি করা দরকার! ফলে বলভদ্র তাহার বাপের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিল। এবারও উন্মাদ অবস্থায় টোপর পরিলাম, চন্দন-চর্চিত হইলাম এবং কুশণ্ডিকায় মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া হিন্দু বিবাহ করিলাম। কেন করিব না? বিবাহ বাসরে সমস্তক্ষণ খাড়া ছিলেন জগন্নাথ। ঠুঁটো জগন্নাথ নয়। গৌড়মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দ্বিভুজ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন! যজমানের স্বার্থে!

অতিশয় বিস্ময়ের কথা, এবার ফুলশয্যা রাত্রে আমার অভিজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম — নববধূ আমাকে ভয় পাইতেছে না। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, সে পিতৃমাতৃহীনা — মাতুলের অন্নঋণ পরিশোধ করিতে উন্মাদকে বিবাহ করিয়াছে, যে উন্মাদের দেহান্তে সে সহমরণে যাইতেও স্বীকৃতা। স্ত্রী না

হইলে ফুলশয্যার রাত্রে আমি তাহাকে প্রণাম করিতাম, রূপেন্দ্র!

আমাদের বিবাহ দেড় বৎসরও হয় নাই। কিন্তু আমরা পরস্পরকে প্রাণাধিক ভাল বাসিয়াছিলাম। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গঙ্গাফড়িং যেভাবে নিজের অজান্তে ঘাসের রঙ ধরে, আমিও তেমনি আত্মরক্ষার্থেই পাগলের ঢঙ ধরিলাম। নববধূ ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বাহ্যদৃষ্টিতে যে লোকটা বদ্ধ উন্মাদ সে আদৌ পাগল নহে।

বিচিত্র হেতুতে তাহার পর এই দীর্ঘদিন পাগল সাজিয়াই ছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, বলভদ্র বিষপ্রয়োগে আমাকে হত্যার চেষ্টা করিবে। সেজন্যই পাগলের ভেক পরিত্যাগ করি নাই। বাপের দ্বিতীয়বার বিবাহ না দিয়া আমাকে সে হত্যা করিতে পারিতেছিল না; কারণ সেক্ষেত্রে তাহার গর্ভধারিণীকে পোড়াইয়া মারিতে হয়। বলভদ্রের মুশকিল হইল এই যে, বাপের বিবাহ দেওয়ার পর আমাকে বিষপ্রয়োগ করা তাহার পক্ষে কঠিনতর হইয়া পড়িল। নববধূর সতর্কতায়।

এইবার বলি: কেন আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিলাম:

বলভদ্রের প্রতি মাতুলমহাশয় আদৌ প্রীত নহেন। কিন্তু যজমানের কন্যাটিকে রক্ষা করার জন্য তিনি নিরতিশয় যত্নশীল। সেই সূচ্যগ্রবুদ্ধি ত্রিবেণীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতটির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারিলাম বলিয়া সানন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছি! মাতুলশ্রীর গ্রন্থাগারে মা সরস্বতী এবং ধনাগারে মা লক্ষ্মী যুগপৎ বন্দিনী। কিন্তু পুত্রস্থানীয়ের নিকট পরাজয়েই তো শ্রেষ্ঠ আনন্দ! আজ তাই তাঁহারও আনন্দের দিন!

শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে দৃঢ়স্বরে বলিতে পারি: আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী মালতী বর্তমানে চারিমাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমার ক্ষেত্রজপুত্র বলভদ্র তা অপ্রমাণ করিতে উৎকোচ দিয়া একাধিক ধাত্রীর মতামত গ্রহণ করিবে। সেজন্য তোমার উপস্থিতিতেই আত্মহননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। ত্রিবেণীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মতে তুমি বর্তমানে গৌড়মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ভেষগাচার্য। এ কথা আজই তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। তুমি মালতীকে পরীক্ষা করিয়া তথ্যটা সকলকে জ্ঞাত করাইও। বিশেষ, আমার মাতুলকে।

কারণ সেই মহাপণ্ডিত সবিশেষ জ্ঞাত আছেন: মনুসংহিতা-মতে আমার কনিষ্ঠা পত্নী মালতী সহমরণে যাইবার অনধিকারী। নারদীয় পুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে মহামুনি নারদ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন — গর্ভবতী অবস্থায় কেহই সহমরণে যাইতে পারিবে না। টীকাকার ঋষি বৃহস্পতিও একই নির্দেশ দিয়াছেন। বস্তুত ত্রিবেণীর অবিসংবাদিত মহাপণ্ডিত একাধিক ক্ষেত্রে সদ্যমৃতের শ্বশুরকে এই বিধানটি ভূর্জপত্রে লিখিয়া দিয়া বহু আকবরী মোহর প্রণামী লইয়াছেন। তাঁহার যজমানেরা 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি দিতে দিতে বিধবা কন্যাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

অস্যার্থ? আমার প্রথমা পত্নীর ক্ষেত্রজ-পুত্র বলভদ্র যদি ঐ বিষাক্ত দেবোত্তর সম্পত্তিলাভের মোহমুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে একটিই রাজপথ উন্মুক্ত রহিল: পাইক বরকন্দাজের সাহায্যে দাদামহাশয় এবং তস্য গুরুকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আমার মৃতদেহের সহিত স্বীয় গর্ভধারিণীকে চিতায় দগ্ধ করা। সম্ভবত অর্থলোভে সে সতী-মায়ের জয়ধ্বনি দিয়া তাহাই করিবে। করুক! সে দ্বৈরথ সমর আমি দেখিতে পাইব না। দ্বৈরথ-সমর নিঃসন্দেহে। যজমানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্বিভুজ জগন্নাথ বনাম অর্থলোভে মাতৃহত্যায় উদ্যত বহুভুজ বলভদ্র! স্বামী হিসাবে আমার কর্তব্য ছিল সহধর্মিণীকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করা। আক্ষরিক অর্থে তাহাই করিয়া গেলাম।

বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। তাই কিছু দায়িত্ব দিয়া গেলাম:

এক : আমার মুখাগ্নি করিবে দ্বিতীয়া স্ত্রী মালতী — ক্ষেত্রজ পুত্র নহে।

দুই : আমার শ্রাদ্ধাধিকারিণী আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী।

তিন : মালতীকে সোঞাই লইয়া যাইও! লোকলজ্জাকে ভ্রূক্ষেপ করিও না। তাহার প্রসব তুমি নিজে করাইবে। কোন ধাত্রী নহে। মালতী যেন দ্বিতীয়া কুসুমমঞ্জরী না হয়।

চার : মালতীর কন্যাসন্তান জন্মিলে সে তোমার পাঠশালায় পড়িবে। পুত্র সন্তান জন্মিলে তাহাকে ত্রিবেণী পাঠাইও না। পরন্তু নদীয়ায় পরমারাধ্য-মহাত্মা রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিও।.

আমার পরমপূজ্য মাতুল-মহাশয়কে আমার অর্বুদকোটি প্রণাম জানাইও।

কী দুঃখের কথা রূপেন্দ্র। কী অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কথা: বর্ণনিকৃষ্ট' ব্রাহ্মণ-কুলে কেন আমার জন্ম হইল? আহা যদি ম্লেচ্ছ হইতাম! যদি খৃষ্টান হইতাম। মুসলমান হইতাম। নিতান্ত পক্ষে যদি অচ্ছুৎ চণ্ডালবংশে জন্মিতাম (আজ্ঞে হ্যাঁ, মাতুলশ্রী! মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়াইয়া আমি পুনরায় উন্মাদ হইয়া গিয়াছি। আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন!) তাহা হইলে তোমাকে অনুরোধ করিতাম : বন্ধুবর রূপেন্দ্র! তুমি সতীদাহপ্রথা রদ করিয়াই ক্ষান্ত হইও না! বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ব্যবস্থা করিও! স্বয়ং উদাহরণ স্থাপন করিও হতভাগিনী মালতীকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া।

তাহার ন্যায় কল্যাণময়ী, শুচিশুভ্র অন্তঃকরণ, নিঃস্বার্থ প্রেম, নিরলস সেবা —কী বলিব? — দক্ষিণাবর্ত শুক্তির গর্ভে লুকাইত মুক্তার মতোই সুদুর্লভ।

বিদায় বন্ধু!

ঘনশ্যাম দেবশর্মণঃ।।

pathagar.net

রূপেন্দ্রনাথ যখন ত্রিবেণীতে এসে পৌঁছালেন তখন এক প্রহর অতিক্রান্ত। গঞ্জ ও শহরে কর্মচঞ্চলতা শুরু হয়েছে। অশ্বারোহণে তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে পৌঁছে অশ্বটিকে একটি আমগাছের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ করে এগিয়ে এলেন। প্রতিটি শ্রেণীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপন শুরু হয়েছে। সংবাদ নিয়ে জানা গেল, তর্কপঞ্চানন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সেরে অনেকক্ষণ ফিরেছেন। তাঁর আহ্নিক ও প্রসাদ গ্রহণও শেষ হয়েছে। ভদ্রাসন থেকে টোলে আসবার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। রূপেন্দ্রনাথ সেই সময় ওঁর সর্বতোভদ্রে গিয়ে দেখা করলেন।

তর্কপঞ্চানন বললেন, এত সকাল-সকালই ঘনশ্যাম তোমাকে ছেড়ে দিল যে বড়? আহ্নিক হয়েছে?

তারপর রূপেন্দ্রের দিকে ভাল করে তাকিয়েই তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত অনুধাবন করলেন অপ্রত্যাশিত কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে রূপেন্দ্র? তোমাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

রূপেন্দ্র বললেন, মর্মান্তিক দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, গুরুদেব। কাল শেষ রাত্রে সার্বভৌম দেহত্যাগ করেছেন।

—দেহত্যাগ করেছে! বল কী! ঘনশ্যাম? কিন্তু তার স্বাস্থ্য তো...?

—ঘনশ্যাম আত্মহত্যা করেছে! উদ্বন্ধনে!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পণ্ডিতজী। সংবাদটা পরিপাক করতে কিছুটা সময় লাগল। তারপর নিম্নস্বরে বললেন, তুমি নিঃসংশয়? আত্মহত্যাই? অন্য কিছু নয়?

—অন্য কিছু?

—মৃত্যুর পরে তাকে কেউ কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেয়নি?

—আজ্ঞে না, হত্যা নয়। সার্বভৌম্য সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে। একটি স্বীকৃতিপত্রে সে আমাকে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে গেছে। সেটি জাল-পত্র হতেই পারে

না; কারণ লিপ্যক্ষর ব্রাহ্মী-হরফ, ভাষা সংস্কৃত। আপনি-আমি এবং লেখক ব্যতীত সে জাতীয় পত্র এ অঞ্চলে কেউ রচনা বা পাঠ করতে পারবে না।

—স্বীকৃতিপত্রটি কি সে তোমাকে লিখেছে, না আমাকে?

—আমাকেই লিখেছে। তবে পত্রে সে অনুরোধ করেছে সেটি আপনাকে দেখাতে।

রূপেন্দ্রনাথের হাত থেকে ভূর্জপত্রগুলি — বাবলার কাঁটায় পৃষ্ঠাগুলি পরপর গ্রথিত — নিয়ে জগন্নাথ ধীরে ধীরে পাঠ করতে থাকেন। সৌজন্যবোধে নিঃশব্দে রূপেন্দ্রনাথ গৃহদ্বার অতিক্রম করে বাহিরের টানা-বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। ঘনশ্যাম তাঁর মাতুলকে অর্বুদকোটি প্রণাম জানিয়েছেন বটে কিন্তু মৌলবাদী মামার অন্যায় আচরণের জন্য তাঁকে শ্লেষাত্মক শাণিত ভাষায় বারংবার তীরবিদ্ধ করতেও পরাঙ্মুখ হননি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দ্বারের কাছে সরে এসে বললেন, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে।' অত বড় মহাপ্রাণ অকালে চলে গেল। ওর যদি ঐ জাতির ব্যাধি না থাকত, আমি নিশ্চিন্ত বলতে পারি রূপেন, ও রঘুনন্দনের সমপর্যায়ের পণ্ডিত হয়ে উঠত।... সে যাই হোক, তুমি কি বৌমাকে পরীক্ষা করে দেখেছ?

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে শতকরা শতভাগ সুনিশ্চিত না হলে ঘনশ্যাম ও-কাজ করত না।

—তা বটে! তাহলে চল, এখনি বেরিয়ে পড়ি। তুমি কালিপদকে বল পালকি বাহকদের খবর দিতে। সতী-মা গাঁয়ে যাব। তুমিও যাহোক কিছু মুখে দিয়ে নাও। আমাদের ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল, জগন্নাথ একটি টাকার থলি কোমরে গুঁজে নিলেন। কার্যকারণসূত্র বোঝা গেল না, কারণ দাহকার্যের জন্য বলভদ্রের নিশ্চয় অর্থের প্রয়োজন হবে না।

অর্ধদণ্ডের মধ্যেই দুজনে পুনরায় রওনা দিলেন সতী-মা তালুকের অভিমুখে। আট বেহারার কাঁধে পালকিতে তর্কপঞ্চানন এবং অশ্বপৃষ্ঠে রূপেন্দ্রনাথ। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই পালকি অন্য এক ভিন্ন পথে বাঁক নিল। রূপেন্দ্র বাধা দিলেন না। পথ জগন্নাথ খুব ভাল ভাবেই চেনেন; এ-দিকে মোড় নেওয়ার নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। একটু পরেই কী-এক গাঁয়ে উঁচু পাঁচিল-দিয়ে-ঘেরা একটি ধনিক ব্যক্তির গৃহের কাছাকাছি পালকি নামানো হল। দশরথ লাঠিয়াল — জগন্নাথের নিত্যসঙ্গী দেহরক্ষী — ঐ খোকামের দিকে এগিয়ে গেল। উড়ুনি-কাঁধে তর্কপঞ্চানন পাল্কির বাহিরে এসে খড়ম খটখট করতে করতে এগিয়ে এসে বসলেন একটি অশ্বত্থগাছের বাঁধানো বেদিমূলে। রূপেন্দ্র কোনও কৌতূহল প্রদর্শন করলেন না। তিনি জানেন, এ-সব ক্ষেত্রে কেউ কৌতূহলী হলে পঞ্চাননঠাকুর বিরক্ত হন। একটু পরেই গৃহাভ্যন্তর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন একজন মুসলমান বৃদ্ধ ভদ্রলোক। নগ্নগাত্রে, লুঙ্গি পরিধান করে। এক মুখ পাকা দাড়ি, এক বুক পাকা চুল। এগিয়ে এসে বললেন, সেলাম আলেকম ঠাকুরমশাই! আপনে এই সাত-সকালে? হইছেডা কী? তা আমারে টুক ডাক দিলিই তো হাজির হতাম আমি।

জগন্নাথ বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি তাই নিজেই চলে এসেছি, হাজী-সাহেব। এ দিকে সরে আসুন। আমি চাই না কথাটা পাঁচ কান হোক।

'হাজী-সাহেব' বলে যাঁকে ডাকলেন, সেই বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন, স্পর্শ-বাঁচানো ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে। পঞ্চানন-ঠাকুর তাঁকে নিম্নস্বরে কিছু বললেন। বৃদ্ধ ঘনঘন শিরশ্চালনে স্বীকৃত হলেন। তারপর পিছন ফিরে গৃহাভিমুখী হতেই জগন্নাথ ওঁকে আবার ডাকলেন। বললেন, ছেলেমেয়েদের কিছু মিষ্টি খেতে দেবেন।

বলে, সিক্কা টাকা-ভর্তি থলিটা আলগোছে ওঁর হাতে ফেলে দিলেন। হাজী-সাহেব বললেন, আরে এসব কী-কাণ্ড! এর কোনও প্রয়োজন আছিল না ঠাকুরমশাই। তবে পোলাপানদের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য দিচ্ছেন, আমি আপত্তি করনের কে?

বৃদ্ধ গৃহে ফিরে যেতেই একটি ছোট ছেলে ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তার দু-হাতে দুটি ছাড়ানো ডাব; কিন্তু মুখ-কাটা নয়। বগলে কাটারি। দশরথ ছেলেটির হাত থেকে ডাব কাটারি নিয়ে মুখ কেটে জগন্নাথ ও রূপেন্দ্রকে দিল। ওঁরা মুসলমান বাড়িতে জাতি-বাঁচানো সৌজন্য রক্ষা করলেন। তারও কিছুক্ষণ পরে হাজী-সাহেব ফিরে এসে জগন্নাথের পাশে স্পর্শ-বাঁচানো একটি পত্র দাখিল করলেন। জগন্নাথ সেটি তুলে নিয়ে তাঁর হাত-বটুয়ায় রাখলেন।

হুম্‌ব্রো-হুম্‌ব্রো রবে পাল্‌কি চলল সতী-মা তালুকে।

তালুকদারের বাড়িতে লোকে-লোকারণ্য। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে খবর পেয়ে মানুষজন ছুটে আসছে। সতীমায়ের স্বর্গারোহণ দেখতে। যারা জীবনে কখনো মিছে কথা বলেনি, কোন পাপ কাজ করেনি, তারা স্বচক্ষে দেখতে পায় স্বর্গ থেকে রথকে নেমে আসতে — চিতা থেকে সতী-মাকে তুলে নিয়ে আবার স্বর্গের সেই সোনার রথ স্বর্গে ফিরে যায়। অধিকাংশ দর্শকই তা আবছা দেখতে পায় ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে। না-হলে যে মেনে নিতে হয় তারা মিছে-কথা বলে থাকে।

তর্কপঞ্চাননের পালকি এসে থামল তালুকদারের বাড়ির সামনে। ভিড় দু-ফাঁক হয়ে গেল ওঁর পরিচয় পেয়ে। ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল বলভদ্র — নগ্নপদ, নগ্নগাত্র — সে এসে হাউমাউ করে কী বলল তা বোঝা গেল না।

জগন্নাথ দৃঢ়হস্তে তার বাহুমূল চেপে ধরে বললেন, চল। ভিতরে চল। তোমার ঘরে। এ সময় কি অত উতলা হলে চলে? এস...

বলভদ্রের ঘরে এসে উনি একটি কেদারায় বসলেন। বলভদ্র ভূশয্যাতেই কম্বলের টুকরো পেতে বসল। বলল, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল, দাদু!

সে-কথার জবাব না দিয়ে জগন্নাথ প্রশ্ন করলেন, কোতোয়ালিতে খবর দিয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়-দারোগা ঘোষাল-সাহেব এসেছিলেন। স্বচক্ষে দেখে চলে গেছেন। তাঁর পার্বণীও মিটিয়ে দিয়েছি। দাহ করার অনুমতি দিয়ে গেছেন।

—কোথায় ফিরে গেলেন তিনি? কোতায়ালিতে, না নিজের মোকামে?

—আজ্ঞে না। উনি বললেন শ্মশানে অপেক্ষা করবেন। শ্মশানকালীর পূজা করবেন।

দাহকার্য হয়ে গেলে সব মিটিয়ে বাড়ি যাবেন। সহমরণের ব্যাপার তো! বড় হুজ্জোৎ হয়! প্রতিবারই তিনি তাই করেন। কাজী-সাহেবের তাই নির্দেশ।

জগন্নাথ বলেন, একটা গোপন কথা বলব বলে তোমাকে আড়ালে ডেকেছি বলভদ্র! ছোট বৌমা মালতী গর্ভিণী। সে তো সহমৃতা হতে পারবে না। শাস্ত্রে সেরকম নির্দেশ নেই।

বলভদ্রের চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, কে বলেছে?

—তোমার বাবা আত্মহত্যা করার আগে একটি স্বীকৃতিপত্রে তা জানিয়েছেন।

—আমি বিশ্বাস করি না। এ ছিরু পালের ষড়যন্ত্র! কই, দেখি সেই স্বীকৃতিপত্র?

জগন্নাথ তাঁর পুঁটলি থেকে ভূর্জপত্রটি বার করে দেখালেন। বললেন, যে ভাষায় লেখা তা তোমার বোধগম্য হবে না, বাবা। কিন্তু আমার কথাটা মেনে নাও বলভদ্র!

—মেনে নেব? আপনার কথা মেনে নেব? মেনে নিয়ে কী করব? বুড়ো আঙুল চুষব? আর ইদিকে অবস্থাটা নিজ চোখে এসে দেখুন।

এবার জগন্নাথের বাহুমূল পাকড়াও করে বলভদ্রই ওঁকে নিয়ে এল অন্দর-মহলে। উঠোনের মাঝখানে একটা চৌকির উপর বসানো হয়েছে একটি জলচৌকি। যাতে দর্শকদের দৃষ্টিপথে বাধা না পড়ে। তার উপর বসে আছে মালতী। একবস্ত্রা। লালপাড় পট্টবস্ত্র। তার পায়ে আলতা, হাতের তালুতে আলতা, মাথায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত লালে-লাল সিন্দুর। এয়োস্ত্রীরা তাকে ঘিরে আছে। শাঁখ বাজাচ্ছে, মাঝে-মাঝে হুলুধ্বনি দিচ্ছে। নিজ নিজ সৌভাগ্য সিন্দুরের কৌটা মালতীর পায়ে ছুঁইয়ে নেবার জন্য হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। কাঁসর-ঘণ্টার ঠ্যাঙাঠ্যাঙ লেগেই আছে।

বলভদ্র বললে, এখন ও-কথা কে শুনবে বলুন? শেষে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে, দাদু! এরা অনেকেই এসেছে ভিন গাঁ থেকে। এখনো সার দিয়ে গো-গাড়ি আসছে তো আসছেই! আমার এতবড় বুকের পাটা নেই যে, এখন গিয়ে ওখানে বলব — ছোট মা সতী হবেন না! তাঁর 'পেট' হয়েছে!

—তুমি না পারলে আমি বলব। আমার কথা ওরা মেনে নেবে। তুমি চিন্তা কর না।

—কিন্তু ছোট-মা সতী না হলে তালুক যে আমাদের বেহাত হয়ে যাবে দাদু?

—তা তো যাবেই। যদি না... ভাল কথা, তোমার গর্ভধারিণী জননী কোথায়?

—তিনি সকাল থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সান নেই।

—রূপেন্দ্রনাথকে বলব গিয়ে দেখতে?

—না না! ভয়ের কিছু নেই। জ্ঞান আপনিই ফিরবে। আপনি ইদিকে বরং সরে আসুন। কতা আছে।

জনান্তিকে পুনরায় জগন্নাথকে টেনে এনে বলভদ্র বললে, আপনি আর অমত করবেন না, দাদু! কাকপক্ষীতে জানে না যে, ছোট-মার পেটে বাচ্চা। ওঁর মামাকে আমি অনেক টাকা গুনে দিয়েছি — শুধু এই দিনে এই উগ্গারটি করার জন্যই! যারা সিঁদুর সংগ্রহ করতে এসেছে তারা বামুনবাড়িতে রীতিমতো প্রণামী দিয়েই সিঁদুর সংগ্রহ করছে। অনেকে সিঁদুর নিয়ে চলেও গেছে! তারা ছাড়বে কেন? শেষে লাঠালাঠি শুরু হয়ে যাবে!

pathagar.net

জগন্নাথ দৃঢ়স্বরে বলেন, বলভদ্র! আমি যখন নিদান হেঁকেছি তখন তার আর কোন পরিবর্তন হবে না। তোমার ছোটমা মালতী বৌমা সহমরণে যাবেন না। এখন কী-করবে? সম্পত্তির আশা ত্যাগ করবে, না গর্ভধারিণীকে পোড়াবে? কী চাও তুমি?

বলভদ্র তৎক্ষণাৎ নিজমূর্তি ধারণ করল। বলল, তিনি শুধু আমার গব্বোধারিণী? না কি আপনারও যজমানের মেয়ে?

—হ্যাঁ তাই। দুটোই সত্য। সে জন্য আমার পরামর্শ: সম্পত্তির আশা তুমি ত্যাগ কর। ঘনশ্যামের সঙ্গে কেউই সহমরণে যাবে না।

বলভদ্র বললে, ইল্লি! ভাববেন না আমি তৈরি নই। আপনার ঐ দশরথ লেঠেলকে দরকার হলে আমার বাপের সঙ্গে চিতেয় তুলে দিতে পারব। এমন আশঙ্কা ছিলই। তবে আমার আন্‌জাদ ছিল বাধা দিতে আসবে ছিরু পাল। এই তালুকটার উপর তার অনেকদিনের নজর। শুনুন, পঞ্চানন-ঠাকুর! ইদিক-উদিক খরচপাতি যা করার করেছি। একশ লেঠেল মোতায়েন করেছি কাজোদ্ধারের জন্যে! সুতরাং ঐ নিদেন-হাঁকার কেরামতি আপাতত ছিকেয় তুলে রেখে বাড়ি যান। ছোট-মার যে পেট হয়েছে, তা আম্মো আন্‌জাদ করেছি। তবে কতাটা এখনো পাঁচ কান হয়নি। কাক-পক্ষীতে টের পাবে না। রোদের তেজ বাড়ছে। আপনি দয়া করে বাড়ি যান।

—তুমি আমার কথাটা শুনবে না?

—আমার বাপ পাগল ছিল মানছি! আম্মো তো পাগল নই।

জগন্নাথ আর কথা বাড়ালেন না। উঠে পড়লেন। প্রতিবেশী গ্রামের সধবা মহিলারা তখনো সার বেঁধে অন্দরের দিকে চলেছেন। বলভদ্র পিছন থেকে বললে, মনে করবেন না ঠাকুর যে, আপনারে অচ্ছেদ্দা করছি। অশৌচ চলছে, তা নইলে ত্রিবেণীর পঞ্চাননঠাউরকে এট্টা পেন্নম অন্তত করতাম!

জগন্নাথ বললেন, চলে এস রূপেন। ও আমার কথা শুনবে না।

রূপেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বললেন, এই অনাচারের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করব না?

জগন্নাথ পাল্‌কিতে উঠে বসেছিলেন। বললেন, তুমি আমার সঙ্গে আসবে, নো এখানেই তামাশা দেখতে থেকে যাবে?

রূপেন্দ্রনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বারোহণ করলেন।

জগন্নাথের নির্দেশে পাল্‌কিটা এসে থামল শ্মশানে। একটা প্রকাণ্ড গোলকচাঁপা গাছের তলায়। জগন্নাথ পাল্‌কি থেকে নেমে দশরথকে ডেকে বললেন, দেখ তো রে দশরথ। ঘোষাল দারোগা ঘাটে আছে কি না। শ্মশানকালীর পুজো দিতে এসেছে। অর্থাৎ মদ গিলতে। শিবঙ্গ কে চিনিস তো?—শ্মশান-চণ্ডাল —ও বলতে পারবে।

অনতিবিলম্বেই বড় দারোগা সহদেব ঘোষালকে নিয়ে দশরথ ফিরে এল। সহদেব যথারীতি এই সাত সকালেই শ্মশানকালীর ঠাঁঞে কিছু কারণবারি পান করেছে — বলভদ্রের হাত থেকে এক মুঠো কাঁচা সিক্কাটাকা পেয়ে। কিন্তু ত্রিবেণীর পঞ্চানন ঠাকুরকে চিনতে ভুল হবার মতো নয় সে নেশার পরিমাণ। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললে, শ্মশানে এয়েছেন কেন,

দ্যাবতা? আমারে এট্টু জানান দিলেই তো আপনার ঠাঁয়ে দৌড়ে যেতাম।

জগন্নাথ আঙরাখা থেকে এক-টুকরো কাগজ বার করে ঘোষালের হাতে দিলেন। বললেন, পড়তে পারবে? না পড়ে শোনাব?

—আজ্ঞে না! কী যে বলেন ঠাউর! এ তো কাজী-ছায়েবের হুকুমনামা। র'ন, পড়ে দেখি।

চিঠিখানা কিছুটা পড়ে সে রক্তাক্ত ঘোলাটে চোখদুটো জগন্নাথের মুখে মেলে বললে, আম্মো তাই আন্দাজ করেছিলাম। শালা, বাপকে খুন করে ফাঁসিতে লট্‌কেছে। এখন কী করণীয়?

—দেখ, গোটা চিঠিটা পড়ে দেখ। কাজীসাহেবই তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘোষাল বললে, কিছু মনে করবেন না ঠাউর-মশাই, কাজী-সাহেবের হাতের লেখাটা বড্ড জড়ানো। মনে লাগে, পুরো বোতল কালীমার্কা সেবন করে তারপর খাগের কলম হাতে নিয়েছিলেন। আর তাছাড়া এই উল্টোমুখো ফার্সি হরফগুলো...

জগন্নাথ ওর হাত থেকে চিঠিখানা ফেরত নিয়ে পড়ে শোনালেন। কাজী-সাহেব বড় দারোগার উপরওয়ালা। হজ সেরে এসেছেন বলে সবাই কাজীর বদলে ওঁকে হাজী বলে। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বড় দারোগাকে নির্দেশ দিচ্ছেন : "আশঙ্কা করার যথেষ্ট হেতু বর্তমান যে, পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভাগীনেয় উন্মাদ ঘনশ্যাম সার্বভৌমকে সম্পত্তির লোভে তস্যপুত্র বলভদ্র কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। এবং তৎপরে ফাঁস রজ্জু হইতে ঝুলাইয়া দিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে যে ঘনশ্যাম আত্মহত্যা করিয়াছেন। ফলে শ্মশানযাত্রীরা শ্মশানে উপস্থিত হওয়ামাত্র আসামী বলভদ্রকে গ্রেপ্তার করিবে। ঘনশ্যাম সার্বভৌমের কনিষ্ঠা পত্নী মুখাগ্নি এবং শ্মশানের যাবতীয় কৃত্যাদি করিবেন। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আদেশানুসারে ঐ বিধবা সহমরণে যাইবার অধিকারী নহেন। ঘনশ্যামের প্রথমা পত্নীকেও যেন সহমরণের জন্য চিতায় তোলা না হয়। ঘোষাল দারোগা স্বয়ং শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া এই দাহকার্য সুসম্পন্ন করাইবেন। ইতি—"

জগন্নাথ বললেন, শোন ঘোষাল। আমার এই ছাত্র ও শিষ্য রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য তোমাকে সাহায্য করতে শ্মশানেই থেকে যাবেন। তুমি তোমার একটি পাইক কোতোয়ালিতে পাঠিয়ে দাও। কিছু বন্দুকধারী সেপাই আনাবার বন্দোবস্ত কর। বলভদ্রের সঙ্গে শতখানেক লাঠিয়াল আসবে। শ্মশানযাত্রীদের আসতে দেখলে প্রথমেই আকাশের দিকে দু-চারটা ফাঁকা আওয়াজ করবে। তাতেই ওদের ঢোল-কাঁসির বাদ্য থেমে যাবে। তখন সরকারি আদেশটা ঘোষণা করবে। বলভদ্রকে হাতকড়া পরাবে, মাজায় দড়ি দেবে। তাহলেই ওর লেঠেলরা থমকে যাবে। স্ত্রীলোকদের জানিয়ে দেবে নবাবী ফর্মান অনুযায়ী মৃতের কোন স্ত্রী সতী হতে পারবেন না। ...আমি ত্রিবেণী ফিরেই এই পাল্‌কিটা পাঠিয়ে দেব। দাহকার্য সম্পন্ন হলে বলভদ্রকে চালান দেবে আর মালতী — অর্থাৎ সদ্যোবিধবাকে — আমার পাল্‌কিতে করে ত্রিবেণী পাঠিয়ে দেবে। পাল্‌কির সঙ্গে আসবে একজন বন্দুকধারী সেপাই আর আমার শিষ্য রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য। ঠিক ঠিক মতো বুঝতে পেরেছ তো?

ঘোলাটে চোখ মেলে ঘোষাল দারোগা পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললে, প্রভু! আমার অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছেন। বুঝতে কিছু ভুল হলে কোবরেজ-মশাই শুধরে দেবেন। উনি তো রইলেনই।

—হ্যাঁ, আমার অবর্তমানে ওর আদেশই আমার আদেশ। আর, ও, হ্যাঁ — ঘোষাল! ঘনশ্যামের শ্রাদ্ধ আমার ভদ্রাসনেই হবে। তুমি সপরিবারে নিমন্ত্রণ রাখতে আসবে। তোমাকে যাতে ভালমতো ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, সেটা আমি দেখব।

ঘোষাল বললে, জয় জগন্নাথ প্রভু।

দিন-দশেক পরের কথা। আজ ঘনশ্যাম সার্বভৌমের আদ্যশ্রাদ্ধ। নিজ বাটিতে নয়, মাতুল-মহাশয়ের ভদ্রাসনে। জগন্নাথ বেশ বড় মাপের আয়োজনই করেছেন। ত্রিবেণীর পণ্ডিতেরা সকলেই চিনতেন ঘনশ্যাম সার্বভৌমকে —জগন্নাথের ভাগিনেয় বলে শুধু নয়, অসাধারণ সম্ভাবনাময় এক নবীন পণ্ডিত হিসাবে। সুতরাং নিমন্ত্রিতের তালিকাটি সুবৃহৎ হয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী জনপদ থেকেও অনেক এসেছেন। স্বর্গত পণ্ডিতের দুই বিধবাই উপস্থিত — কারও সহমরণে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু বলভদ্র অনুপস্থিত। না, কারাগারে সে আবদ্ধ নেই। ঘনশ্যামের পূতাস্থি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেবার পর বড়-দারোগা কাজী-সাহেবের আদেশে বলভদ্রকে মুক্তি দেন। ইতিমধ্যে জানা গেছে, ঘনশ্যাম আত্মহত্যাই করেছেন। হত্যার ঘটনা এটি নয়।

বলভদ্র মুক্তি পেয়ে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সে নাকি যাবার আগে বলে গেছে, ছেরাদ্দ করার দায় আমার নয়। যে পাগলটা পটল তুলেছে সে আমার বাপ ছিল থোড়াই!

শ্মশানে মৃতের মুখাগ্নি করেছিল মালতী। তর্করত্ন মশাই একটা ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিলেন — পুত্রের অবর্তমানে, পৌত্র বা নিকট আত্মীয় শ্মশানে উপস্থিত না থাকলে মৃতের স্ত্রী মুখাগ্নি করতে পারেন বটে; কিন্তু গর্ভিণী অবস্থায় তা পারেন না। যে-কারণে সদ্যোবিধবাকে সহমরণে তোলা গেল না, সেই হেতুটাই এ-ক্ষেত্র বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতান্তর দেখা দেয়। মালতী রূপেন্দ্রনাথকে জনান্তিকে জানিয়েছিল, স্বামীর শেষ ইচ্ছা সে ঐকান্তিকভাবে পূরণ করতে ইচ্ছুক। তাই রূপেন্দ্রনাথ পণ্ডিতদের বাধা দিয়ে বলেছিলেন, দেখুন, আপনারা সকলেই মহামহা পণ্ডিত। কিন্তু এই বিধানটি দিয়ে গেছেন আমার পূজ্যপাদ

BanglaBook.org

গুরুদেব স্বয়ং পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। আপনাদের কারও যদি ভিন্ন মত থাকে—

পণ্ডিতেরা একযোগে বলে ওঠেন, সে-ক্ষেত্রে তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নিশ্চয় কোনও সংহিতায় বিকল্প কোন সূত্র আছে, যা আমাদের জানা নেই। তবে আর বিলম্বে কাজ কী? মুখাগ্নির আয়োজন করা হোক!

মালতীই মুখাগ্নি করেছিল, ঘনশ্যাম পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবার পর চিতায় জলও ঢেলে দিয়েছিল।

ঘনশ্যামের প্রথমা পত্নীর মূর্ছা সারাদিনেও ভাঙেনি।

শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এলে তিনি মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি পেলেন।

ছোট-জা বহাল তবিয়তে ত্রিবেণী চলে গেছেন। তার পরিবর্তে বলভদ্রকে ফাটকে পাঠানো হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তাঁর মূর্ছাভঙ্গ হল।

বিধবার শাঁখা-নোয়া অপসারণের পর বড় বধূমাতার পিতৃদেব তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন।

শ্রাদ্ধ-বাসরে দুই বিধবাই উপস্থিত। তর্কপঞ্চাননের নির্দেশে কনিষ্ঠাই শ্রাদ্ধ করছে। এবার আর ঐ প্রশ্নটা কেউ তুলতে সাহসই পাননি: গর্ভিণী অবস্থায় কোনও সদ্যোবিধবা শ্রাদ্ধাধিকারিণী হতে পারে কি না।

রূপেন্দ্রনাথের কাছে অধিকাংশ নিমন্ত্রিতই অপরিচিত। তর্কপঞ্চাননের অযুত-নিযুত শিষ্য। 'ভূতে আনে গন্ধর্বে বয়' নীতিতে শ্রাদ্ধবাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম এগিয়ে চলেছে। মালতী মানসিক স্থৈর্য হারায়নি। এ-কয়দিন প্রাণভরে কেঁদে নিয়ে আজ সে দাঁতে-দাঁত দিয়ে স্বামীর শেষ কাজ করতে বসেছে। তার মামা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। ভাগ্নীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেননি। তার কতটা বেদনায়, কতটা লজ্জায়, তা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু ওর তিন মামাতো বোন ওকে জড়িয়ে ধরে যখন হু-হু করে কেঁদে উঠল, তখন মনে হল — দিদি বিধবা হওয়ায় ওরা যতটা ব্যথিত, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি দিদি জ্বলন্ত চিতা থেকে ফিরে আসায়। দিদিকে ওরা সবাই প্রাণাধিক ভালবাসত।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সর্বতোভদ্র গঙ্গার ধারে, প্রায় বিশ বিঘা জমির উপর। তার একদিকে চতুষ্পাঠী, এক দিকে টোল। এক প্রান্তে মন্দির, পুষ্করিণী, অপর প্রান্তে আমবাগান। ঐ আম-বাগানের একান্তে পণ্ডিতের ভদ্রাসন। রূপেন্দ্রনাথ একটু ফাঁকায় গিয়ে একটি উঁচু টিলার উপর একটি ছাতিম গাছের ছায়ায় এসে বসলেন। সম্ভবত এখানে একটি পৃথক মাটির ঘর ছিল। সূতিকাগৃহ কি? কয়েক দশক আগে তা ভূমিসাৎ হয়েছে। তারই ভগ্নস্তূপের উপর গজিয়েছে এই সপ্তপর্ণীর গাছটি।

একটা অপরিসীম নির্বেদে মনটা আজ ওঁর ভারাক্রান্ত। কাশীধাম থেকে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন গৌড়মণ্ডলে। ফরাসীডাঙ্গায় পৌঁছেই খেলেন প্রথম ধাক্কাটা। আত্মজাকে বুকে জড়িয়ে ধরার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। চোখের দেখাও দেখতে দিলেন না ভবতারণ গাঙ্গুলী। বললেন, তাহলে নাকি শিশুর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। রূপেন্দ্র দরবার করতে গেলেন নদীয়ারাজের কাছে। সুবিধা হল না। রাজমহিষী জানিয়ে দিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের বিপক্ষে। অর্থাৎ ভবতারণের সপক্ষে। তারপর উনি ছুটে এলেন ওঁর গুরুদেবের কাছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 'নিদান হাঁকলে' গৌড়মণ্ডলে কেউ তার প্রতিবাদ করতে সাহসী হবে না। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলেন রূপেন্দ্রনাথ। গুরুদেব ওঁকে শর্ত-সাপেক্ষে সমর্থনে স্বীকৃত। শর্তটি মারাত্মক: বিপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণটিকে পুনর্বিবাহ করতে হবে। ভবতারণ গাঙ্গুলীর কন্যাটিকে পছন্দ না হলে গুরুদেব তাঁর গণনাতীত যজমানের ভিতর থেকে কুলীনঘরের একটি রাঢ়ী শ্রেণীর ভিন্নগোত্রের সর্বগুণান্বিতা কুমারীকে নির্বাচন করে দিতে চাইলেন। রূপেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করায় গুরুদেবও মুখ ফেরালেন।

ইতিমধ্যে নানান দুঃসংবাদও পেয়েছেন: জগুঠাকরুণ স্বর্গে গেছেন। রূপেন্দ্রের অন্তঃকরণে ঐ বৃদ্ধার প্রতি একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা ছিল। পিসিমাতা ঠাকরুণ সকন্যা ভাইয়ের সংসারে ফিরে এসেছিলেন তাঁর স্বামীর জীবিতকালেই। এমনকি স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও শ্বশুরালয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাননি। সোঞাই গাঁয়েই শাঁখা-সিন্দুর ঘুচিয়ে থান পরে কন্যা কাত্যায়নীকে দিয়ে পৃথকভাবে চতুর্থীশ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন।

হেতুটি সমকালীন বিচারে সামান্য অথচ রূপেন্দ্রনাথের বিচারে অসামান্য। পিসিমার এই বিদ্রোহের হেতু বৃদ্ধ বয়সে পিসেমশাই একটি পঞ্চদশীকে দ্বিতীয় পক্ষে ঘরে এনেছিলেন। সে আমলে অভিযোগটা ছিল হাস্যকর। গ্রামশুদ্ধ মহিলা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল: ওমা, আমি কনে যাব! কুলীন বামুন — আড়াইকুড়ি বয়সে মাত্তর দ্বিতীয়-পক্ষ করল, আর তাও সইলনা বুড়ি জগুঠাকরুণের!

সেই তেজদীপ্তা জগুঠাকরুণ দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছেন। বার্তাটা শুনতে হল ভবতারণের ভর্ৎসনা এবং ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে! রূপেন্দ্র জানেন না, কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছে। খঞ্জ-গঙ্গারামের হাত ধরে কাত্যায়নী আগে ভিনগাঁয়ে চলে গেছে, না আগেই জগুঠাকরুণের সব জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। প্রথমটি সত্য হলে বিধবা কি শেষ সময়ে এক ফোঁটা জলও পাননি? কে তাঁর শবদাহ করল? কে শ্রাদ্ধ করল? কিছুই জানেন না।

হতাশা যখন সব দিক থেকে জড়িয়ে ধরেছিল তখন নিতান্ত ঘটনাচক্রে লাভ করলেন এক অপ্রত্যাশিত অসাধারণ বন্ধুকে! এই মৌলবাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে প্রথম সাক্ষাৎ পেলেন একটি মানুষের যিনি, আধুনিকতায় বোধ করি রূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও কয়েক-দশক এগিয়ে।

রূপেন্দ্রনাথ কখনো আক্ষেপ করতে পারতেন না: 'কেন ম্লেচ্ছ হইলাম না, কেন মুসলমান হইলাম না, অন্ততপক্ষে কেন অচ্ছুৎ চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিলাম না...'

কিন্তু, ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। মাত্র একদিনের ঘনিষ্ঠতায় দুজনে-দুজনের প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠলেন। আবার একরাত্রির অন্তেই এল চিরবিচ্ছেদ। ছাতিম গাছতলার বসে বসে রূপেন্দ্রনাথ চিন্তা করছিলেন, সেদিন কী-কী বিষয়ে দুজনের আলোচনা হয়েছিল। গৌড়মণ্ডলে বালিকাদের জন্য প্রথম পাঠশালা খোলা হলে — যদি আদৌ খোলা সম্ভবপর হয় — তবে পাঠ্যসূচী কী হবে? সেখানে শিক্ষালাভ করতে আসবে কারা? — শুধুই ব্রাহ্মণ কন্যা? শুধুই

বর্ণহিন্দু? জল-অচল অচ্ছুতের ম্লানমুখী আত্মজার দল কি সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হবে?

—এই শোন, তুমি আমাদের বুড়ি হবে?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল মধ্যপথে। দেখলেন, শিক্ষাবঞ্চিতা ম্লানমুখী বালিকার দল মুহূর্তে এক ঝাঁক প্রজাপতিতে রূপান্তরিতা হয়ে গেছে। প্রশ্নটা যে পেশ করেছে সে একটি বালিকা। হিমালয়-দুহিতা উমা-মাকে বোধ করি এমনিই দেখতে ছিল, তিন-চার বছর বয়সে। অথবা মা গঙ্গাকে, গোমুখ-গঙ্গোত্রীর উৎসমুখে। উপলবন্ধুর ঝরনার মতো ওরা ঘনিয়ে এসেছে রূপেন্দ্রনাথের চারিদিকে। রূপেন্দ্রনাথের যে ধ্যানভঙ্গ করেছে তার নাকে মুক্তোর নোলক, কপালে জড়োয়া টায়রা, গলায় সোনার হার, পরনে বিচিত্র ফ্রক। মসলিনের কাপড় কিন্তু উবুড়-করা-গামলার মতো তা ফুলে ফুটে আছে। রূপেন্দ্রনাথ ফরাসী-গাউন জীবনে দেখেননি। ফুটফুটে সুন্দরী। আধফোটা কমলকলির মতো গাত্রবর্ণ। আর সব চেয়ে অবাক-করা ওর দুটি... কিন্তু এ কী! এই ভ্রমরকালো চোখ দুটি কেন এত চেনা চেনা লাগছে? আর দেবীপ্রতিমার মতো মুখের ডৌলটা?

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বল্‌লে? কী চাইলে তুমি?

—কতা বোঝ না? বলি-কি: তুমি বুড়ি হবে?

রূপেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, তা কেমন করে হব, মা? বুড়ো হতে পারি যদি বছর ত্রিশ-চল্লিশ অপেক্ষা কর; কিন্তু 'বুড়ি' হব কোন মন্ত্রবলে?

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। আবার চমকে ওঠেন! ঐ হাসির ঝরনার শব্দটাও যেন খুবই পরিচিত! এ ঝরনার জলে যেন স্নান করেছেন কোন বিস্মৃত অতীতে। শিশু গিরিরাজসুতা বললে, তুমি এত বোকা কেন গো? আমি কি তোমারে খুনখুনে জটিবুড়ি হতে বলেচি? 'বুড়ি'! মানে গোল্লাছুট খেলার বুড়ি। আমরা দৌড়ে এসে শুধু তোমারে ছোঁব। ব্যস!

—শুধু ছোঁবে? তাহলে আমি রাজি নই। বল, গালে চুমু খাবে?

মেয়েটি হতাশ হয়। বিরক্তও। সঙ্গিনীদের বলে, এ বোকাডারে দে হবেনি। আমি কী বলনু আর এ কী বলছে!

ওর পাশের মেয়েটি বলে, চল হটি, আমরা অন্য আর কারেও পাকড়াও করি।

রূপেন্দ্রনাথ ওর হাত ছাড়েননি। বলেন, 'হটী'! তোমার নাম বুঝি হটী? কী বিদঘুটে নাম গো তোমার। 'হটী' কখনো এমন একটি ফুটফুটে মেয়ের নাম হতে পারে?

মেয়েটি তার টোবলাগালে আঙুল ঠেকিয়ে বললে, কী বোকা গো তুমি! কেন হবে না? এই তো আমার হয়েছে। অবিশ্যি তুমি আমারে 'হটু'ও ডাকতে পার। দাদু আমারে ডাকে 'হটী' আর দিদা ডাকে 'হটু'।

ওর বান্ধবীরা ততক্ষণে রূপেন্দ্রনাথকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

রূপেন্দ্র বললেন, ও-সব 'হটি-হটু' হচ্ছে ডাক নাম। তোমার পোশাকী ভাল নামটা কী গা? সেটাই আমাকে শোনাও।

মেয়েটি রুখে ওঠে, কেন? 'হটি-হটু' দু-দুটো নাম বলনু, তোমার পছন্দ হলনি?

ওর ভাষা এবং বাচনভঙ্গিতে একটু বিস্মিত হলেন রূপেন্দ্র। মেয়েটি অতি সুন্দরী।

তার সাজ-পোশাক, অলঙ্কার দেখে বোঝা যায় যে, সে অভিজাত ধনী বংশের সন্তান। তাহলে তার কথ্যভাষা এত গ্রাম্য কেন? বোধকরি ও মানুষ হচ্ছে পরিচারকবর্গের মাধ্যমে। তাদের ঘরেই থাকে চৌপর দিন। তাদের ভাষাটাই আসে জিহ্বাগ্রে।

রূপেন্দ্র ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, না, মা। পছন্দ হয়নি তা বলিনি। ও দুটি ডাকনামও খুব ভাল। কিন্তু ও-দুটো তো দাদু-দিদার দেওয়া নাম। মা কিংবা বাবা তোমাকে বেশ জমকালো একটা নাম দেয়নি? যা তোমার এই সুন্দর চেহারার সঙ্গে মানানসই হয়?

মেয়েটি ঠোঁট উলটে বলে, হুঃ! মা-বাবা থাকলে তো? বাবা তো একটা বদমাশ বাউণ্ডুলে!

রূপেন্দ্রের ভ্রূকুঞ্চন হল, বললেন, 'বদমাশ-বাউণ্ডুলে!' এসব ভাষা তুমি শিখলে কোথায়? কে তোমার বাবাকে ও কথা বলেছে?

—দাদুই বলে! যখন-তখন বলে, আমার মা আঁতুড়ে মরে যেতেই সেই বদমাশ বাউণ্ডুলেটা আমারে ফেলে পাইলে গেল!

থরথর করে কেঁপে উঠলেন রূপেন্দ্রনাথ। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল যেন তাঁর সর্বাবয়বে। তাই তো! তাই এত চেনা-চেনা লাগছে। তাই বুকের মধ্যে এমন মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে। সেই চোখ! সেই মুখ! কোথাও কিছু নেই, মেয়েটিকে উনি সবলে বুকে টেনে নিলেন। চুমায়-চুমায় ওর টোবলা গাল দুটো ভরিয়ে দিলেন।

—এই ছাড়ো, ছাড়ো! কী করছ তুমি? আমার লাগে না বুঝি?

রূপেন্দ্র বললেন, ছাড়ব; কিন্তু তার আগে বল: তোমার মা — ছোট-মা — কি কখনো তোমাকে বলেনি যে, সেই বাউণ্ডুলে বাপটা তোমার জন্যে একটা দারুণ সুন্দর পোশাকী নাম দিয়ে গিয়েছিল?

—ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ছোটমা বলেছিল বটে! আমার একটা জমকালো নামও আছে: রুপোমনচুরি।

—মন চুরি! হ্যাঁ, ঠিক কথা! রুপোর মন তো চুরিই করলি রে তুই! — আবার টেনে নিলেন বুকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোন অন্তরাল থেকে ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হলেন ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়। ঊর্ধ্বাঙ্গে রেশমের বেনিয়ান, মাথায় প্রাক-রামমোহনী শামলা, পরনে চুনট-করা ফরাসডাঙার ধুতি, পায়ে প্রাক-বিদ্যাসাগরী শুঁড়তোলা চটি। ছুটে এসে চেপে ধরলেন শিশুটির মোমের মতো নরম হাত। একটা হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিলেন বাপের বঞ্চিত বুক থেকে।

—একা-একা এখানে এসেছিস কেন, হতচ্ছাড়ি!

মেয়েটি ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। অস্ফুটে বললে, একা তো আসিনি দাদু, এ-রা সকলেই তো...

—আবার মুখে-মুখে চোপা! — কোথাও কিছু নেই ওর কচি গালে ঠাস করে বসিয়ে দিলেন বিরাশি-সিক্কার একটা চড়। রাগটা রূপেন্দ্রনাথের উপর, কিন্তু চপেটাঘাতের বেগটা সহ্য করতে হল অতটুকু শিশুকে। গালে হাত দিয়ে ধুলোর মধ্যেই বসে পড়ল বেচারি। তার

নরম গালে দাদুর পাঞ্জাছাপ ফুটে উঠেছে।

দুরন্ত ক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন রূপেন্দ্রনাথ। বলিষ্ঠ গঠন যুবাপুরুষ। মেদসর্বস্ব ভবতারণ তাঁর অপেক্ষা অন্তত পঁচিশ বছরের বড়। মাথায় একবিঘৎ ছোট! রূপেন্দ্রের একটি মুষ্ট্যাঘাতে ঠিক ঐভাবে চোয়ালে হাত দিয়ে ধুলোর উপর বসে পড়তেন দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নায়েবমশাই। কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে সে দুর্ঘটনা ঘটল না। তার পূর্বেই অন্তরীক্ষ থেকে বজ্রগম্ভীরস্বরে যেন দৈববাণী হল! — ক্ষান্ত হও রূপেন্দ্রনাথ!

রূপেন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, পূর্বমুহূর্তে আড়াআড়িভাবে উদ্যানটা অতিক্রম করছিলেন গৃহস্বামী স্বয়ং। সমস্ত ঘটনাটা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দীর্ঘদেহী মানুষটি বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন ঘটনাস্থলে। প্রথমেই ধুলো থেকে কোলে তুলে নিলেন, প্রায় জ্ঞানহীন বালিকাটিকে। তারপর এদিকে ফিরে বললেন, তুমি ওকে ওভাবে মারলে কেন, ভবতারণ?

ভবতারণ ততক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন, বললেন, দিন ওকে—

দুটি হাত বাড়িয়ে দিলেন নাতনিকে কোলে নিতে।

এক-পা পিছিয়ে গেলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। বললেন, কথা ঘুরিও না ভবতারণ। প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার এই চণ্ডালী ক্রোধের কৈফিয়ৎ দাও।

ভবতারণ স্পষ্টই বিরক্ত বলেন। বললেন, কৈফিয়ৎ আবার কী দেব? অন্যায় করেছিল, তাই শাসন করেছি। আমার নাতনিকে আমি শাসন করতে পারব না?

—পারবে। তোমার ভদ্রাসনের চৌহদ্দিতে। এখানে এই বাড়িতে তোমার মতো এই শিশুটিও আমার নিমন্ত্রিতা অতিথি। ফলে, আমাকে ব্যাপারটা সমঝে নিতে হবে বইকি, গাঙ্গুলী। বল, শিশুটি কী-এমন অন্যায় করেছিল, যাতে এ-ভাবে ওকে চপেটাঘাতে অজ্ঞান করে দিলে।

ভবতারণ কুণ্ঠিত হয়ে হলেন, না, না, কী বলছেন! অজ্ঞান কেন হবে? দিন ওকে আমার কোলে—

বজ্রগম্ভীরস্বরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বললেন, না! উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে দৌহিত্রীকে কোলে নেবার অধিকার তুমি চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলেছ, ভবতারণ। এখন থেকে ও থাকবে ওর পিতার কাছে!

—মানে? আপনি কি সেই জন্যই এভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন? কৌশলে হটাকে কেড়ে নিয়ে নিজের শিষ্যের হাতে তুলে দিতে চান? তাই জন্যেই কি আমার সপরিবার নিমন্ত্রণ হয়েছে এই শ্রাদ্ধবাড়িতে?

জগন্নাথ বললেন, তুমি আমার অতিথি। তাই আজ তোমার এই ঘৃণিত অভিযোগের জবাব আমি দেব না। তবে এটা জেনে রাখ, এ শিশুটিকে আর তুমি ফেরতও পাবে না!

ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় ফরাসীডাঙার ডাকসাইটে নায়েব। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দক্ষিণহস্ত। যে ইন্দ্রনারায়ণ হচ্ছেন ফরাসী গর্ভনর ডুপ্লেক্সের দেওয়ান এবং অর্থকৌলিন্যে একমাত্র জগৎশেঠ ছাড়া গৌড়মণ্ডলের আর সকলের সঙ্গেই যিনি টেক্কা দিতে পারেন— বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, নাটোরের রানী। ভবতারণের দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। টুলোপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। বললেন, কাজটা

pathagar.net

যত সহজ হবে মনে করছেন, অতটা সহজ হবে না কিন্তু, ঠাকুরমশাই। ত্রিবেণী থেকে হটীর বাপ্ সোঞাই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না, যদি না উপযাচক হয়ে নিজে কোলে করে আমার নাতনিকে ফরাসডাঙায় আমার ভদ্রাসনে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

জগন্নাথ পুরো দশ-মুহূর্ত অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন ভবতারণ গাঙ্গুলীর দিকে — নির্বাক, নিস্পন্দ। তারপর বললেন, কেন গাঙ্গুলী? তোমার সৈন্যবল আছে, তাদের বন্দুক আছে, গাঙে যে ফরাসী জাহাজ ভাসছে তাতে কামান বসানো আছে! সেই জন্য?

—আপনি তো সবই জানেন। তবে একটি কথা আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, পঞ্চানন-ঠাকুর। জীবিতকালে ঘনশ্যাম সার্বভৌমের প্রতি আপনি অনেক অন্যায় করেছেন — তার শ্রাদ্ধটাও নির্বিঘ্নে হতে দিলেন না, নিজের দম্ভে! নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ অভুক্ত ফিরে যেতে বাধ্য হবে আপনি যদি আমার নাতনিকে ফিরিয়ে না দেন।

এবারও দীর্ঘসময় জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে জগন্নাথ তাকিয়ে রইলেন অতিথির দিকে। তারপর কোন কথা না বলে ঘুমন্ত শিশুটিকে কোলে নিয়েই বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন বার-মহলে।

দ্বিতলের অলিন্দ থেকে তুলসী অনেকক্ষণ ধরে ঘটনাটা দেখছিল। বস্তুত রূপেন্দ্রনাথ যখন ছাতিম গাছতলায় নির্জনে এসে বসেন তখন থেকেই। সম্পর্কে শালী, তবুও নিমন্ত্রণ বাড়িতে সর্বসমক্ষে সে সাহস পাচ্ছিল না ওঁর দিকে এগিয়ে যেতে। কে-কী মনে করবে! এখন সে দ্রুতপদে নেমে এল নিচে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছালো ঘটনাস্থলে। বললে, কী হয়েছে বাবা? ঠাকুরমশাই হটীকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন?

ভবতারণ বললেন, সে-সব কথা তোর না জানলেও চলবে। তুই ভিতরে যা। তোর মাকে চলে আসতে বল। আমরা এখনই ফরাসীডাঙায় ফিরে যাব। এখুনি!

—এখুনি? মানে? আমাদের কারও তো মধ্যাহ্ন আহার হয়নি? তুমি খেয়েছ?

—আমরা কেউই এই শ্রাদ্ধবাড়িতে জলস্পর্শ করব না। যা, তোর মা-কে ডেকে নিয়ে আয়। এই মুহূর্তে।

তুলসী ঘুরে দাঁড়ালো। রূপেন্দ্রনাথের মুখোমুখি। তিনি যে ভঙ্গিমায় বাহুবন্ধপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেটিকে আর দেড়-দুশ বছর পরে বলা হবে বিবেকানন্দের দাঢ়ী-বিকশিত সমুন্নত ভঙ্গি। তাঁকেই প্রশ্ন করল তুলসী, কী এমন ঘটল বাঁড়ুজ্জে-মশাই ইতিমধ্যে, যাতে...

গর্জে উঠলেন ভবতারণ, তুই ভিতরে যাবি, না তোকেও হটীর মতো শাসন করতে হবে?

তুলসী তার বাপের দিকে ফিরে তাকালো। কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না, তার পূর্বেই ওদিক থেকে এগিয়ে এলেন চতুষ্পাঠীর জনৈক অধ্যাপক। নগ্নগাত্রে উত্তরীয়, নগ্ন পদ, মাথায় অর্কফলার বৈজয়ন্তী, মস্তকের সম্মুখভাগ বিদ্যাসাগরী-রীতিতে ক্ষৌরীকৃত। যুক্তকরে ভবতারণ ও রূপেন্দ্রকে নমস্কার করে বললেন, আমার নাম হরেরাম বাচস্পতি। আমি এই টোলে ন্যায় ও বেদান্তের অধ্যাপনা করি। আপনাদের দুজনকে ডাকতে এসেছি।

আপনাদের দুজনকে বৈঠকখানা ঘরে ডাকছেন।

ভবতারণ বলেন, কে? আপনাদের মালিক পঞ্চানন-ঠাকুর?

ওঁর বাচনভঙ্গিতে একটু ক্ষুব্ধ হলেন হরেরাম। ভ্রূযুগলে একটি কুঞ্চনরেখা জেগেই মিলিয়ে গেল। বললেন, আজ্ঞে না। আপনাদের আহ্বান করেছেন ফরাসীডাঙার দেওয়ান মহিমার্ণব ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী!

ভবতারণ একটু চমকে ওঠেন! বলেন, তিনি এসেছেন? কতক্ষণ? তাঁরও আসার কথা ছিল তা তো জানতাম না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছেন। এই কিছুক্ষণ হল। সস্ত্রীকই এসেছেন। আপনাদের দুজনকে ডাকছেন।

—চলুন।

তুলসী ভিতরবাড়ির দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল; বাচস্পতি বললেন, আপনাকেও ডেকেছেন, মা-লক্ষ্মী। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে!

তুলসী অবাক হয়ে বলে, আমাকে? আমাকে তো দেওয়ানজী চেনেনই না!

—আজ্ঞে না। আপনাকে ডেকেছেন আমাদের গুরুদেব তর্কপঞ্চানন-ঠাকুর।

—ও আচ্ছা। চলুন।

পঞ্চানন-ঠাকুরের বৈঠকখানাটি প্রকাণ্ড। ঘরের মাঝামাঝি বিশাল একটা নিচু জাজিম-ফরাস বিছানো চৌকির সঙ্গে জোড়া দেওয়া চৌকি। ইতস্তত তাকিয়া ছড়ানো। দু-দিকের প্রাচীর বরাবর কাঁঠাল-কাঠের হাতলহীন কেদারা। তার উপর পশম অথবা কুশের আসন। সেগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্য, যাঁরা জাজিম-ফরাসের স্পর্শ বাঁচিয়ে দরবার করতে চান। মাথার উপর প্রকাণ্ড টানা-পাখা। যে দুজন টানে তারা থাকে পাশের ঘরে। শ্রুতি ও দৃষ্টিসীমার বাহিরে। কক্ষের দূরতম প্রান্তে একটি বেতের আরাম-কেদারা। পাশে একটি কাঠের সাদামাঠা টুল। তার উপর তাম্রকূট-সেবনের আয়োজন — আলবোলা।

ভবতারণ, রূপেন্দ্রনাথ আর বাচস্পতি ঘরে ঢুকে দেখলেন, আরামকেদারায় অর্ধশায়িত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। রাজকীয় পোশাক, মস্তকে হীরকখচিত রেশমী উষ্ণীষ। তাতে

একছড়া মুক্তার মালা জড়ানো। কণ্ঠেও মুক্তামালা। কটিদেশে বিলম্বিত তরবারি — মোঘল-পাঠান ঢঙের বঙ্কিম তরোয়াল নয় — ফরাসী-রীতির ঋজু কৃপাণ। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বসে আছেন কাছাকাছি কাষ্ঠাসনে। কুশাসনে। তাঁর কাঁধে ঘুমন্ত বালিকাটি। বোধ করি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওঁরা তিনজনেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। তুলসী কপাটের বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওঁদের দেখতে পেয়ে ইন্দ্রনারায়ণ ফরসির নলটি নামিয়ে রাখলেন। ভবতারণকে আহ্বান করলেন, আরে এস, এস, গাঙ্গুলী। কতক্ষণ এসেছ? বস এইখানটায়।

ভবতারণ যুক্তকরে নমস্কার করে ফরাসের একান্তে একটি তাকিয়া টেনে নিয়ে বসলেন; কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিছু বলার পূর্বেই ইন্দ্রনারায়ণ পুনরায় ব্যস্তায় হয়ে ওঠেন, আর উনিই বুঝি সেই ভেষগাচার্য? মন্ত্রবলে যিনি বর্গীসর্দারকে দামোদরে হস্তিসমেত ডুবিয়ে মেরেছিলেন?

রূপেন্দ্রনাথ করজোড়ে প্রতিবাদ করেন, এ-সব বিশ্বাসপ্রবণ গ্রাম্য লোকের রটনা মাত্র। বর্গীসৈন্যদের প্রতিহত করেছিল গ্রামের প্রতিরোধশক্তি — বিশেষ করে কিছু অচ্ছুত সম্প্রদায়ের ধানুকীর দল।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, তাই বুঝি? আর বর্ধমানের নায়েব-কানুনগো নগেন দত্তজার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী? তার মৃগীরোগটা সারালো কে? কী ভাবে? শুনেছি, গতবছর দত্তজা পুরুষোত্তমধামে গেছিল?

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। ফরাসীডাঙায় বসে ঐ দেওয়ানজী কেমন করে জ্ঞাত হলেন, নগেন দত্তের পরিবারের এই গুহ্য তথ্য! তিনি কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু এবারেও ইন্দ্রনারায়ণ তার পূর্বেই বলে ওঠেন, আর প্রবেশদ্বারের বাহিরে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎঝলক নজরে পড়ল মনে হচ্ছে। মালক্ষ্মীর ইতস্তত করার হেতুটা কী?

তুলসী সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এল, সর্বপ্রথম প্রণাম করল — না, বৈঠকখানার মধ্যমণি দেওয়ানজীকে নয়, নগ্নগাত্র পণ্ডিতমশাইকে। তারপর পর্যায়ক্রমে সকল ব্রাহ্মণকেই।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, তোমাকে আগে একবারমাত্র দেখেছি তুলসী-মা। কিন্তু জগদ্ধাত্রীকে তো ভোলা যায় না। তাই তোমার শাড়ির বিদ্যুৎঝলক প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি দেখেই চিনেছি। তোমাকে একটি দায়িত্ব দিচ্ছি তুলসী, মা। অন্দরমহলে গিয়ে তোমার জননী এবং জেঠিমা, অর্থাৎ আমার সহধর্মিণীকে, খুঁজে বার কর। বাচস্পতি-মশাই ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁর কোন ছাত্র একটি পৃথক কক্ষে তোমাদের আর আমাদের পরিবারের মহিলাদের পংক্তি-ভোজনে বসিয়ে দেবেন। শ্রাদ্ধকার্য এখনো সমাপ্ত হয়নি, ঠিক কথা, ষোড়শ-শ্রাদ্ধ এত শীঘ্র সমাপ্ত হয়ও না; কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে আমাদের অবিলম্বে ফরাসীডাঙায় ফিরে যেতে হবে। পংক্তি-ভোজন শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং এতে আপত্তির কিছু নেই!

তুলসী কোন কথা বলার আগেই ইন্দ্রনারায়ণ বাচস্পতি-মশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, ঠাকুরমশাই! আপনার কোন দায়িত্বশীল ছাত্রকে বলুন, অন্দরমহলে একটি একান্ত কক্ষে আমার এবং গাঙ্গুলীর পরিবারস্থ সকলকে পংক্তি-ভোজন বসিয়ে দিতে। আর আমাদের দুজনকেও বাহির-মহলের কোন একটি পৃথক কক্ষে...

বাচস্পতি একটি নমস্কার করে বললেন, এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ভবতারণ কী-যেন বলতে চাইছিলেন; তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, তোমাকে এখনো বলাই হয়নি। সাহেব সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাঁর কাস্‌ল্‌-এ আমাদের দেখা করতে বলেছেন। একান্তে তোমাকে আর আমাকে। কারণটা জানি না।

বলাবাহুল্য 'সাহেব' অর্থে ফরসী গভর্নর-জেনারেল ডুপ্লেক্স।

বাচস্পতি ততক্ষণে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছেন। জগন্নাথ এ পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। তুলসী আদিষ্ট হয়েও প্রাচীর-সই সই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ, সে বিস্মৃত হয়নি, বাচস্পতি-মশাই তাকে বলেছিলেন ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

ভবতারণ নড়ে-চড়ে বসলেন। প্রণিধান করলেন, এটি তর্কপঞ্চাননের একটা 'ওট্‌সাই-কিস্তি'! আগেভাগেই ইন্দ্রনারায়ণকে কব্জা করে জানিয়েছেন যে, তাঁর নায়েব ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় জলস্পর্শ না করে শ্রাদ্ধবাড়ি থেকে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প জানিয়েছেন। তাতেই ইন্দ্রনারায়ণ দক্ষ অসিচালকের মতো চতুর্দিকে লক্ষ্য রেখেই আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করে চলেছেন।

ভবতারণ বললেন, একটা কথা! আমি কিছু আহার করতে পারব না এখানে। আমাকে মার্জনা করবেন। আপনি মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিন, তারপর আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বরং ফরাসীডাঙায়...

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি! ক্ষুধামান্দ্য! তা তো হতেই পারে। তোমার বেশ মেদবৃদ্ধি হয়েছে গাঙ্গুলী। মাসে দু-একদিন উপবাস তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই। তবে কী জান, ভবতারণ? তোমারই গরহজম হয়েছে—নাগ, কূর্ম, কৃকরায়, দেবদত্ত আর ধনঞ্জয়ের তো তা হয়নি। সুতরাং পশমের আসনে বস। পঞ্চদেবতাকে অন্ন নিবেদন কর। তদনন্তর যেটুকু তোমার উদর অনুমতি দেয় সেটুকুই সেবা কর। তারপর আচমন করে উঠে যেও। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভব, এখানে কোন লাস্যময়ী সুন্দরী এসে তোমাকে পীড়াপীড়ি করবেন না: 'এটা খাও, ওটা খাও, নাইলে আমার মাথা খাও!' উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হবে না তোমাকে। সেজন্যই এই বার-মহলের একান্তে ব্যবস্থা করতে বলেছি।

ভবতারণ একগুঁয়ে বলিবর্দের মতো ঘাড় নিচু করেই রইলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন, আমাকে মার্জনা করবেন। আমার সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূর্বেই গৃহস্বামীকে জানিয়ে দিয়েছি: আমি এ শ্রাদ্ধবাড়িতে জলগ্রহণ করতে পারব না।

যে স্থূল কদর্য কথাটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য এত বাক্যকৌশল, এত কৌতুক, এত হাস্যরস, তা সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। যেন পঙ্ককুণ্ড থেকে উঠে-আসা এক বন্যবরাহের স্থূল দেহাবলেপনে ফেনশুভ্র ফরাসটি কর্দমলিপ্ত হয়ে গেল। ইন্দ্রনারায়ণ চারিদিকে দৃকপাত করলেন। বাচস্পতি প্রস্থান করেছেন, তুলসী কপাটের আড়ালে আত্মগোপন করেছে, রূপেন্দ্রনাথ মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি, আর জগন্নাথ নিমীলিতনেত্র।

সোজা হয়ে উঠে বসলেন ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, তুমি একটা সুপরিচিত চাণক্য শ্লোক বিস্মৃত হয়েছ ভবতারণ: "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।" ফরাসীডাঙার চৌহদ্দির বাইরে প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়কে কেউ চিনতে পারবে না। ঠিক যেমন গাঙ্গেয় গৌড়মণ্ডলের বাহিরে এই হীরক-উষ্ণীষ শোভিত ইন্দ্রনারায়ণের পরিচয় হচ্ছে: 'কোই আনজান শেঠ হোগা সায়েদ!' কিন্তু বদরীকাশ্রম থেকে কন্যাকুমারিকা, কামাক্ষ্যা থেকে দ্বারকা — তুমি ঐ নগ্নপদ-নগ্নগাত্র টুলো পণ্ডিতটার নাম উচ্চারণ করে দেখ, ভবতারণ, — প্রতিটি জনপদের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ওঁকে চিনবেন। উদ্দেশে হাত তুলে প্রণাম জানাবেন। আজ থেকে একশ বছর পরে এই গৌড়দেশে তোমার-আমার নাম যদি আদৌ উচ্চারিত হয়, তবে তা কেন হবে জান? আমরা দুজনে ছিলাম যুগান্তকারী মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমকালের মানুষ! তুমি তোমার ঐ চণ্ডালে ক্রোধকে মূলধন করে অমন একজন সর্বভারতীয় সর্বজনমান্য মহাপণ্ডিতকে অপমান করবে, আর আমরা তা নীরবে সহ্য করে যাব? তুমি ভেবেছটা কী?

ভবতারণ বললেন, কিন্তু আমার দৌহিত্রী — হটী। উনি যে কায়দা করে তাকে অপহরণ করলেন?

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমার বক্তব্যটা বুঝবার মতো শিক্ষা ও বুদ্ধি তোমার নেই, তাই বলতে পারলে 'কায়দা করে অপহরণ করলেন।' হ্যাঁ, শোন, ভবতারণ। দৌহিত্রীকে ওভাবে আটকে রাখাটা তোমার অন্যায় হচ্ছিল। সামাজিক অন্যায়। নৈতিক অন্যায়। ফরাসী ভাষাটা আমি যতটা যত্ন নিয়ে শিখেছিলাম, সংস্কৃতটা ততটা যত্ন নিয়ে শিখিনি। তবু কৈশোরে শেখা একটা শ্লোকের কিছুটা আজও মনে আছে। পুরো শ্লোকটা আজ আর মনে নেই — তোমার কৌতূহল হলে তর্কপঞ্চানন ঠাকুর তোমাকে শুনিয়ে দেবেন। তার প্রথম চরণটি ছিল: 'পিতা রক্ষতি কৌমারে...' অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় অনূঢ়া কন্যার যাবতীয় দায়দায়িত্ব তার জনকের। পিতার 'লতায়-পাতায়-সম্পর্ক-ধরে' কোনও পিসশ্বশুরের নয়। কন্যা পিতার ভদ্রাসনে...

মাঝপথেই গর্জে ওঠেন ভবতারণ: ভদ্রাসন! ছিল তো কুল্লে একটি পর্ণকুটীর, ইতিমধ্যে তা মাটিতে মিশিয়ে গেছে। মাথার উপর একখানা ছাদও নেই! ঐ কপর্দকহীন ব্রাহ্মণের নিজের অন্নসংস্থান কীভাবে হবে তারই স্থিরতা নেই। আমার নাতনিকে সে খাওয়াবে কী?

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবার নিজমূর্তি ধরতে বাধ্য হলেন। বললেন, ভবতারণ! ভদ্রসমাজে যদি ভদ্রভাষায় বাক্যালাপ করা ভুলে গিয়ে থাক, তাহলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। একবার বলেছি, দ্বিতীয়বার বলছি: দূর-সম্পর্কের ঐ নাতনির উপর তোমার কোনও অধিকার নেই। না আইনত, না ন্যায়ত, না ধর্মত। তুমি শুনলে না তর্কপঞ্চানন ঠাকুরকে আরও একটি যুক্তি নাকি দেখিয়েছ — বাহুবলের যুক্তি। সেটার কথা ভুলে যাও ভবতারণ — কারণ সে-ক্ষেত্রে তুমি আমাকে স্বপক্ষে পাবে না, পাবে বিপক্ষে। রূপমঞ্জরী আজ থেকে ভেষগাচার্যের কাছে থাকবে। এই মুহূর্ত থেকে। ওঁর ভদ্রাসন না থাকলে বাপ-বেটিতে গাছতলায় শয়ন করবে। অথবা হয়তো মন্দির চাতালে শোবে। কিংবা খোলা আকাশের নিচে। বাপবেটিতে হয়তো শাকান্ন খাবে, অথবা উপবাস করবে। এ বিষয়ে কোন অনধিকার চর্চা তুমি করতে

যেও না ভবতারণ, তার ফল ভাল হবে না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি!

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মতো বসে রইলেন ভবতারণ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন তুলসীর দিকে। তার পিঠে একটা হাত রেখে ইঙ্গিত করলেন ওঁকে অনুগমন করতে। দুজনে বেরিয়ে গেলেন। পাশের একটি নির্জন কক্ষে — বোধকরি এটিও দুই মহালের মাঝখানে 'অন্তরাল' — প্রবেশ করে পঞ্চানন ঠাকুর বললেন, তুলসী, এবার এটাকে নে-মা। হতভাগী কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তুলসী ইতস্তত করল। শেষে বলেই ফেলল, আমি কেন নেব ঠাকুরমশাই? এইমাত্র তো স্থির হল রূপমঞ্জরীকে তার পিতার হাতে সমর্পণ করা হবে। মাঝখান থেকে আমি কেন?

জগন্নাথ হাসলেন: পাগলি মেয়ে! হ্যাঁরে, বাপে সন্তান লাভ করে কি গুরুদেবের হাত থেকে? ওটা যে মায়ের জাতির কাজ। রূপমঞ্জরীর মা হতভাগিনী এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারল না। অন্তত তার ছোট-মাই কাজটা করুক। তুই নিজে হাতে ওকে তুলে দিবি বাপের কোলে। আমি শুধু পথের বাধাগুলো সরিয়ে দিয়ে গেলাম। কী আক্ষেপের কথা! রূপেন্দ্র একটা অনড়ান! একটা বলিবর্দ! কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের বিপত্নীক যুবক। কন্দর্পকান্তি রূপ। জিদ্দিবাজি না করলে শুধু কন্যাসন্তান নয়, তার ছোট-মাকেও বরণ করে ঘরে তুলতো আজ। কিন্তু না! তা হবার নয়। একবগ্গা-ঠাকুর বিশ্বাস করে হিন্দু-বিধবা যদি পুনর্বিবাহ করতে না পারে তাহলে হিন্দু বিপত্নীকও পুনর্বিবাহের অধিকারী নয়। এ মূর্খামির কোনও অর্থ নয়?

তুলসী বলল, হয়-কি-না হয় তা আমি কী জানি ঠাকুরমশাই? শাস্ত্রে কী বিধান আছে তা আপনারাই জানেন। তবে জামাইবাবু যা বলেন — পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার সমান হওয়া উচিত — সে কথা স্বীকার করলে, কথাটা অযৌক্তিক নয়।

পণ্ডিত বললেন, তোরা দুটোই উন্মাদ।

তুলসী নিঃশব্দে ঘুমন্ত রূপমঞ্জরীকে বৃদ্ধের কোল থেকে নিয়ে নিল।

বৃদ্ধ বললেন, একটা কথা, মা। তুই কালপরশুর মধ্যে ওর পুতলা-পুতলিগুলি আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি।

—পুতলা-পুতলি! তার মানে?

—বুঝলি না? কাল থেকে শুরু হবে ওর কৃচ্ছ্রসাধনা। দাদামশায়ের প্রাসাদে বিলাসের দিন শেষ হয়ে গেল ওর। ঐ-সঙ্গে হতভাগিনী নতুন করে মাতৃহীন হল — ঐ অনড়ানটার জিদ্দিবাজিতে! বাপকে সে চেনে না, দ্বিতীয়বার হারালো মাকে। পুতুলগুলো না পেলে ও বাঁচবে কী নিয়ে?

তুলসী অবাক হয়ে গেল ঐ কট্টর পণ্ডিতের অন্তরে প্রবাহিত স্নেহ-জাহ্নবীর পরিচয় পেয়ে। বৃদ্ধকে প্রণাম করে বলল, আপনি কাল আপনার কোন বিশ্বস্ত ছাত্রকে ফরাসীডাঙায় পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে হাতচিঠি দিয়ে — যাতে ছাত্রটিকে চিনতে পারি।

—তোর অক্ষর পরিচয় হয়েছে?

—তা হয়েছে। আমি চিঠি দিতে বলছি এজন্য যে, আমি অপনার ছাত্রের হাতে দিদির

গহনাগুলিও পাঠিয়ে দেব একটা তালিকা সমেত। এগুলো দিদির বিবাহ-যৌতুক। সোঞাই গাঁয়ের জমিদারমশাই ওকে দিয়েছিলেন। জামাইবাবুকে আমি সেগুলি ফেরত দিতে চেয়েছিলাম, তিনি গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, হটীর বিবাহে সেগুলি যৌতুক দিতে। আজ যখন হটীকেই ফেরত দিতে হচ্ছে তখন অলঙ্কারগুলিও আমি প্রত্যর্পণ করতে চাই।

জগন্নাথ বললেন, ঠিক আছে। তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি সেই হস্তিমূর্খ অনড়ানটাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরেই রূপেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে। প্রশ্ন করলেন, ভিতরে আসতে পারি?

তুলসী তখনো মুখে কাপড় গুঁজে হাসছে। হাসতে হাসতেই বললে, আসুন, আসুন শ্রীযুক্ত হস্তিমূর্খ অনড়ান।

রূপেন্দ্র ভিতরে এসে বলেন, হঠাৎ এমন গৌরবময় সম্বোধন?

—না, বাঁড়ুজ্জে মশাই! এটা আপনার শ্যালিকার দেওয়া উপাধি নয়। আপনার গুরুদেবই বলে গেলেন। কেন জানেন? যেহেতু আপনি বিকল্প-মাতা সহ কন্যাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। এই নিন, আপনার বুক-জুড়ানো ধন।

অতি সাবধানে রূপেন্দ্রনাথ ঘুমন্ত শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, তুমি তো জানই তুলসী, কেন আমি...

—ব্যস! ব্যস! আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে না। আমি জানি আপনার মতামত: যতদিন না বিধবাদের বিবাহ সমাজে গৃহীত হচ্ছে, ততদিন বিপত্নীকেরাও বিবাহ করার অধিকারী নয়। তাই তো?

—তুমি কি এই যুক্তিটা মান না?

—আমার প্রশ্ন তা নয়। আমার জিজ্ঞাস্য: যতদিন সতীদাহ প্রথা রোধ না হচ্ছে ততদিন স্ত্রীর বিয়োগে বিপত্নীক স্বামীদের সহমরণে যেতে বাধ্য করতে কেন আপনি আন্দোলন করছেন না?

—কৌতুকের সময় নেই তুলসী। হয়তো এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। আজ তোমার বাবার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে প্রাক্তন জামাতা হিসাবে তোমাদের বাড়িতে যদি কোনদিন মাথা গলাই...

—থামুন আপনি। তাই বলে আমাদের আর কখনো দেখা হবে না কেন? মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না আসতে পারেন, তাহলে পর্বতই যাবে মহম্মদের কাছে।

—তার মানে? তুমি সোঞাই আসবে? পিসেমশাই অনুমতি দেবেন? কক্ষনো নয়।

তুলসী ঠোঁট উলটে বললে, ঠিকই বলেছেন আপনার গুরুদেব। আপনি একটি হস্তিমূর্খ অনড়ান। দেওয়ানজী যে উদ্ভট শ্লোকটা শোনালেন — যার জোরে আপনি আজ হটীকে ফেরত পেলেন — তার পরের চরণটি মনে নেই? "ভর্তা রক্ষতি যৌবনে!" আপনি, মুখ ফিরিয়ে রইলেন বলে আমি তো সারা জীবন 'থুবড়ি' হয়ে থাকব না। আমার মালিকানাও বদলাবে। তেমন সুদিন এলে সোঞাই তীর্থেই বা যাব না কেন?

—এস, তুলসী। আমার নিমন্ত্রণ রইল।

—সেদিন কিন্তু আমার আজকের দান কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিতে হবে। বুঝেছেন?

রূপেন্দ্রর ভ্রূকুঞ্চন হয়। বলেন, না, বুঝলাম না!

নতনয়নে তুলসী বলল, দিদির জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটল, আমি তা ঘটতে দেব না আমার জীবনে। আপনি শুধু আমার ভগ্নিপতি নন, আপনি ভেষগাচার্য! তাই সঙ্কোচ করব না। স্পষ্টই বলছি, তেমন-তেমন অবস্থা যেদিন হবে সেদিন আমি পাল্‌কি চেপে সোঞ্জাই চলে যাব। আমার বুকজোড়া ধন আজ আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। সেদিন আপনি তা আমাকে ফেরত দেবেন।

রূপেন্দ্রর কণ্ঠে রসিকতার বাষ্পমাত্র রইল না। বললেন, ঠিক কথাই বলেছ তুলসী। তোমার বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ হবে না; কিন্তু তোমার সন্তানকে জন্ম দেবার সৌভাগ্য থেকে যেন বঞ্চিত কোরো না আমাকে।

তুলসী নত হয়ে প্রণাম করল রূপেন্দ্রকে।

রূপেন্দ্র যুক্ত করে বললেন: ওঁ নমো নারায়ণায়!

pathagar.net

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

1748

দশম পর্ব

বৈশাখের শেষ সপ্তাহ। মেঘরাশিস্থে ভাস্করে, শুক্লে পক্ষে, তৃতীয়াং তিথৌ। অর্থাৎ পুণ্যাহ: অক্ষয় তৃতীয়া। সময়কালটা আজ থেকে প্রায় আড়াই শ বছর অতীতের। সঠিক হিসাবে এগারো শ' পঞ্চান্ন বঙ্গাব্দ। যাবনিক বিচারে ক্রিস্টিয় 1748 সাল।

রঘুনন্দনের মতানুসারে এই পুণ্যাহেই ভগীরথের প্রার্থনায় জহ্নু-তনয়া হিমালয় থেকে অবতরণ করেছিলেন গাঙ্গেয় মর্ত্যভূমে—সগরপুত্রদের উদ্ধার করতে। শুধু তাই নয়, এই অক্ষয় তৃতীয়াতেই শুরু হয়েছিল বর্তমান কল্পের সত্যযুগ।

বর্ধমানভুক্তির একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম : সোঞাই। দামোদর নদের সমান্তরালে বিস্তৃত। ভদ্রপল্লী সবই দক্ষিণ তটে ; ওপারে—উত্তরপাড়ে, জল-অচল অচ্ছুৎদের বাস। ঘননিবিড় গাছ-গাছালির মধ্যে উলুখড়ের একচালা ; কখনো বা দোচালা। মাটির দেওয়াল, কঞ্চির বেড়া। গ্রামের সীমানা—অস্তগামী সূর্যকে শ্রেষপ্রণাম জানাতে পশ্চিমে তেঁতুলবট ; উদয়ভানুকে প্রথম প্রণাম জানাতে ভোলাবাবার মন্দিরের ধাতব ত্রিশূল। উত্তরে দামোদর নদ আর দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের শেষ প্রান্ত।

এই গ্রামেরই মেয়ে আমাদের কাহিনীর প্রধানা চরিত্র : হটী বিদ্যালঙ্কার : রূপমঞ্জরী। যাঁর কথা শোনাব বলে এত আয়োজন, অথচ এখনো সেই গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই এসে পৌঁছাননি। এবার আসছেন : এই দশম পর্বে। পিতৃহীন হতে।

সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকেই আজ দামোদরের ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়। জমিদারের অর্থানুকূল্যে চওড়া সোপানশ্রেণী নেমে গেছে জলে। মাঝখানে দিয়ে দু ভাগ করা। একদিকে পুরুষদের ঘাট ভাঁটির দিকে ; অপরদিকে, উজানে, স্ত্রীলোকদিগের স্নানঘাট। মাঝখানে ঘাটোয়াল লছমপ্রসাদের বিরাট গোলপাতার 'ছত্র'। স্নানান্তে পুণ্যার্থীরা ঘনিয়ে আসে, পাণ্ডাজী প্রতিষ্ঠিত শিউজী মহারাজের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ায়। কমণ্ডলু থেকে গঙ্গোদক ঢেলে দেয় শিবের মাথায়—হ্যাঁ, এই অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনে দামোদরের জল গঙ্গাজলের মতো

পবিত্র। স্নানার্থীরা দু-পাঁচ কড়ি প্রণামীও দেয়। পরিবর্তে কপালে নেয় চন্দনছাপ, শ্বেতচন্দনের মাঙ্গলিক চিহ্ন। গ্রহণ করে চরণামৃত, প্রাসাদী ফুল ও পেঁড়া।

পুরুষদের ঘাটে পুণ্যস্নান করছিলেন গ্রাম্য জমিদার তারাপ্রসন্ন ভাদুড়ী। বয়স দেড় কুড়ির কাছাকাছি। সঙ্গে তাঁর বালকপুত্র—বংশের সম্ভাবনাময় সন্তান। তার বয়স আট বৎসর। নাম : শুভপ্রসন্ন। শুভ্রের স্নান ও ঝাপাইজোড়া শেষ হয়েছে। ভিজা কাপড় ভৃত্য কালিপদকে দিয়ে, কাচা কাপড় পরে সে উঠে গেছে পাণ্ডালীর ছত্রছায়ায়। হাঁটু গেড়ে বসেছে ললাটে কৃষ্ণজীর আশীর্বাদ চরণছাপ নিতে। তারাপ্রসন্ন দামোদর নদে আবক্ষ নিমজ্জিত অবস্থায় বাল্মীকি বিরচিত গঙ্গাষ্টকং আবৃত্তি করছিলেন : মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভগবতীং ভাগীরথীং প্রার্থায়...”

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত এই গঙ্গাস্তোত্র, কী ছন্দে, কী সমাসবদ্ধতায় বেশ কঠিন। আর-সকলেই সেজন্য অবগাহনস্নানকালে যে গঙ্গাস্তব আবৃত্তি করে তা আদি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত, অতি পরিচিত “দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে।” কিন্তু তারাপ্রসন্নের স্বর্গগত পিতৃদেব ছিলেন বিচিত্র মেজাজের মানুষ। গড্ডলিকাপ্রবাহে গা-ভাসাতে গররাজি। সব বিষয়েই। এমনকি গৃহাবরোধের ভিতর জীবনসঙ্গিনীকে সংস্কৃত শিখিয়ে দুজনে শৃঙ্গারসের আস্বাদন করতেন। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস-এর সঙ্গী হয়ে। তাই শৈশবেই পুত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়েছিলেন বাল্মীকি-বিরচিত এই বিচিত্র গঙ্গাস্তবটি।

আগেই বলেছি, বর্ধমানভূমির জনগণের বিশ্বাস : অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যাহে দামোদরের জলও মা-গঙ্গার জলের মতো পবিত্র হয়ে ওঠে। এই ধারণাটা এসেছে অজয়নদ-তীরবর্তী গ্রামবাসীদের বিশ্বাস থেকে। গঙ্গা নাকি কালনা-কাটোয়া থেকে উজানে অজয় তীরবর্তী গ্রামে ঐ পুণ্যাহে আগমন করেন। দামোদরে তা হওয়ার উপায় নেই। দামোদর গঙ্গায় পাড়েনি। কিন্তু সে যুক্তি মানতে চায় না... দামোদরের তীরবর্তী গ্রামের মানুষজন। আর মানেই বা কী করে? মনকে কিছু একটা বুঝ দিতে হবে তো!

তারাপ্রসন্নের সহসা নজর হল পূবদিক থেকে একটা প্রকাণ্ড মহাজনী গহনার-নৌকা পালের পর পাল তুলে শুভ্র রাজহংসের মতো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। যদিও নৌকাটি মাঝ-দরিয়ায় এবং এই বৈশাখের শেষ সপ্তাহে দামোদর নদ শীর্ণকায়, তবু বড় বড় ঢেউ এসে ভাঙছে পাড়ে। ছোট-খাটো ডিঙিতে সামাল-সামাল রব উঠেছে। ঘাট থেকে যারা সাঁতরে মাঝনদে চলে গিয়েছে তারা মজাসে ঢেউ খাচ্ছে। গহনার-নৌকা সচরাচর হয় বহুযাত্রীবাহী। মাল বহন করে না। এটি ঠিক তা নয়। এটিতে যাত্রী ব্যতিরেকে মালও বহন করা হয়। পাঠাতনের নিচে সার দেওয়া কলসি। গঙ্গাজলে পূর্ণ। উপরের ঐ ‘ওঁ’ লেখা গৈরিক নিশানটি দেখে সবাই চিনতে পেরেছে। এ-নৌকা একপক্ষে একবার করে নবদ্বীপ-কাটোয়া হয়ে এই সোঞাই পর্যন্ত আসে। আর একপক্ষে বাঁকা হয়ে চলে যায় শহর বর্ধমান। নৌকার মালিক বর্ধমানের ধনকুবের নগেন্দ্র দত্ত। বাঙলার নবাব-আলিবর্দীর রাজ-সরকারের তরফে ইজারাদার। তারাপ্রসন্ন আরও জানেন, মাসে একবার এই নৌকায় আসে দুর্গা গাঙ্গুলীর ‘আগ-মার্কা’ গঙ্গাজল। দুর্গা এই সোঞাই গ্রামের একজন অত্যন্ত ধনী মহাজন। কুলীন, ব্রাহ্মণ,

অর্থবান, ফলে সমাজের শিরোমণি। তাঁর কারবার দুই জাতের—তন্তুবায়-শোষণ এবং গঙ্গাজল বিতরণ। ওঁর বিশ্বাস, প্রথমটির সঞ্চিত পাপ দ্বিতীয়টির পুণ্যে ধুয়ে মুছে যায়। গঙ্গাজল ছাড়াও আসে লবণ। দুটিই গ্রামজীবনের আবশ্যিক উপাদান। লবণের নৌকা কিছু দেরী করে এলে তবু গ্রামের জীবনযাত্রা থেমে থাকবে না—বড় জোর আলুনি ব্যঞ্জনে অথবা কাঁচা-ফলারে গ্রামবাসী মানিয়ে নেবে ; কিন্তু দুর্গা গাঙ্গুলী মশায়ের 'ওঁ'-গঙ্গা ছাপ-মারা গঙ্গাজলের নৌকা যদি দেরী করে আসে তবে স্বয়ং 'সূয্যিঠাউর মাঝ-আকাশে থমকে ডেঁড়িয়ে পড়বেন মনে লাগে।'

নৌকাখানি পারানি খেয়াঘাটের পাটাতনে এসে ভিড়ল। বড়-সারেঙ নামিয়ে দিল প্রকাণ্ড নোঙর, দামোদরের গর্ভে। তারপর অবতরণ করতে শুরু করল এক দিক দিয়ে গঙ্গাজলের কলসি, অন্য দিক দিয়ে যাত্রীরা।

হঠাৎ একটি চেনা-মানুষ দেখে চমকে উঠলেন ভাদুড়ী মশাই। মন্ত্রোচ্চরণ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর : রুপো বন্দ্যঘটি নয়? হ্যাঁ, তাই তো। সঙ্গে একটি বছর-তিনেকের ফুটফুটে মেয়ে। টুকটুকে গায়ের রঙ, মাথায় বেড়া-বিনুনি। দলের সঙ্গে একজন বিধবা স্ত্রীলোক।

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সোঞরাই গাঁয়ের স্বনামধন্য কবিরাজ। আজ ছয় বছর প্রবাসে ছিলেন। জনশ্রুতি জগন্নাথধামেও গিয়েছিলেন। রওনা হন সস্ত্রীক, বিবাহের কয়েক মাস পরেই। তারপর দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে আজ পুণ্যাহের দিনে গ্রামে ফিরে আসছেন।

কিন্তু...

রুপোর সঙ্গে ঐ বিগতিভর্তা ভদ্রমহিলাটি কে? শাদা থান, আবক্ষ অবগুণ্ঠন। মুখখানি তাই দেখা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ নিরাভরণা, দুটি শ্যামবর্ণের সুডৌল বাহু। আন্দাজে তারাপ্রসন্নের মনের হল, বয়স এক কুড়ির এপারে-ওপারে। প্রায় চার বছর পূর্বেই দুঃসংবাদটি পেয়েছিলেন, —পিতৃগৃহে একটি কন্যাসন্তানকে প্রসব করে রূপেন্দ্রনাথের সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী কুসুমমঞ্জরী স্বর্গলাভ করেছেন। সুতরাং ঐ কুন্দ ফুলের মতো সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি—ঐ যে বাপের হাত ধরে সাবধানে নৌকা থেকে নেমে আসছে—সে নিঃসন্দেহে কুসুমমঞ্জরীর মাতৃহীনা আত্মজা। কিন্তু ঐ অপরিচিতা বিধবাটি? শ্যামাঙ্গী যুবতীটি? কে উনি?

চকিতে আরও একটা কথা স্মরণে এল তাঁর...!

—আঃ! ছি, ছি, ছি! আজ এই অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যাহে অমন একটা বিশ্রী কথা যেন ভেসে এল স্মরণপথে? পরক্ষণেই নিজের মনকে ধিক্কার দেন : না। উনি মীনু-খুড়িমা নন! হতে পারেন না। দুর্গা-খুড়ো তো বহাল-তবিয়ৎ! এ তো বিধবা! তবে কি দুর্গা খুড়োও ফৌত হয়েছেন ইতিমধ্যে?

পায়ে পায়ে তারাপ্রসন্ন এগিয়ে এলেন পারানি ঘাটের কাছে। ছোট মেয়েটি তখন শক্ত ডাঙায়। ওদের মালপত্র, বাক্স-প্যাঁটরা, পুঁটুলিও নেমেছে। এখন রূপেন্দ্রনাথ ঐ যৌবনবতী বিধবাটির নিরাভরণ বামমণিবন্ধটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে অবতরণ করছিলেন। নৌকোর উপর থেকে কর্দমপিচ্ছিল ঘাটে।

: আস্তে, আস্তে, বৌঠান, খুব পিছল আছে কিন্তু...

শক্ত জমিতে পা পড়তে—সে পায়ে নেই অলক্তক-চিহ্ন, কিংবা রূপার চুটকি—রূপেন্দ্রনাথ ওঁর মণিবন্ধকে মুক্তি দিলেন। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল তারাপ্রসন্নর সঙ্গে।

: তারাদা না?

এগিয়ে আসেন প্রণাম করতে। তারাপ্রসন্ন বাধা দিলেন। বুকে টেনে নিলেন আগন্তুককে। বলেন, তুমি আমার চেয়ে মাত্র চার বছরের ছোট, রুপেন। তুমি সেদিক থেমে আমার বয়স্য স্থানীয়। তারপর? এতদিনে সোঞাই মায়ের কথা মনে পড়ল? কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে গো তোমার?

ছয় বছর আগে সদ্যোবিবাহিত রূপেন্দ্রনাথ যখন সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন তখন তাঁর ভ্রূযুগলের উপর বিষৎ-খানেক ছিল সযত্নে ক্ষৌরিকৃত। মাথার পিছন দিকে গুচ্ছবদ্ধ অর্কফলায় রক্তকরবী অনুবিদ্ধ। ক্ষৌরিকৃত ওষ্ঠলোম ও শ্মশ্রু। ললাট চন্দনচর্চিত, পরিধানে ফসারিডাঙার মিহি-বুনটের পৌনধনু* গিলে-করা ধুতি।

আর আজ যখন গ্রামের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল তখন তার একমাথা তৈলতৃষিত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম। শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোমে অমন সুন্দর মুখখানা পূর্ণগ্রাস চন্দ্রের মতো আবৃত। পরিধানে অর্ধধনু মলিন বস্ত্র—হাঁটু ঢাকেনি তাতে। ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, যদি সামবেদী দীর্ঘ উপবীতটিকে অঙ্গাবরণ বলে গণ্য করা না হয়। বলা বাহুল্য : নগ্নপদ।

রূপেন্দ্রনাথ সে-কথার প্রত্যুত্তর না করে বলেন, এটি তো শুভ? হ্যাঁরে : তুই তো মস্ত বড় হয়ে গেছিস!

শুভপ্রসন্ন পাণ্ডাজীর হাত ফসকিয়ে ঘনিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পারানি ঘাটে। সেও চিনতে পেরেছে রূপেন-খুড়োকে। এগিয়ে এসে প্রণাম করল—বয়ঃজ্যেষ্ঠ তিনজনকেই। বিধবা কিছু না বুঝেই ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন।

রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল, তাঁর কন্যাটি শিষ্টাচারসম্মত প্রণাম করতে এগিয়ে এল না। দোষ তার নয়, এ-শিক্ষা সে পায়নি এতদিন। তাই তাকে বললেন, এঁকে প্রণাম কর, সোনা-মা!

মেয়েটির পরিধানে দাদামশায়ের দেওয়া রক্তিম রেশমবস্ত্র। দু-হাতে দু-গাছি করে আয়নামোর সোনার চুড়ি। নাকে নোলক, কানে পাৎলা ঢেঁড়ি-ঝুমকো ; আর বিনা-কাজলে কাজলকালো অতলান্ত দুটি হরিণ নয়নে অপার বিস্ময়। পিতার আদেশে সে এগিয়ে এল। বোঝা গেল, মেয়েটি বুদ্ধিমতী—কেউ শেখায়নি, কিন্তু শুভপ্রসন্নের অনুকরণে সে শুধু তারাপ্রসন্নকে প্রণাম করেই থামল না—অপর দুজনকেও পদস্পর্শ করে প্রণাম করল।

শুভপ্রসন্ন বললে, এই মেয়েটা, ভেলভেলেটা! তুই আমাকে প্রণাম করলি নে যে?

চার বছরের বালিকাটি এতদিনে দাসদাসীদের কাছে যে ভাষা শিখেছে সেই ভাষাতেই বললে, ওমা, আমি কনে যাব! তুমি কি বাঁড়ল? তোমার গলায় কি পৈতে আছে?

রূপেন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন। কন্যার ভাষায়, তার বাচনভঙ্গিতে। কিন্তু দোষ তো তাঁরই।

* এক ধনু = 60 ইঞ্চি; ফলে পৌনধনু = 45" = 1143 মি. মি.

অনাদৃতা আত্মজার শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয়নি এতদিন।

জবাবে শুভপ্রসন্ন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলেন তারাপ্রসন্ন : ছিঃ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অমন ঝগড়া করে না!

তারপর রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, এঁকে তো ঠিক...

গ্রামে পদার্পণমাত্র এই অনিবার্য প্রশ্নটির সম্মুখীন যে হতে হবে, এ-কথা জানা ছিল। ওঁর ভদ্রাসন এখন জনমানবহীন। সেই জীর্ণকুটিরে একজন যৌবনবতী বিধবাকে নিয়ে এক বিপত্নিকের পক্ষে বাস করাটা সমাজ মেনে নেবে না। ওঁর গুরুদেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও এযুক্তি দেখিয়েছিলেন। মালতীও বলেছিল। কিন্তু একবগ্গা ঠাকুর কারও পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। এখন লক্ষ্য হল, মালতী মরমে মরে গিয়ে দামোদরের স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে প্রস্তরমূর্তির মতো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, উনি আমার বৌঠান।

—বৌঠান! তোমার কোন বড় ভাইয়ের কথা তো কখনো শুনিনি?

—না, তারাদা, রক্তের সম্পর্ক নেই। এঁর স্বামী ছিলেন আমার বড় ভাইয়ের মতো। আমার গুরুদেবের নিজের ভাগিনেয়—মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি : ঘনশ্যাম সার্বভৌম। সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাই নিয়ে এলাম। উনি এ গাঁয়েই থাকবেন।

তারাপ্রসন্নের কৌতূহল এতক্ষণে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বলেন, বল কী রূপেন! ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয়? পণ্ডিতমশায়ের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনে এঁর স্থানসঙ্কুলান হল না? শুনেছি, তর্কপঞ্চাননের সর্বতোভদ্রে প্রতিবেলায় শতাধিক কলাপাতা পড়ে!

রূপেন্দ্র বলেন, ঠিকই শুনেছ, তারাদা। এর ভিতরে অনেক কথা আছে। মাঝ-সড়কে দাঁড়িয়ে তা আলোচনা না করলেও চলবে। বলব তোমাকে সব কথা। জ্যেঠামশাই কেমন আছেন?

—বাবামশাই? ও! তুমি তো কিছুই জান না। তিনি আজ দু-বছর হল গোলকে গেছেন। আগামী শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে তাঁর তৃতীয়-বার্ষিক শ্রাদ্ধ।

—বল কি! জ্যেঠামশাই নেই!

মর্মাহত হলেন রূপেন্দ্রনাথ। সমগ্র গৌড়বঙ্গে ঐ একটি মানুষকে নিশ্চিতভাবে স্বপক্ষে পাবেন, এই আশা ছিল মনে। বর্ধমানরাজ নয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নয়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও নয়—সোঞাই গাঁয়ের সেই আধুনিকমন জমিদারটিই ছিলেন তাঁর অবচেতন মনের একমাত্র ভরসা। মুহূর্তমধ্যে যেন মনে হল, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। গ্রাম্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রূপেন্দ্রনাথের বিদ্রোহে তাহলে কে হবে সহায়? তারাপ্রসন্ন স্বভাবতই নির্বিরোধী—এবং প্রাচীনপন্থী।

জানতে চাইলেন, আর জেঠিমা?

—বাবামশায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পর্যন্ত তিনি গ্রামেই ছিলেন। তারপর বায়না ধরলেন, কাশীবাসী হবেন। তুমি তো জানই, কাশীর চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে গঙ্গার উপর আমাদের একটি

pathagar.net

মোকাম আছে। এখন তিনি সেখানেই আছেন। স্পাক আহার করেন, গঙ্গাস্নান করেন আর মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়ে বেড়ান।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের। হঠাৎ বলে বসলেন, "নিয়তি কেন বাধ্যতে?"

তারাপ্রসন্ন ম্লান হেসে বললেন, মনে আছে সে-কথা? তোমার ঐ প্রশ্নের জবাবে মা একদিন বলেছিলেন, 'মনসা'!

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, জপের মন্ত্র কি ভোলা যায়?

শুভপ্রসন্নের শিক্ষারম্ভ হয়েছে। শিক্ষা বলতে সংস্কৃত। সে জানতে চায় : ও-কথার মানে কি, বাবামশাই?

তারাপ্রসন্ন বুঝিয়ে দেন, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে?' মানে, 'নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে?' প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে উত্তর : অর্থাৎ নিয়তি অপ্রতিরোধ্য! কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। তোমার ঠাকুমা তা মানতে চাননি। তাই তোমার ঠাম্মা বলেছিলেন : 'মনসা'! অর্থাৎ 'মনের জোর!'

বালক প্রশ্ন করে, মনের জোরে ভাগ্যলেখা বদলানো যায়?

রূপেন্দ্র বলেন : যায় শুভ! তোমার পিতামহী তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। আমাকে মনে করিয়ে দিও, সে গল্প একদিন তোমাকে শোনাব।

মেয়েটি বাবার ধুতির খুঁট ধরে টানে : চলুন না?

তারাপ্রসন্ন নিম্নকণ্ঠে বললেন, একটা কথা রুপেন! তুমি ঠিক কথাই বলেছ—মাঝ-সড়কে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলে না। কিন্তু জরুরী কথাটাকে তো চাপা দেওয়াও চলে না, ভাই। সোঞাই গ্রামখানি তোমার অচেনা নয়। খরজিহ্ব সমাজপতিরা ছিদ্রান্বেষণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তোমার পৈত্রিক ভদ্রাসনটির বর্তমান অবস্থা যে কী, তা তোমার অজানা। আমি জানি। সেখানে এখনই তোমাদের পক্ষে আশ্রয় পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তোমাদের পুবের ঘরখানা ভেঙে পড়েছে, উত্তরের ঘরখানিও বাসোপযোগী নয়। শুধু ঐ দক্ষিণ দুয়ারী ঘরখানি এখনো খাড়া আছে। ভাঙা চালার নিচে জানলা-দরজা এখনও চাপা পড়ে আছে, চুরি হয়ে যায়নি। নেহাত বামুনের বাড়ি বলে। ...শোন, রুপেন। আমার পালকি ঘাটেই অপেক্ষায় আছে। আমাদের নিয়ে এসেছিল। তাতে চেপে ছেলে-মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে বৌঠান বরং আমাদের বাড়িতে চলে যান। শুভপ্রসন্ন ওঁদের নিয়ে যাবে তার মায়ের কাছে। ইতিমধ্যে তুমি আর আমি পদব্রজে সেখানে পৌঁছে যাব। ত্রিরাত্রি না হয় আমাদের বাড়িতেই অতিথি হলে। মানে, যতদিন না তোমার ভিটেখানি বাসোপযোগী করে তোলা যায়।

রূপেন্দ্র তাঁর ঝাঁকড়া চুলে ভর্তি মাথাটা নেড়ে বললেন, তা হয় না, তারাদা। এটা যদি সোঞাই গাঁ না হত, তাহলে ত্রিরাত্রি কেন মাসাধিক কাল সানন্দে তোমাদের বাড়িতে পড়ে থাকতাম। কিন্তু গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে যদি ধুলো-পায়ে প্রথমে বাস্তুদর্শনে না যায়, তাহলে স্বর্গে পিতৃপুরুষের অভিমান হয়। সবার আগে সেই ভাঙাভিটার চৌকাঠে মাথা ঠেকাবার অনুমতিটা আমাকে দিতে হবে তারাদা।

এই সময় একজন অল্পবয়সী জোয়ান এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ হল। রূপেন্দ্রকে জিজ্ঞেস্

করল, পেন্নাম হই দা-ঠাউর! বাস্‌ক-প্যাঁটরা গুলান মাতায় করি আপনার ঠেঁয়ে নে-যাব দ্যাবতা?

রূপেন্দ্র বললেন, তোমাকে তো চিনতে পারছি না, ভাই? এ-গাঁয়ের ছেলে? কী নাম গো তোমার?

—আজ্ঞে মোরা জেতে তাঁতি—মোর নামটো লবা গুঁই এজ্ঞে। জল-অচল নই! মালপত্তর ছুঁলি পরে...

রূপেন্দ্র রুখে ওঠেন, তোমার জাতি জানতে চেয়েছি আমি? বোকা কোথাকার! ঠিক আছে, মাল তোলো। আর শোনো—তোমার নামটা 'লবা' নয়, 'নবা'! ভাল নাম নবীন, বুঝলে?

লোকটা প্রচণ্ড মাথা ঝাঁকানি দিয়ে প্রতিবাদ করে, এজ্ঞে না, ঠাউরমশাই, বোঝলাম না! বোকা হই, মুক্ষু হই, মোর নামটো 'লবা'।

তারাপ্রসন্ন ধমকে ওঠেন, একটি চড়ে তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব, লবা! তুই জানিস্ কার সঙ্গে তর্ক করছিস্? উনি কত বড় পণ্ডিত তা জানিস?

লোকটা বাক্স-প্যাঁটরা মাথায় ওঠাতে শুরু করেছিল। বললে, সে-কতা তো বলচিনি। বলচি কি মোর নামটো মুই জানবনি, পণ্ডিতে এসে বিধান দিলি জান্তে পারব? সেই ন্যাংটো বয়স থিকে সবাই মোরে ডাকে 'লবা'! আপনের ঐ বিরাশিশিক্কে চড়ে বাপের নামটো ভুলতি পারি, কিন্তুক নিজের নামটো ভুলি ক্যামনে?

তারাপ্রসন্ন বিরক্ত হয়ে বলেন, তুই বড় তর্ক করিস্ লবা। নে চল!

কোথাও কিছু নেই খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে রূপমঞ্জরী।

তারাপ্রসন্ন তার দিকে ফেরেন। বলেন, তোমার আবার কী হল? এত হাসি কিসের?

ছোট্ট মেয়েটি বললে, আপনি অরে গালমন্দ করছেন বটে, কিন্তু প্রিতিবারই ডাকছেন 'লবা' নামে, 'নবা' নয়।

তারাপ্রসন্ন অবাক হলেন। রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললেন, ভায়া, তোমার এ-মেয়ে কালে তর্কালঙ্কার হবে।

নেহাৎ রসিকতা। কিন্তু স্বগ্রামে পদার্পণমাত্র ভবিষ্যৎ-মহাপণ্ডিতা হটী শুনলেন এক অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী। না 'তর্কালঙ্কার' উনি হননি—হয়েছিলেন 'বিদ্যালঙ্কার'। বোধকরি ভারতভূখণ্ডে উপাধিদানপ্রথা প্রচলিত হবার পর প্রথম মহিলা 'বিদ্যালঙ্কার'। কিন্তু সে সম্ভাবনার কথা এ রসিকতার ভিতর বাষ্পমাত্রও ছিল না। বিস্মিত হয়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথও। আশ্চর্য! তারাপ্রসন্নের যুক্তি যে স্বয়ংবিরোধী এটা তো তাঁর নিজেরও খেয়াল হয়নি! অথচ ঐ এক ফোঁটা মেয়েটা নজর করেছে!

তারাপ্রসন্ন শুভকে প্রশ্ন করেন, রুপেন খুড়োর ভিটেটা চিনিস তো? তোরা তিনজনে পাল্‌কিতে রওনা দে, আমরা পায়ে হেঁটে আসছি।

মালতী পাল্‌কিতে ওঠার আগে স্পর্শ বাঁচানো একটি প্রণাম করল তারাপ্রসন্নকে পাল্কিবাহকেরাও দেখাদেখি প্রণাম করল রূপেন্দ্র, মালতী ও মালিককে। সর্দার পাল্‌কিবাহক বলে, ছুটকর্তারে চিনাতে হবে কেন গো, কর্তামশাই? ধন্বন্তরি-বাবাঠাউয়ের ভিটে না চিনে

কুন সুবুদ্ধির পো?

শুভপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরীকে উঠিয়ে নিয়ে মালতী রওনা দিল পাল্‌কিতে। পিছন-পিছন ভিজে-কাপড় নিয়ে অনুগমন করল নীরবকর্মী কালিপদ। নবা-ই হোক অথবা 'লবা', বাক্স-প্যাঁটরা মাথায় নিয়ে চল্‌ল পাল্‌কির পিছু-পিছু। রূপেন্দ্র চলবার উপক্রম করতেই তাঁর হাতখানা চেপে ধরলেন তারাপ্রসন্ন। রূপেন্দ্র আন্দাজ করলেন হেতুটা। তবু বললেন, কী হল আবার?

—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করা কি ঠিক হবে রুপেন? সমাজ এটা কিছুতেই মেনে নেবে না। নিতে পারে না।

—কেন? আমরা অন্যায় তো কিছু করছি না। আমার যদি নিজের বড় ভাই থাকতেন, তাহলে তাঁর বিধবা...

—কী হলে কী হত সে আলোচনা থাক। জগু-পিসিমা অথবা কাত্যায়নী যদি তোমার ভিটায় থাকতেন তাহলে আমি আপত্তি করতাম না—

—তোমারও আপত্তি? সমাজপতি হিসাবে? জ্যাঠামশাই নেই বলে?

—তারাপ্রসন্ন মাথা নেড়ে বললেন, জিদ্দিবাজি কর না, একবগ্গা। এ হয় না, হতে পারে না। নিঃসম্পর্কীয় দুটি মানুষ—একজন ত্রিশবছরের বিপত্নিক যুবাপুরুষ, অপরজন বিংশতিবর্ষীয়া বিধবা—অন্য প্রাপ্তবয়স্কার অনুপস্থিতিতে এক ঘরে রাত কাটাতে পারে না। তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। নবাবী ফতোয়ার মতো, সামাজিক আইনও ব্যক্তি বিশেষের চারিত্রিক দোষগুণে পরিবর্তিত হতে পারে না।

রূপেন্দ্র বললেন, আমি নিরুপায়, তারাদা। তুমি ব্রাহ্মীলিপি পড়তে পার?

—ব্রাহ্মীলিপি? সেই অশোকের অনুশাসন যে ভাষায় লেখা হত? না, পারি না। তা এর মধ্যে হঠাৎ ব্রাহ্মীলিপির প্রসঙ্গ এল কেন?

—বলব, তারাদা; সবকথা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। আমি নিরুপায়। সমাজ যদি আমাকে একঘরে করে, শাস্তি দেয়, আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। এটুকু তোমাকে বলি : ওঁর স্বামী ঘনশ্যাম সার্বভৌম ছিলেন এক অলোকসামান্য মহাপণ্ডিত। মৃত্যুকালে আমাকেই অনুরোধ করে গেছেন তাঁর বিধবাকে আশ্রয় দিতে। বৌঠানের পিতৃকুল-মাতৃকুলে কোথাও ঠাঁই হবে না। আমার গুরুদেবের আশ্রয়েও উনি থাকতে রাজি হলেন না, বিশেষ হেতুতে—বস্তুত বৌঠানের ধারণা ঘনশ্যামের মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার গুরুদেব। তাই প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে ওঁর। ভেবে দেখ, তারাদা—আমি বিপত্নিক, একটি মাতৃহারা চারবছরের শিশুকে নিয়ে গ্রামে নিজের ভিটেতে এসে উঠছি—এখানে কেউ নেই। পিসিমা নেই, কাত্যায়নী নেই। এক্ষেত্রে আমরা দুজন তো পরস্পরের সমস্যার সমাধানমাত্র। আমি ওঁকে জোগান দেব আশ্রয়, আহার্য, লজ্জানিবারণের বস্ত্র এবং নিরাপত্তা। বিনিময়ে বৌঠান আমার সংসারটা দেখবেন। সন্ধ্যাবেলায় আমার বাস্তুভিটায় তুলসীমূলে প্রদীপ দেবেন। আমার সন্তানকে মানুষ করবেন। এতে আপত্তির কী আছে?

—আপত্তি তোমাদের দুজনের বয়সে। আপত্তি তোমাদের বাড়িতে তৃতীয়ব্যক্তির

অনুপস্থিতি। এমন সহজ কথাটা কেন বুঝছ না? তুমি কুলীন, বিপত্নিক, অত্যন্ত সুদর্শন, সুপাত্র...

—তাতে কী হল?

—কী আশ্চর্য! কেন বুঝছ না, রুপেন? এ-গাঁয়ে তোমাদের পালটি ঘরের এক কুড়ি অরক্ষণীয়া কুলীন কন্যার নাম আমি এখনি বলে দিতে পারি। তারা এবং তাদের অভিভাবকদের খরজিহ্বা লক্‌লক করে উঠবে না এমন মুখরোচক কেচ্ছায়?

—কেচ্ছায়?

—নিশ্চয়ই! একটিমাত্র ঘরে চারবছরের মেয়েটিকে নিয়ে তোমরা কীভাবে শয়ন করবে? বৌঠান কি মাটিতে শোবেন, না তুমি? না কি আর পাঁচটা সদ্যসন্তানগর্বিত দম্পতি যেমন সন্ধ্যারাতে বাচ্ছাটাকে মাঝখানে রেখে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়ায়, আর তারপর...

—আঃ! থাম তুমি, তারাদা!

তারাপ্রসন্ন হেসে বলেন, তোমার ধমকে আমি না হয় থামলাম, বিশেষ আমি ভালকরেই চিনি একবগ্গা ঠাকুরকে। কিন্তু দুর্গা গাঙ্গুলী? ন্যায়রত্ন মশাই? সদু-জ্যাঠাইমা? শশাঙ্ক ঘোষাল? নন্দ চাটুজ্জে? এঁদের খরজিহ্বাকে তুমি থামিয়ে দিতে পারবে? তার চেয়ে এক কাজ কর। ঐ ওনাকে—ঘনশ্যাম সার্বভৌমের বিধবাকে—আমাদের বাড়িতে রেখে দিয়ে এস। তুমি যদি ওঁকে আশ্রয়, আহার্য, বস্ত্র এবং নিরাপত্তা দিতে পার, রুপেন, তাহলে বাপ-ঠাকুর্দার আশীর্বাদে আমিও তা দিতে পারি। উপরন্তু আমি ওঁকে আরও একটি দুর্লভ বস্তুর জোগান দিতে পারি, যা তুমি পার না—

—সেটা কী?

—খরজিহ্ব, কুৎসারটনাকারীর আক্রমণ থেকে মুক্তি। আমার স্ত্রী বর্তমান, তোমার তা নেই। অন্তত যতদিন না তোমার ভদ্রাসনে দু-খানি শয়নকক্ষ খাড়া করা যাচ্ছে ততদিন তুমি আমাকে বাধা দিও না, রুপেন। এই আমার শেষকথা।

রূপেন্দ্র সম্মত হলেন। বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু ঠিক ঐ কয়দিনই। বৌঠান না হলে মনে ভাবতে পারেন আমি তাঁকে গলগ্রহ মনে করছি। আর তাছাড়া আমার কন্যাকে মানুষ করা, আমাদের ভিটায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো ইত্যাদি করবে কে? দেখছ না দাসদাসীদের মধ্যে মানুষ হয়ে আমার মেয়ের মুখের ভাষাটা কী বিশ্রি হয়ে গেছে?

চলতে শুরু করেছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। হঠাৎ তারাপ্রসন্ন আবার ওঁর হাতটা চেপে ধরেন : ভাল কথা মনে পড়ে গেল! এট্টু এদিকে সরে এস তো। একটা গোপন কথা আছে।

ভ্রূকুঞ্চন হয় রূপেন্দ্রনাথের। বিনাবাক্যব্যয়ে সড়ক ছেড়ে একটু ফাঁকা জায়গায় দুজনে সরে আসেন। তারাপ্রসন্ন বললেন, আর একটি বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন। হয়তো এ গ্রাম্য রটনাটার বিষয়ে তুমি এখনো কিছু জান না। যে-কোন সময়ে যে-কোন দিন থেকে অতর্কিত আক্রমণ আসতে পারে। তাই সতর্ক করা—

—রটনা! কী বিষয়ে রটনা?

—গেল বছর অঘ্রানমাসে গাঙ্গুলী-খুড়ো সস্ত্রীক পুরীধামে তীর্থ করতে গেছিলেন। প্রায়

ছয়মাস পরে গাঁয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু একা! একা কেন? সবাই শুধায়, খুড়ো রা কাটে না। প্রথম কিছুদিন কাউকেই কিছু বলেনি। পীতুখুড়ো—মানে মীনুর বাবা গিয়েছিল জিজ্ঞেস করতে। দুর্গা খুড়ো তাকে মারতে বাকি রেখেছে। তারপর সে ধীরে ধীরে নানা মজলিসে নানান গুজব ছড়াতে থাকে। কখনো বলে, 'আমার পোড়া কপাল', কখনো বলে, 'সে আবাগীর কপালে স্বর্গসুখ সইবে কেন?' আবার কখনো বা জুৎসই সঙ্গী পেলে বলে, 'সে কলঙ্কের কথা আর শুনতে চেও না ভায়া, আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা!' কার মাধ্যমে কী-করে কথাটা প্রথম রটল জানি না, একদিন দেখা গেল গাঁ-শুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে, তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে তোমার নাকি আচমকা দেখা হয়ে গেছিল! সত্যি কথা?

—হ্যাঁ! নিতান্ত ঘটনাচক্রে। ফরাসীডাঙার ঘাটে। বর্ধমানের ইজারাদার নগেন দত্ত আমাকে হঠাৎ ঘাটে বসে থাকতে দেখেন। চিনতে পারেন। নৌকায় তুলে নেন!

—তাহলে রটনাটা সত্যি! তুমি ঐ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে এক বজরায় গেছিলে?

—হ্যাঁ সত্যি। তাতে কী হল?

—নগেন দত্তের স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলে তুমি?

—হ্যাঁ, করেছিলাম। কিন্তু এসব কী জেরা শুরু করলে তুমি! কেন এসব প্রশ্ন করছ বলত? পালকি ওদিকে পৌঁছে গেছে।

—যাক। যা জানতে চাইছি তা বল। তুমি আগে থেকে জানতে না যে, নগেন দত্ত একটা বিরাট বজরা নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছে, আর তীর্থযাত্রীদলে আছে গাঙ্গুলী খুড়ো আর মীনু খুড়িমা? তুমি ফরাসীডাঙায় ওদের বজরার জন্যে ঘাটে প্রতীক্ষা করছিলে না?

এবার রূপেন্দ্রনাথ কিছুটা আঁচ পেলেন: গুজবটা কী আকারে ছড়িয়েছে! বললেন, না। আমি তো আগেই বলেছি, তারাদা। বজরায় বসে নগেন দত্ত দূরবীন দিয়ে চারিদিক দেখছিলেন। ঘটনাচক্রে আমাকে দেখতে পান, চিনতে পারেন, এবং প্রায় জোর করে বজরায় তুলে নেন। আমি গঙ্গার ঘাটে বসেছিলাম খালি গায়ে, খালি পায়ে। একবস্ত্রে। তুমি হয়তো জান না, নগেন দত্তের সহধর্মিণীর চিকিৎসা আমি করেছিলাম; কিন্তু বৈদ্যবিদায় নিইনি। বলেছিলাম, তিনি রোগমুক্তা হলে তার পর আমি বৈদ্যবিদায় গ্রহণ করব। নগেন দত্ত তাই আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন শ্রীক্ষেত্রে। সমস্ত খরচপত্র তাঁর; মায় আমার পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত কিনে দিয়েছিলেন।

—শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছবার পর গাঙ্গুলী খুড়ো, তুমি আর মীনু খুড়িমা তিনজনে মিলে কী একটা ভাঙা মন্দির দেখতে গিয়েছিলে? যেখানে মূর্তি নেই, নিত্য পূজার ব্যবস্থা নেই, লোকালয় নেই? সেখানে একরাত্রি বাসও করেছিলে?

—হ্যাঁ, কোনার্কের সূর্য মন্দির! ওঁরা দুজনে গো-গাড়িতে যান, আমি ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলাম। কেন বল তো?

—কেন সেখানে গেছিলে রূপেন? সে মন্দিরে তো দেবতা নেই, নিত্যপূজার ব্যবস্থাও নেই! আর ভাঙা মন্দিরে নাকি সারি সারি অশ্লীল মিথুনমূর্তি!

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, এ তো আজব কথা শোনালে তারাদা ! কোনার্ক সূর্যমন্দিরের নাম তুমি শোননি অথচ এটুকু জান যে, সেখান 'সারি সারি অশ্লীল মিথুনমূর্তি'।

—ঐ মন্দির সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি তা দুর্গা-খুড়োর কাছে। খুড়ো বলেছিল, সেখানে তোমরা তিনজন একরাত মাত্র ছিলে। আর তুমি একেবারে ভোররাতে ঘোড়া ছুটিয়ে পুরীতে ফিরে এসেছিলে। খুড়োকে কিন্তু না জানিয়ে।

—এসেছিলাম। না জানিয়ে নয়। ভোর রাত্রে যখন আমি ঘোড়া ছুটিয়ে পুরীধামের দিকে রওনা দিই তখন খুড়ো আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে না জানিয়ে আমি চলে আসিনি।

—আর মীনু খুড়িমা ?

—কী মীনু খুড়িমা ?

—সে তখন কোথায় ?

—কী বলতে চাইছ ? খোলাখুলি বল দিকি, তারাদা।

তারাপ্রসন্ন এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে প্রথমে নির্জনতার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর নিম্নস্বরে বললেন, দুর্গা খুড়ো এক-একজনকে এক-এক রকম গল্প বলেছেন। বাবামশাই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খবর নিতে, কেন মীনু খুড়িমা ফিরে আসেনি। আসলে তার আগে মীনুর বাবা— পীতু মুখুজ্জে গোপনে দরকার করতে এসেছিলেন বাবামশাইয়ের কাছে। তাঁর মেয়েটা কেন স্বামীর সঙ্গে ফিরে এল না, জানতে। বাবামশাইয়ের কাছে দুর্গা খুড়ো যে কথা বলেছিল তা এই: ঐ সূর্যমন্দিরের এক পাণ্ডার বাড়িতে তোমরা তিনজনে রাত্রিবাস করেছিলে। একঘরে খুড়ো আর খুড়িমা। অন্য ঘরে তুমি একা। ভোর রাত্রে দুর্গাখুড়োর ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসে দেখে সে একা শুয়ে আছে। খাটের পাশের অংশটা খালি। খুড়ো প্রথমে কিছুটা অপেক্ষা করে—ভেবেছিল, মীনু খুড়িমা বুঝি বাগানে গেছে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। কিন্তু আধঘণ্টা পার হয়ে যেতে সে তোমার ঘরে গিয়ে করাঘাত করে। আশ্চর্য ! সে ঘরে কেউ ছিলো না। সেই ভোররাত্রে ! মীনু খুড়িমাকেও তারপর থেকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, এই কথা জ্যাঠামশাইকে বলে ছিল দুর্গাখুড়ো ?

—হ্যাঁ ! কিন্তু নন্দ চাটুজ্জেকে সে অন্য এক গপ্পো শুনিয়েছে। বলেছে, সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত— বোধহয় দোলপূর্ণিমা। শেষ রাত্রে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে ওর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের বিছানা খালি দেখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। আর চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় তুমি মীনু খুড়িমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়েছ। হুবহু সংবৃত্তান্তবর্ণন। বৃদ্ধের চোখের সম্মুখে তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে ধু-ধু করা সমুদ্রের তটরেখা ধরে মীনুকে নিয়ে চলে গেলে— কী জানি কোথায় ! তারপর থেকে দলের কেউ আর তোমাদের দুজনকে দেখেনি। না তুমি, না মীনু খুড়িমা !

দুরন্ত ক্রোধ সংবরণ করে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন রূপেন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, এখনই চল, তারাদা। দুর্গাখুড়োর ভিটেতে ! আমার চোখে চোখ রেখে এতবড় মিথ্যা কথাটা সে বলতে পারে কি না আমি দেখতে চাই। উঃ ! কী পৈশাচিক মিথ্যাচার ! খুড়ো

pathagar.net

জানে, মীনু কোথায় !

—কোথায় ?

—সে গলায় দড়ি দিয়েছিল ! কেন জান ? খুড়ো তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পুরীধামে নিয়ে গিয়েছিল একটি ক্ষেত্রজ পুত্র সমেত প্রত্যাবর্তন করবে বলে। মীনু প্রথমে বুঝতে পারেনি বুড়োর চালাকি। বুঝলে, সে তীর্থে যেতই না। যখন বুঝল তখন সে প্রতিবাদ করেছিল। অজানা অচেনা একটা পুরুষের বলাৎকারকে সে ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে নিতে পারেনি ! তাই আত্মহত্যা করেছিল। সে আত্মহত্যা ঘটনার অন্তত দু'শ সাক্ষী আছে। অন্তত বর্ধমানভুক্তির ইজারাদার নগেন দত্ত— যিনি বজরা ভাড়া করে দু'শ যাত্রী নিয়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেছিলেন—তিনি জানেন ! সম্ভবত তাঁরই খরচে পুরীর স্বর্গদ্বারে মীনুর সৎকার হয়; আর ঐ নরপিশাচই নিশ্চয় মুখাগ্নি করেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তারাপ্রসন্নের। বললেন, বাবামশাই তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু একটা কথা, তুমি কেন সেক্ষেত্রে যাত্রীদলের সঙ্গে ফিরে এলে না ?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, সেসব গবেষণা পরে কর, তারাদা, সবার আগে দুর্গা খুড়োর ভিটেতে চল দেখি !

তারাপ্রসন্ন বলেন, না ! গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরলে সবার আগে তাকে ধুলো-পায়ে বাস্তুভিটাতে গিয়ে চৌকাঠে মাথা ঠেকাতে হয়।

থমকে যান রূপেন্দ্রনাথ !

—তাছাড়া আরও একটা অসুবিধা আছে। দুর্গা-খুড়ো এখন গ্রামে নেই। ফাগুনের শেষাশেষি তিনি গাঁ-ছাড়া হয়েছেন।

—কোথায় গেছে ?

—আবার সস্ত্রীক পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চলে গেছেন। ওঁর সেই গুরুদেবের ব্যবস্থাপনাতেই। এবার পুত্রলাভ নির্ঘাৎ ! কারণ এবার সঙ্গে আছে জোড়া-বউ ! উপর্যোপরি বলাৎকারে দুটোই যতদিন না নিশ্চিত গর্ভবতী হচ্ছে ততদিন খুড়ো 'হত্যা' দিয়ে পড়ে থাকবে। একটানা একটার পুত্রসন্তান হবেই। হবে না ?

না। থামিয়ে দেওয়া যায়নি। ব্যর্থ হয়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইসব ন্যক্কারজনক সামাজিক বিধান চালু ছিল। প্রতিবাদের কণ্ঠ কোথাও সোচ্চার হয়ে ওঠেনি।

অধ্যাপক অসিতকুমার অপরিসীম আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন, "ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (1707) হইতে পলাশীর যুদ্ধের (1757) কাল— এই অর্ধশতাব্দীই জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কার্য। মুঘল-মহিমা অনেক পূর্বেই অস্তমিত হইয়াছে, শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, দুই-একজন সুবেদার বাংলা শোষণ করিয়া ঐশ্বর্যবিলাসে ঘৃণ্য জীবন যাপন করিয়া বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনেক পূর্বেই অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমাজেও তখন ঘুণ ধরিয়াছিল। পুরাতন ভূস্বামী-সম্প্রদায় ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, শিক্ষাদীক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিয়াছিল,— এই অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা দেশের পক্ষে চূড়ান্ত

হতাশার কাল; চারিত্র, মনুষ্যত্ব, সুস্থ জীবন— সব দিক দিয়াই বাঙালী জীবনে ক্ষয়ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।... রাষ্ট্র ভাঙিল, সমাজ ভাঙিল, জীবনের সুস্থ আদর্শ ভাঙিল এবং জীবন হইতে যে-সাহিত্যের জন্ম হয় তাহাও ভাঙিয়া পড়িল। তাই বাংলা দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধকে 'ভাঙিয়া পড়ার ইতিহাস' বলা যাইতে পারে।" *

কিন্তু শুধু প্রথমার্ধটুকুই বা কেন? গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীই তো বঙ্গ-সংস্কৃতিতে ভেঙে পড়ার ইতিকথা—একবারে অন্তিম দুই দশক বাদে। যখন রামমোহন রায় সাবালকত্ব লাভ করে ঐ আদ্যন্ত ক্লেদাক্ত পর্বতাকার পুরীষ হারকিউলিসের মতো পরিমার্জনা করতে উদ্যত হলেন।

শতাব্দীর ঊষাযুগে বাঙলার দক্ষিণাঞ্চলে শুরু হয়েছিল মগ-আরকান-পর্তুগীজ বোম্বেটে জলদস্যুদের অত্যাচার, যার ফলে, রাজশক্তির ব্যর্থতায় অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রায় সহস্রাব্দীব্যাপী বাঙালির বাণিজ্য এবং সমুদ্রযাত্রা। তারপরেই শুরু হল বর্গীর হাঙ্গামা (1742)। একটিমাত্র দশকে উড়িষ্যাসমেত বাঙলার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ শ্মশান হয়ে গেল। সে পর্ব মিটতে না মিটতেই পলাশী প্রান্তরে যৌথ বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীনতা হারালো গৌরবঙ্গ। শহীদ হলেন মীরমদন, মোহনলাল! কেউ খোঁজ নিল না: হিন্দু না ওরা মুসলিম! এল কোম্পানির রাজত্বের অরাজকতা। ক্রমান্বয়ে মীরজাফর, রেজা খাঁ এবং দেবীলালের নির্মম শোষণ। এবারেও কেউ খোঁজ নিল না: হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওদিকে বেনিয়া ইংরেজের রাজশক্তিলাভে অবলুপ্ত হয়ে গেল বাঙলার তাঁত আর রেশম শিল্প, যাবতীয় কুটিরশিল্প এবং লবণ-ব্যবসায়। দেশ-বিদেশ থেকে বাঙালি সওদাগর নানান বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আসত সিংহল, কাম্বোজ, চীনদেশ থেকে: নানা জাতের মশলা, এলাইচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল, জাফরান, চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত আর পরিবর্তে সেসব দেশে পৌঁছে দিতে মসলিন, কাঁসার কাজ, রূপোর ফিলিগ্রি, হাতির দাঁতের শিল্প। ঐসব চারু ও কারু শিল্প তো শতাব্দীর প্রারম্ভেই বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবর্তে চালু হয়েছে মুসলমান রেজা খাঁ কিংবা হিন্দু দেবীলালের মতো পিশাচের নির্মম-নিষ্ঠুর কর আদায়! বন্যাই হোক অথবা খরা—মাঠে ফসল হোক বা না হোক কৃষিজীবী মানুষকে বউ-বেটি-বেচে কর যোগাতে হবে।

এইসব কিছুর মিলিত ফলশ্রুতি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (1769)। আমরা এখনো তার দ্বারদেশে এসে উপনীত হই, তবু তিল তিল করে সেই মহামৃত্যুর অভিমুখেই চলেছি। মহামৃত্যু! অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লেদাক্ত ইতিহাস! তাহলে সেই মানবিকতার চরম অবমাননার কথা যেন শোনাতে বসেছি তোদের? এ প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি— রূপমঞ্জরীর প্রথমখণ্ডের 'কৈফিয়ত'-এ। দশবছরের পরিশ্রমে এতদিনে রূপমঞ্জরীকে তার স্বগ্রামে পৌঁছে দিয়ে আবার সেকথা কেন বলছি জানিস, দিদিভাই? কারণ: জপমন্ত্রে পুনরুক্তি দোষ হয় না।

কারণ আমি বিশ্বাস করি: নিষ্প্রভাত অমারাত্রি হয় না।

---

* *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।। তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব: ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 1982, পৃ: .2*

আমি সন্ধান করতে চেয়েছি—এই ক্লেদাক্ত পরিবেশে কী করে, কোন্ কার্যকারণসূত্রে, রাধানগরে আবির্ভূত হলেন নূতন যুগসূর্য। স্বয়ম্ভু লিঙ্গের মতো কোন অলৌকিক ক্ষমতায় মেদিনী বিদীর্ণ করে এই শ্মশানে এসে উপস্থিত হননি রাজা রাম। এমনটা হয় না, হতে পারে না। একথাই শিখিয়েছে সভ্যতার ইতিহাস। বিবর্তনের একটি ফল্গুধারা নিশ্চয় প্রবাহিত ছিল, যা আমরা নজর করিনি। লোকচক্ষুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নিশ্চয় পৌঁছে দিয়েছিলেন মশালটিকে— নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে পাগল বিদ্রোহী পণ্ডিতের পর্ণকুটীর থেকে রাধানগরের রাজপ্রাসাদে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য, তখন এ তথ্য অবধারিত যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কে বা কারা করে গেছেন 'রাত্রির তপস্যা।'

বুড়ো-ইতিহাস সে-কথাটা বেমালুম ভুলে বসে আছে।

তাই খুঁজতে শুরু করেছিলাম কীটদ্রষ্ট পুঁথির পৃষ্ঠায় সেই সব সাধকদের নাম। দেশসেবক আর সমাজসেবক। শুধু অধ্যাত্ম সাধক নন।

তোমরা যদি জিজ্ঞেস কর: কেন গো দাদু ? কী দায় পড়েছে তোমার ? এই বৃদ্ধ বয়সে হরীতকীর বদলে 'সরবিট্রেট' চুষতে চুষতে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছ সেই অতীত ইতিহাস ? কেন জানতে চাও ঐ বিস্মৃত মানুষগুলোর কথা ? বাস্তবের ঐ হটী, হট্ট, দ্রবময়ী অথবা বুনো রামনাথের কথা ? অথবা তোমার মানসলোকের ঘনশ্যাম, রূপেন্দ্রনাথ অথবা রূপমঞ্জরীর অন্তরঙ্গ কথা ?

তাহলে জবাবে আমি বলব: কী জানিস দিদিভাই ? তোরা খেয়াল করে দেখিসনি। পাতার মাথায় সালটা বদলে গেছে। 1748 নয়, আমি আছি 1996-এ। আড়াইশ বছর প্রগতির পথ অতিক্রম করে এসে আমড়াতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে এই পরিচ্ছেদটা রচনা করছি। আমরা আজ স্বাধীন! ভোট দিয়ে আমাদের শাসক-শোষক নির্বাচন করতে পারি, করছিও। লাল-নীল-গেরুয়া-সবুজ। রাজশয্যায় উপস্থিত আছেন ঔরঙ্গজেব, মীরজাফর, রেজা খাঁ আর দেবীলাল। যাকে ইচ্ছে বেছে নিয়ে তোরা গদীতে বসাতে পারিস।

সমাজ আছে একই অবস্থায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অসিতকুমারকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে কি আমরা চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিতে পারিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে ? আজ বাঙলা ও বিহার কি রেজা খাঁ দেবীলালকে হারিয়ে দিতে পারেনি ? ক্লাইভ আর ওয়ারেন্ট হেস্টিং যে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন তা কি আমাদের স্বাধীন ভারতের ষড়যন্ত্রীমশাইদের যৌথ উৎকোচের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর নয় ? কলকাতায় বসে পুরীর নিশ্চলানন্দজী (বর্তমান শঙ্করাচার্য) নিদান হেঁকেছেন (জানুয়ারি '94): নারীর বেদপাঠের অধিকার নেই। কেন ?

নিশ্চলানন্দর যুক্তি: যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিই বেদপাঠের অধিকারী। যজ্ঞোপবীত গ্রহণের জন্য কৌপীনধারী হিসাবে, উন্মুক্ত উরসে ভিক্ষা চাইতে হয়। এই ধরনের ধর্মাচরণের লজ্জা থেকে মেয়েদের অব্যাহতি দিতেই শাস্ত্রের এই নিষেধাজ্ঞা। কী অসাধারণ যুক্তি! প্রণাম জানাই যিনি এই সন্ন্যাসীর উপাধি দিয়েছিলেন: নিশ্চলানন্দ! সার্থকনামা এই শঙ্করাচার্য! কেউ প্রতিপ্রশ্ন করতে পারবে না: তাহলে বেদের একাধিক শ্লোক কীভাবে রচনা করেছেন

বিশ্ববারানাশ্বী মহাপণ্ডিতা? কীভাবে কণ্ঠস্থ ছিল বেদের সূক্ত —গার্গী, মদালসা, মৈত্রেয়ী থেকে ঐতিহাসিক হটী বিদ্যালঙ্কারের? একথা নিশ্চলানন্দকে কেউ প্রশ্ন করেনি। কারণ প্রধানমন্ত্রী থেকে অনেক ভি. আই. পি. তাঁর শিষ্য —অন্ধস্তারক। যিনি যত বড় 'ফোর-টোয়েন্টি' তিনি তত বড় অন্ধ ভক্ত!

দুঃখ হয় আদি শঙ্করাচার্যের জন্য। তাঁর সৃষ্টি পুরীধামের পীঠে আজ যে নিশ্চলানন্দ অধিষ্ঠিত তিনি জানেন না যে, সে-কালে ভারতবর্ষে স্ত্রী-জাতীয়ারা ছিলেন দুই প্রকারের —'ব্রহ্মবাদিনী' এবং 'সদ্যদ্বায়া'। তার ভিতর ব্রহ্মবাদিনীরা মৌঞ্জীবন্ধন, উপনয়ন, বেদাধ্যায়ন এবং স্বগৃহাভ্যন্তরে ভিক্ষাচর্যায় ব্রহ্মচারিনীর সকল ব্রতই পালন করতেন। 'সদ্যদ্বায়া'রা স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে ধর্মাচারণ করতেন।

বৃদ্ধযম-সংহিতার তাই নির্দেশ আছে :

পুরা-কল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈমিধ্যাপয়েৎপর?।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিধীয়তে।
বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ।।

অর্থাৎ, পুরাকল্পে কুমারীদিগের মৌঞ্জীবন্ধন (মেখলা-ধারণ, অর্থাৎ আজানুলম্বিত কটিবস্ত্রধারণ) বেদাধ্যয়ন এবং সাবিত্রীপাঠের ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা গৃহাভ্যন্তরে পিতা, পিতৃব্য এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট অধ্যয়ন করতেন। কৌপীনধারী নয়, কটিবস্ত্রধারিনী হিসাবে উন্মুক্ত উরসে শুধু জননীর কাছ থেকে স্বগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করতেন—ব্রহ্মচারিণী হিসাবে। জটা, বল্কল এবং অজিন ব্রহ্মচারিণীর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণ চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে বেদাধ্যয়নাদি করতেন। ব্যাপকভাবে আজ তা প্রচলিত নয় বটে; কিন্তু পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলাচন্দ্র যদি 'নিশ্চল' না থেকে ভারতের যে-কোন সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে পদধূলি দেন, তা হলে আজও তা দেখতে পাবেন। এই কলকাতা শহরেই একাধিক সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম আছে—সারদামায়ের নামে, আদ্যাপী.. প্রভৃতি।

কিন্তু নিশ্চলানন্দ সেসব খোঁজ রাখেন না। অন্ধ বিশ্বাসে ভ্রান্ত নির্দেশ জারি করে সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছেন।

শুধু এই ভারতে নয়— সর্বত্র। খোমেনি ফতোয়া জারি করে বসে আছেন: সলোমন রুসদির মুণ্ড চাই। প্রতিবেশী বাঙলাদেশ থেকে তসলিমা বিতাড়িতা। নোয়াখালি অঞ্চলের দুলালি বেগমের উপর ১০১ বার বেত্রাঘাত করার ফতোয়া জারি করেছেন কোরগঞ্জ মসজিদের বড়ে-ইমাম (18.1.96)। দুলালির অপরাধ? চার-বিবির অধিকারে স্বাধীকারপ্রমত্ত দুলালির খসম্ তাকে উপেক্ষা করত। ফলে সে এক বন্ধুর প্রতি অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। শুনেছি, এ ফতোয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বাংলাদেশ মহিলামঞ্চ। সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন ইমাম। শেষ সংবাদ জানি না। তাহোক। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরীর যে শঙ্করাচার্য রূপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন— সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত, স্ত্রীশিক্ষা বর্জনীয়,

গঙ্গাবক্ষে সন্তানবিসর্জন অনুমোদনীয়, সেই কূপমণ্ডুকের সঙ্গে আড়াইশ বছর পরেকার নিশ্চলানন্দের কোন পার্থক্য আছে কি? একটি প্রভেদ আছে অবশ্য — তখন শঙ্করাচার্যের রাজনৈতিক সমর্থন ছিল না। এখন আছে। এখন সি. বি. আই. সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যাদের কোটি কোটি টাকা অবৈধ উপার্জনের জন্য তদন্ত করছে তারা ঐ ধর্মের গোঁড়ামির সমর্থক। শঙ্করাচার্য থেকে বাল থ্যাকারে।

ভিজা-কাপড়ের পুটুলিটা নিয়ে কালিপদ সরাসরি চলে গেছে জমিদার বাড়ি। তারাপ্রসন্ন তাকে গোপন নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন— মধ্যাহ্নভোজন আরও দু-জন করবেন। তিনি নিশ্চিত, বাস্তুভিটা দর্শনান্তে রূপেন্দ্রনাথ জমিদারবাড়িতে আতিথ্যস্বীকারে বাধ্য হবেন।

এদিকে পালকিটা এসে পৌঁছেছে ভগ্নস্তূপের সামনে। পালকি থেকে নেমে মালতী অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল রূপেন্দ্রনাথের বাস্তুভিটার ভগ্নস্তূপ। শুভপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরীর ঝগড়া-বিবাদ থেমেছে। পালকির মধ্যে মালতীর মধ্যস্থতায় তাদের ভাব হয়ে গেছে। হাত ধরাধরি করে তারা ধ্বংসস্তূপের দিকে অগ্রসর হতেই নিষেধ করল পালকি-বাহকদের সর্দার, ওদিকপানে যেওনি সোনামনিরা! মানষের বাস তো লাই। তেনারা থাকতি পারেন।

রূপমঞ্জরী তার ডাগর-চোখ মেলে বলে, তেনারা কে গ?

মালতী ওদের দুজনকে কাছে টেনে নেয়। বলে, ও সাপখোপের কথা বলছে। তোমরা ঐ গাছতলায় গিয়ে বস। ওঁরা এখনি এসে যাবেন।

লবা তার মাথার বোঝাটা দেখিয়ে শুধালো, এগুলান খুব কুথায়?

সর্দার-বাহক ধরাধরি করে বাক্সপ্যাঁটরা নামালো। বলল, দেখতিই তো পাচ্ছ বাপু, এ-ঠাঁয়ে মানষে বাস করতি পারবেনি। কত্তামশাইরে আসতি দাও, তারপর ব্যবস্থা হবেনে।

একটু পরেই এসে গেলেন ওঁরা। তারাপ্রসন্ন বললেন, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল তো? চল এবার, সবাই মিলে আমাদের বাড়ি।

রূপেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন ভগ্নস্তূপ। শুধু দক্ষিণদুয়ারি ঘরখানা দাঁড়িয়ে আছে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষায়। পুবদুয়ারি আর উত্তর-দুয়ারি ঘরদুটি বন্দ্যোঘটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তুলসীমঞ্চটা ভেঙে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য, তুলসীর গাছ আছে খাড়া! কেউ জল দিত কি? আর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে সৌরীন্দ্রনাথের স্বহস্তরোপিত কলমের আম গাছটা। পিতৃদেবের সযত্নরোপিত সেই আম্রবৃক্ষে এসেছে নতুন মঞ্জরী। কুসুমঞ্জরী চলে গেছে, কিন্তু রূপমঞ্জরীকে সম্বর্ধনা জানাতে প্রতীক্ষায় আছে গাছটা, আপাদমস্তক রসালমঞ্জরী নিয়ে।

রূপেন্দ্রনাথ বাস্তুভিটার প্রবেশদ্বারের সামনে নতজানু হয়ে উপবেশন করলেন। প্রবেশদ্বারের কাঁঠালকাঠের চৌকাঠের উপর কপালটা ঠেকালেন। ব্রাহ্মণের বাস্তুভিটাকে প্রণাম করল মালতীও। রূপমঞ্জরীকে কেউ কোন নির্দেশ দেয়নি। দেখাদেখি সেও চৌকাঠে তার ছোট্ট কপালটা ঠেকালো।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে মালতীকে বললেন, দিন চারপাঁচ লাগবে, বৌঠান। তার মধ্যেই দু-একখানা ঘর খাড়া করে ফেলব। আপনি এ কয়দিন মঞ্জরীকে নিয়ে তারাদার ভদ্রাসনেই

থাকুন। তারাদা আমার বড় ভাইয়ের মতো। ঐ যে দীঘির ধারে চিকিৎসালয় দেখছেন তা গড়ে দিয়েছেন ঐ তারাদার বাবামশাই—আমি তাঁকে জেঠামশাই ডাকতাম। ওঁরা এ গ্রামের জমিদার।

মালতী জানতে চায়, আর আপনি? আপনি কী করবেন?

—আমাকে এখানেই থাকতে হবে, বৌঠান। নতুন করে ঘর তুলবার ব্যবস্থা করতে।

হঠাৎ নজর হল মাঠের ও-প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এদিকে এগিয়ে আসছে জীবন দত্ত। উঠতি জোয়ান। সুঠাম দেহাবয়ব। জীবন ছিল রূপেন্দ্রনাথ কবিরাজের প্রিয় ছাত্র। এই গ্রামেরই ছেলে। মহিম দত্তের বড়ছেলে। আয়ুর্বেদ শিক্ষা করতে রূপেন্দ্রনাথের শিষ্যত্বগ্রহণ করে। একেই দাতব্য-চিকিৎসালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে রূপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করেছিলেন।

জীবন এসে পথের উপরেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তার গুরুদেবকে। তারপর প্রণাম করল তারাপ্রসন্নকে। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে দেখল অবগুণ্ঠনবতী বিধবাটির দিকে। রূপেন্দ্রনাথ বললেন, আমার বৌঠান।

জীবন বোধকরি মালতীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ—দু-চার বছরের। তবু সে-কালীন শিষ্টাচার অনুসারে ঐ ব্রাহ্মণের বিধবার চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করল। রূপেন্দ্রনাথকে বলল, এতদিনে গাঁয়ের কথা মনে পড়ল?

রূপেন্দ্র হেসে বললেন, গ্রামে বাস করতেই তো এসেছি, জীবন, কিন্তু...

—আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, গুরুদেব। আমি এখনি ওপাড়ে যাচ্ছি, পীরপুরের তোরাবকে খবর দিতে। যাবার পথে নন্দদাদুর গোলাতেও খবর দিয়ে যাব। বাঁশ, দড়ি আর খড়ের জন্য। উলুখড়েই ছাইবেন তো? না ধানখড়?

—না, না, উলুখড় তো নিশ্চয়ই। তোরাবকে বল, দিন চারপাঁচের মধ্যে মোটামুটি দু-খানি ঘরের ছাউনি করে দিতে হবে। কাদার দেওয়াল তুলতে সময় লাগবে। আপাতত তোরাব যেন মনিরুদ্দির কাছ থেকে তল্লা-মুলিবাঁশের চাটাই নিয়ে আসে। বুকা-মুলি নয়, পিঠামুলি।

জীবন মাথা নেড়ে বলল, যে-আজ্ঞে। কিন্তু এ তিনচার দিন আপনি থাকবেন কোথায়? আমাদের বাড়িতে...

—না, জীবন। দেখতেই তো পাচ্ছ—তারাদা দামোদরের ঘাটেই আমাকে গ্রেপ্তার করেছেন। এত বেলাতেও পালকি নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন। ধরে নিয়ে যাবেন। তবে তারাদা—মধ্যাহ্ন আহার সেরে আমি আবার এখানে ফিরে আসব। রাতটা এখানেই থাকব। এখন বোশেখ মাস। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। নির্মেঘ আকাশ। আমার অসুবিধা হবে না।

তারাপ্রসন্ন বললেন, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না, রূপেন। দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন পরে ভিটেয় ফিরে এসেছ। নাই বা থাকল কেউ কাছে টেনে নেবার। বাস্তুদেবতা তো আছেন। তিনিই তোমাকে কোলে আশ্রয় দেবেন। লোক দিয়ে আমি চৌকি আর বিছানা পাঠিয়ে দেব। মশারি খাটাতে ভুল না হয়। বোশেখ মাস হলে কি হয়, মালোয়ারি হচ্ছে গ্রামে। আজ দুবেলাই কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পেতে আমাদের বাড়ি যেতে হবে।

রূপেন্দ্র বলেন, আজ্ঞে না। আমি একাহারী। তাছাড়া আমার আহারে কিছু বিধিনিষেধ আছে। বৌঠান জানেন—তারাবৌঠানকে উনি বুঝিয়ে বলবেন সে-সব কথা।

—তবে ঐ কথাই রইল।

—একটু দাঁড়ান। আপনাকে একটি মঞ্জুষা গচ্ছিৎ রাখতে দেব। জেঠামশাই এগুলি দিয়েছিলেন রূপমঞ্জরীর মায়ের বিয়েতে। আমার ভাঙা ঘরে এগুলো রাখা ঠিক হবে না। নিয়ে যান রূপমঞ্জরীর বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

মালতী নিরুপায়। তার বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আবার পালকিতে উঠলেন। এখান থেকে জমিদারবাড়ি কাছেই। মঞ্জরী আর শুভ্র পালকিতে চাপতে রাজি হল না। তারাপ্রসন্নের পিছন পিছন দলটা জমিদার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। তারাপ্রসন্ন গহনার মঞ্জুষাটা সযত্নে স্বহস্তে বহন করে নিয়ে চলছেন।

জীবন জানতে চায়, আচ্ছা, ঐ ফুটফুটে মেয়েটি .

—চিনতে পারলে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনেছি। হুবহু মায়ের মুখ পেয়েছে। আমি তাহলে পীরপুরের দিকে রওনা দিই, গুরুদেব?

—এই অবেলায় ? তোমার ফিরে আসতে তো অপরাহ্ণ হয়ে যাবে, জীবন। দুটি অন্নসেবা করে গেলে হত না?

—আজ্ঞে, আমি সকালে ভাল করে জলখাবার খেয়ে নিয়েই রোজ বের হই। রুগি-টুগি দেখে ফিরতে প্রায় বিকাল হয়ে যায়। মা জানেন।

—তুমি কি ইতিমধ্যে বিবাহ করেছ?

—আজ্ঞে না। বাবামশাই, মা আর আমি। আর আমার ছোট ভাই শিবনাথ। সবাই ভালই আছে।

—আমাদের চিকিৎসালয়ে রুগি আছে কজন?

—সব শয্যাই ভর্তি। সেসব কথা কাল হবে—

—বেশ। এস তাহলে।

pathagar.net

জীবন রওনা হবার পর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু কুবোপাখির একটানা কক-কুক-কুক-কুক। আর নিদাঘ দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক। সে ডাকে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। ভগ্নস্তূপের ভিতর কোনও কাঠবিড়ালীদম্পতি বোধহয় নিশ্চিন্ত মনে বাসা বানিয়েছিল শেষবসন্তে। বাচ্চাগুলো এখনো লায়েক হয়নি। তাই লোকজনের আনাগোনায় কাঠবিড়ালীদম্পতি আমগাছে চড়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে। রূপেন্দ্রনাথ সেদিকে ফিরে বললেন, তোরা অহেতুক রাগারাগি করছিস, বাপু। বাড়িটা আমার—আমি বাস করতে আসব না? তোরাও থাক, আমিও থাকি।

হঠাৎ পদশব্দে এ পাশ ফিরে দেখেন একজন অচেনা মানুষ ভাঙা কাঠকুঠো সরিয়ে ওঁর দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরের প্রবেশপথটা সাফা করছে। আর একজন স্ত্রীলোক—বছর ত্রিশ বয়স—নারকেলকাঠির সম্মার্জনী দিয়ে ঐ গৃহের সংলগ্ন একচালাটা পরিষ্কার করছে। পুরুষটি উদ্দামগা, মালকোচা-সাঁটা, কিন্তু স্ত্রীলোকটি ভদ্রঘরের। তার দু-হাতে সোনার মকরমুখী বালা। পরিধানে শান্তিপুরী ডুরে-শাড়ি। সে-আমলে, বিশেষ উৎসব বা অনুষ্ঠান-রজনী না হলে সম্ভ্রান্তঘরের মহিলারাও একবস্ত্রা থাকবেন। "কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে পুরুষ-স্ত্রী-নির্বিশেষে সাধারণ বাঙালী সামান্য পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত।... বাঙালী মহিলারা একটিমাত্র শাড়ি দিয়ে শরীর আবৃত করত। বাঙালী মহিলারা মাথায় ঘোমটা দিত না।"* [মনে হয় অ্যালেকজান্ডার 'অবিবাহিতা' মহিলাদের কথা বলতে চেয়েছেন। বিবাহিতাগণ অবগুণ্ঠনবতী হতেন।] তবে শাড়ি পরিধানের বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যে, কখনও অসতর্কতায় যুক্ত-উরসের আভাস চর্মচক্ষে দেখা যেত না।

* The History of Hindustan, by Alexander Duff. Vol I. 1770, London. p. 119

রূপেন্দ্রনাথ গাছের ছায়ায় এতক্ষণ শুয়ে পড়েছিলেন। উঠে বসে প্রশ্ন করেন, কে তোমরা?

লোকটা পিছন ফিরে দেখল। ভ্রূক্ষেপ করল না। যা করছিল সেই কাজই করতে থাকে। মহিলাটি সম্মার্জনী নামিয়ে রাখে। পিতলের কলসি (কলসি? সেটা কখন এল দ্বার প্রান্তে?) থেকে 'ফেরো'য়ψ জল গড়িয়ে হাতটা ধুয়ে ফেলে। এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে পদধূলি নেয় রূপেন্দ্রনাথের।

—শোভা না? কখন এলে তোমরা?

দুরত্ব বজায় রেখে শোভা গাছতলাতেই বসে পড়ে। দুর্গা খুড়োর অনূঢ়া কন্যা। বলে, অনেকক্ষণ এসেছি রূপোদা, আপনি টের পাননি। গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে। উঠুন, মুখে হাতে জল দিন। মাদুর পেতে দিয়েছি। তাতে উঠে শুয়ে পড়ুন আবার। তবে কৃষ্ণগোবিন্দজীর প্রসাদ নিয়ে এসেছি। মুখচোখ ধুয়ে একটু প্রসাদ মুখে দিন।

রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন। নিজের অজান্তেই কাঠবিড়ালীদের লাফালাফি দেখতে দেখতে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। উনি আপত্তি করেন না। শোভা কলসি থেকে ফেলোয় করে জল ঢেলে দেয়। উনি মুখে-চোখে জল দেন। বৈশাখী মধ্যাহ্নে তাতে আরামই বোধ করেন। প্রশ্ন করেন, তুমি কী করে জানলে আমি এসেছি?

—সেসব গল্প পরে হবে। আপনি তো ছানটাও এখনো করেননি। এই গরমে ছান না করলে বিকালের দিকে শরীর অস্থির-অস্থির করবে। আমি শিশিতে করে তেল নিয়ে এসেছি। প্রসাদটুকু মুখে দিয়ে 'আভান' করে সারা গায়ে তেল মাখুন। ইন্দির একটা ছত্র নিয়ে এসেছে। আপনাকে ছত্র ধরে দামোদরে নিয়ে যাবে। ছানটা সেরে একেবারে সোজা তারাদার বাড়ি চলে যাবেন। গামছা-কাপড় আছে তো সঙ্গে?

—সেটুকুও থাকবে না?

—কী জানি! যেমন বাউণ্ডুলের মতো চেহারা করেছেন। কতদিন গায়ে তেল মাখেননি বলুন তো?

—চার বছর।

—চার বছর! কেন?

—তোমার বৌঠান যেদিন স্বর্গলাভ করেন সেদিন থেকে।

শোভার মুখে প্রশ্নটা এসেছিল। সামলে নিল নিজেকে। দীর্ঘ চারবছর ধরে অশৌচ পালনের কী অর্থ? এ তো নিছক পাগলামী। শোভা ভিতরের অনেক-অনেক কথা জানে। অনেক গোপনতত্ত্ব আবার জানেও না। কিন্তু এ অর্থশ্রান্ত ক্লান্ত মানুষটাকে এখন এসব প্রশ্ন করতে ওর মন সরল না।

ψ ফেরো = পিতল বা কাঁসার ঘটি বিশেষ।

pathagar.net

রূপেন্দ্রনাথ মুখ হাত ধুয়ে নিলে শোভা গাছ তলায় জল ছিটিয়ে একটা কলাপাতা পেতে তাতে কৃষ্ণগোবিন্দজীর প্রসাদ সাজিয়ে দিল—পেঁপে, শশা, কলা, মুগ-ভিজা, কদমা, বাতাসা, খুর্মো আর সন্দেশ।

রূপেন্দ্রনাথ ইষ্ট স্মরণ করে খরমধ্যাহ্নে প্রাতরাশে বসলেন।

শোভা—কী হিসেবি মেয়ে—একটা হাতপাখাও নিয়ে এসেছে। বাতাস করতে করতে প্রশ্ন করে, দূর থেকে তারাদার সঙ্গে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকেও দেখলাম...

—হ্যাঁ, যাবার আগে ওকে রেখে গেছে তোমাদের কুসুমবোঠান।

—ভারি সুন্দর দেখতে। কী নাম রেখেছেন?

—ওর দাদামশাই, মানে আমার পিসা-শ্বশুর নাম রেখেছিলেন হটী। আমি ডাকি 'রূপমঞ্জরী' নামে।

—রূপমঞ্জরী! বাঃ! ভারি সুন্দর নাম।

—নামটা আমার এক বয়স্যের দেওয়া। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তুমি তাঁর নাম শুনেছ, শোভা?

—আজ্ঞে না।

—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম?

—না। কোথাকার মহারাজা তিনি?

—নদীয়ার। কৃষ্ণনগরের। তাঁরই সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। নামকরণের অর্থটা বুঝেছ?

—সেটুকু বুঝেছি, রূপোদা! রূপেন্দ্রনাথের 'রূপ' আর কুসুমমঞ্জরীর 'মঞ্জরী'। তাই তো বলছিলাম—ভারি সুন্দর নামটি! যেমন দেখতে, তেমনি নাম। আর সঙ্গে যে বিধবা মহিলাটিকে দেখলাম, উনি...

—সম্পর্কে আমার বৌঠান। উনি এখানেই থাকবেন।

—এই সোঞ্জই গাঁয়ে? কোথায়? এই বাড়িতে?

হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, হ্যাঁ। এ বাড়ির ঘর তিনখানি আবার খাড়া হয়ে উঠবার পর। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তারাদার আশ্রয়ে থাকবেন উনি, রূপমঞ্জরীকে নিয়ে।

শোভা চুপ করে বসে রইল। রূপেন্দ্র বললেন, জানি তুই কী ভাবছিস।

অজান্তেই 'তুমি' থেকে 'তুই' সম্বোধন। ওঁর যেন হঠাৎ মনে হল, কাতু ওঁকে বসে খাওয়াচ্ছে।

শোভা চকিতে একবার ওঁর দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু করল। বলল, সমাজপতিরা কি এটা মেনে নেবেন, রূপোদা?

—না, নেবেন না। কিন্তু তোদের একবন্না-ঠাকুরকে তো তুই চিনিস শোভা। আমি লড়াই করে যাব।

শোভা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, আর একটা কথা বলবেন? ছোটমা...

রূপেন্দ্রনাথের আহার শেষ হয়েছিল। ফেরোর জলে মুখ প্রক্ষালন করে কোঁচার খুঁটে

pathagar.net

হাত-মুখ মুছলেন। বললেন, তুই কতদূর, কী শুনেছিস্ জানি না, তবে এটুকু জেনে রাখ, তোর ছোটমার সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

—সেটা কোথায়?

—পুরীতে।

—মৃত্যুসময়ে তুমি উপস্থিত ছিলে, রূপোদা?

শোভাও সজ্ঞানে খেয়াল করে দেখেনি যে, সে 'আপনি' থেকে নিজের অজান্তে ঐ যুবকটিকে 'তুমি' সম্বোধন করছে—যে যুবকটির সঙ্গে কোন এক বিস্মৃত অতীতে তার বিবাহ-সম্বন্ধ উত্থাপিত হয়েছিল।

—না, আমি ছিলাম না। আমি তখন কাশীধামের পথে।

—বাবামশাই ছিলেন?

—মৃত্যুমুহূর্তে ছিলেন না। তবে তিনিই সৎকার করেছিলেন। মুখাগ্নি করেছিলেন। না-করার কোনও হেতু নেই।

—এ ঘটনার কোনও সাক্ষী আছে?

—আছে। অন্তত দেড়-দুশ জন। বর্ধমানের ইজারাদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত—যার সঙ্গে তোমার বাবার কারবার, এ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

—আমার একটা পরামর্শ শুনবে, রূপোদা?

—কী ব্যাপার?

—তুমি লোক পাঠিয়ে সেই নগেন দত্তর কাছ থেকে একটা হাতচিঠি আনাবার বন্দোবস্ত কর। যেন ইজারাদারের পাঞ্জাছাপ থাকে সে চিঠিতে। তিনি যেন সে পত্রে স্বীকার করেন যে, আমার ছোট মায়ের মৃতদেহ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি শ্মশানযাত্রী ছিলেন। দাহ হতেও দেখেছেন।

—বুঝেছি। হ্যাঁ, আমার নামে যে কলঙ্ক রটেছে তার কথা আমি শুনেছি। তোর পরামর্শটা আমার স্মরণে থাকবে।

—ছোটমার মৃত্যু হল কেমন করে?

—সেসব কথা তুই শুনতে চাস না, শোভা!

—অসুখে ভুগে? কী অসুখ? তুমি চিকিৎসা করেছিলে?

—বললাম তো! সে-কথা থাক!

—না, থাকবে না। আমার মন বলছে, ছোটমা, রাগে, দুঃখে অভিমানে, তীব্র ঘৃণায় গলায় দড়ি দিয়েছিল। আমাকে ছুঁয়ে বল, সত্যি কিনা!

শোভা হাত বাড়িয়ে রূপেন্দ্রনাথের পদস্পর্শ করে।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, হ্যাঁ রে শোভা। তুই ঠিকই আশঙ্কা করেছিস—মীনু আত্মঘাতী হয়েছিল।

শোভাও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ায়। অসঙ্কোচে রূপোদার হাতখানি টেনে নিয়ে বলে, আর একটা প্রশ্ন—মাত্র একটা! এটাই শেষ! বল, রূপোদা! ছোটমা আত্মঘাতী হয়েছিল কবে? তার সর্বনাশের আগে না পরে?

pathagar.net

রূপেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ওঁর মুঠি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। বলেন, কী বলতে চাইছিস? 'সর্বনাশ' মানে?

শোভা বলে, আমি কচি খুকি নই, রূপোদা। কুলীন ঘরে না জন্মালে অ্যাদ্দিনে তিনছেলের মা হতাম। আমি জানি। সব জানি। আমার পূজ্যপাদ বাবামশাই আমার জোড়া নতুন-মাকে নিয়ে আবার কেন তীর্থদর্শনে গেছেন, তা কি বুঝি না আমি? সব বুঝি, রূপোদা, সব বুঝি! তুমি শুধু আমাকে জানাও ছোটমা কখন গলায় দড়ি দেয়? পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আগে, না পরে? ভেব না, এ আমার মেয়েলি কৌতূহল। এই সংবাদটুকু জানবার জন্য চার-চারটি বছর দাঁতে-দাঁত দিয়ে প্রতীক্ষা করে আছেন একজন—তোমার ফেরার পথ চেয়ে!

—কে? কার কথা বলছিস শোভা?

—ঐ হতভাগিনীর মা! মুখুজ্জে-খুড়োর ধর্মপত্নি—খুড়িমা। সে দারুণ খুশি হত, খুশি হবে, জানলে যে, তুমি ছোটমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ঐ পিশাচটার নাগের ডগা দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে গিয়েছিলে!

—পিশাচটা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার পরমশ্রদ্ধেয় বাবামশায়ের কথাই বলছি। কিন্তু খুড়িমা জানে, ছোটমার অতবড় সৌভাগ্য হবে না!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। মনে পড়ে গেল ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সেই তিরস্কার : "ক্যা তু গঙ্গাপুত্র পিতামহ ভীষ্ম তে ... হো?"

কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য!! তিনি সংযম হারালে শুধু মীনু নয়, শুধু ত্রৈলঙ্গস্বামী নন, এই সুদূর সোঞাই গাঁয়ের একটি মহিলা—যিনি জেনে-বুঝে তাঁর আত্মজাকে সামাজিক যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পাঠিয়েছিলেন তিনিও মনে মনে দারুণ খুশি হতেন।

সোঞাই গাঁয়ের পীতাম্বর মুখুজ্জের আত্মঘাতী মেয়ে—মীনু, লেখকের কল্পিত চরিত্র; কিন্তু ত্রিবেণীর কাছে বিশপাড়া গ্রামের দরিদ্রব্রাহ্মণ ভূষণ রায় তো তা নয়। সমাজদেবতার যূপকাষ্ঠে যুগলকন্যাকে বলি দিয়েও ভূষণ মুক্তি পায়নি। ইতিহাস বলছে,

> ত্রিবেণীর কাছে বিশপাড়া গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুত হলেন। সমন্বয়ের আশায় তিনি সেদিনের হিন্দু সমাজপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আর্থিক দিক থেকে তেমন লাভবান হবেন না মনে করে সেই ব্রাহ্মণের সমন্বয় করলেন না। পরে সেই ব্রাহ্মণ ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শরণাপন্ন হলে জগন্নাথ তাঁর সমন্বয় করে দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথের এই বীরোচিত আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে 'বাজপেয়' যজ্ঞের পনের দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানকালে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বাদ দিয়ে নানাদেশীয় বিভিন্ন পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন।*

---

* *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* : ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী, 1989, p. 104.

কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেছিলেন এতে জবর অপমান করা হল তর্কপঞ্চাননকে। কিন্তু ক্ষুরধারবুদ্ধি জগন্নাথ যে পালটা চালটি দিলেন তাকে দাবার ভাষায় বলা যায় 'ওঠসাই কিস্তি'। বিনা আমন্ত্রণেই যজ্ঞের পঞ্চমদিনে একশত ছাত্র নিয়ে জগন্নাথ ত্রিবেণী থেকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এসে হাজির : "মহারাজের জয় হৌক! আপনি তো মহারাজ দক্ষের মতো বিরাট শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। তাই অনিমন্ত্রিতই এসেছি।"

কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রস্তুতের একশেষ! মহারাজের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করে তাঁবু খাটিয়ে জগন্নাথ যজ্ঞস্থানের কাছাকাছি সশিষ্য অবস্থান করেন। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নিজে বহন করেন। যজ্ঞ শেষে প্রথা মতো কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথকে প্রশ্ন করেন, "বাজপেয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছে তো?" জগন্নাথ প্রত্যুত্তর করেন, "রবাহুত জগন্নাথের স্বীকৃতির কি কোনও মূল্য আছে, মহারাজ? আপনি অন্যান্য নিমন্ত্রিত-পণ্ডিতদের মত নিন।"

কৃষ্ণচন্দ্র এ ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জা পেলেন।

জগন্নাথ ত্রিবেণীতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর অপমানের কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন 'মহারাজ' নন্দকুমারকে। নন্দকুমার তখন নবাবের দেওয়ান। নন্দকুমার কৃষ্ণচন্দ্রকে সমুচিত শাস্তি দিতে নবাবের পাওনা বারো লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠালেন। কৃষ্ণচন্দ্র অসমর্থ হওয়ায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হল। পরে "গলদেশে কুঠার বন্ধন" করে জগন্নাথের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে জগন্নাথের সুপারিশেই নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্তি দেন।

এসব ইতিহাসের কথা। কিন্তু ইতিহাসে লেখা নেই বিশপাড়া গ্রামের সেই অরক্ষণীয়া কন্যাদ্বয়ের শেষপর্যন্ত কী হল। কতদিন বা কয় সপ্তাহ পরে বৃদ্ধের সঙ্গে তাদের দুই বোনকে সহমরণে যেতে হল!

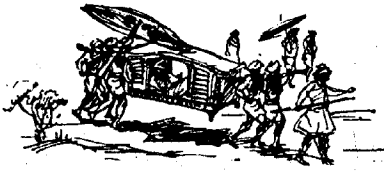

1748 থেকে 1996 —আড়াই শ বছর হতে আর মাত্র দু-বছর বাকি। আজ সাতাশে অক্টোবর, 1996 তারিখে সংবাদ পত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি না দিয়ে থামতে পারছি না :

> কথা ছিল সামনের অগ্রহায়ণে বিয়ে হবে বসিরহাটের তরুণী সোমা ঘোষের। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছিল। কিন্তু পাত্র গৌতম ঘোষের অতিরিক্ত পণের দাবিতে সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল।... নারায়ণপুর হাইস্কুলের শারীর শিক্ষক গৌতম ঘোষের সঙ্গে সোমার বিয়ের ব্যাপারে প্রায় এক বছর ধরে কথাবার্তা চলছে। বাঙলায় অনার্স পার্ট টু পাঠরতা সুশ্রী সোমাকে দেখে পছন্দ হয়েছিল গৌতমের। কিন্তু পণের টাকা

pathagar.net

এবং যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পাত্রপক্ষের নানারকম বায়নাক্কার ফলে বিয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে থাকে। সোমার বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। বেতন যা পান, তাতে সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। তার উপর পাত্র গৌতমের পরিবার দাবি করে বসল নগদ সত্তর হাজার টাকা, ফ্রিজ, গোদরেজ আলমারি, আসবাবপত্রসহ খাট ড্রেসিং টেবিল, ইত্যাদি। সোমার বাবা কৃষ্ণপদবাবু আত্মীয় স্বজনের কাছে ধার নিয়ে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজিও হয়ে যান। কিন্তু টাকার অঙ্ক কমাতে বলায় গৌতম এর পর দাবি করে একটি রঙিন টি. ভি.। সোমার বাবা বলেন, বিয়ে হয়ে যাবার এক বছরের মধ্যেই রঙিন টি.ভি. কিনে দেবেন। কিন্তু পাত্রপক্ষ তাতে রাজি হয়নি।

পাত্রপক্ষের দাবির কথা জানার পর সোমা এগারই অক্টোবর সরাসরি পাত্র গৌতম ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। অতিরিক্ত পণ কেন দাবি করা হচ্ছে জানতে চান। সেদিনই গৌতম সোমাকে জানিয়ে দেয় যা যা চাওয়া হয়েছে সবই দিতে হবে। সোমা তাঁদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা আবার ভালভাবে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও গৌতমের মন গলেনি। বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে সোমা মনমরা হয়ে পড়েন। অবশেষে মঙ্গলবার বিজয়া দশমীর বিসর্জনের দিনে সোমা নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। কৃষ্ণপদবাবু এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছিলেন ভাল পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু শিক্ষক পাত্রও যে পণের লোভে একটি তরুণীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে পারে, সে-কথা ভাবতে পারেননি ঘুণাক্ষরেও। বসিরহাট থানার কর্তৃপক্ষ সোমার আত্মহত্যার ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু সমাজ কী চিনে রাখবে গৌতম ঘোষের মতো পণলোভী পাত্রদের? প্রশ্নটি সাংবাদিককে করলেন সোমার শোকাহত বাবা-মা। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের জবাব কে দেবেন জানা নেই।

প্রশ্নটি তুলেছেন 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার বসিরহাটের নিজস্ব সংবাদদাতা। আমি যদি সাহিত্যসেবীর বদলে সমাজসেবী হতাম। আর বয়স, যদি বছর দশেক কম হত তাহলে বলতাম "জবাব দেব আমি।"

চলে যেতাম বসিরহাটে। খুঁজে বার করতাম—সোমাদের সাঁইপাড়া এলাকাতে না হলেও —বসিরহাট অঞ্চলে কোনও-না-কোন প্রগতিবাদী নারী-সংগঠনকে। থানা 'অস্বাভাবিক' মৃত্যুর মামলা নিয়ে কিছুই করতে পারবে না। সোমাকে কেউ আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল এটা প্রমাণ করা শক্ত। দুর্গা গাঙ্গুলিকেই কি আজকের দিনে দায়রায় সোপর্দ করা যেত, মিনুকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল বলে? ঘৃণার প্রকাশ আপনিই হয়। লক্ষ্য করে দেখুন, সংবাদদাতা পাটটু পাঠরতাকে বরাবর 'আপনি' সম্বোধন করেছেন, অথচ তার চেয়ে বয়সে বড়, স্কুলের শিক্ষককে 'আপনি' সম্বোধন করতে প্রতিবারেই সাংবাদিকের কলম বিদ্রোহ

করেছে। এই পণলোভী পিশাচের দল ও অপমানটুকু গায়ে মাখে না।

নারী-সংগঠন, স্ত্রীস্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা ব্রতী, তাঁরাই পারেন প্রতিবাদ করতে প্রতিবিধান করতে। এইসব পাত্রকে নারী-সমাজের সমবেতভাবে বয়কট করা উচিত। পুলিশ কী করছে, বিধায়ক বা গ্রাম-পঞ্চায়েতী, রাজনীতি-ব্যবসায়ী দাদারা কী করছেন, তা জানার দরকার নেই। নারী সংগঠনগুলির কর্তব্য এ-সব ক্ষেত্রে নিজেরা অগ্রসর হয়ে পাত্র ও পাত্রীপক্ষের সঙ্গে কথা বলা। যদি মহিলা সংগঠন সিদ্ধান্তে আসেন যে, পাত্রপক্ষের পণের দাবির জন্যই কোনও অনূঢ়া কন্যা আত্মহত্যা করেছে—সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। ঐ পাত্রটি যাতে কোনও বিবাহযোগ্যাকে বিয়ে করতে না পারে তার জন্য আন্দোলন করতে পারেন। পোস্টার দিতে পারেন, স্থানীয় সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে সম্পাদকীয় লেখাতে পারেন—নিজেরাও প্রবন্ধ লিখতে পারেন। মোটকথা ঐ সব পণলোভী বর্বরদের সুস্পষ্টরূপ চিহ্নিত করা দরকার।

সংবাদদাতা বলেছেন, কৃষ্ণপদবাবু নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি ভাল পাত্র। পাত্র তো ভাল বটেই। শারীর শিক্ষার শিক্ষক। অন্তত 'গঙ্গারাম'-এর তুলনায়—না, ভুল হল—গঙ্গারাম কোনও পণ দাবি করেছিল বলে জানা নেই। উনিশটিবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গঙ্গারামের পাত্র হিসাবে কী বাজারদর ছিল, তা আমরা জানি না। এখানে তা জানি।

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, কোনও পাত্রের ওজন সত্তর কিলোগ্রাম, এবং সে যদি সত্তর হাজার টাকা দর হাঁকে—পাত্রী স্বয়ং এসে অনুরোধ করা সত্ত্বেও (দু'জনের পরিচয় ছিল কি না বলা হয়নি) সত্তর হাজার টাকা দর কমাতে রাজি না হয়, তাহলে অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে সে পাত্রের বাজার দর হাজার টাকা/কে.জি/তা ভালজাতের জ্যান্ত পাঁঠার দর যখন একশ টাকা/কে.জি. তখন গঙ্গারামতুল্য সুপাত্রের দর তো হাজারটাকা/কে.জি হতেই পারে। মুশকিল এই, কৃষ্ণপদবাবু মেয়ের বিয়ের বাজার করতে গিয়ে—সে যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন অবশ্য—গোটা-পাঁঠা, নাও কিনতে পারতেন। কিন্তু পাত্রের ক্ষেত্রে রাঙ-এর মাংস, মেটুলি বা কলিজার মাংস কেনা যাবে না। গোটা পাঁঠাই কিনতে হবে—ঐ হাজারটাকা/কে.জি. দরে!

সোমা ঘোষ আজ আমার নাগালের বাইরে। ছোট্ট সোমা, তুমি আজ অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা—'সেথা তুমি অগ্রজ আমার!' আমার লেখা আর সেই বাঙলা অনার্সের ছাত্রীটি পড়তে পারবে না। তাই সোমার মতো দিদিভাইদের কাছে এই সুযোগে দুটো মনের কথা বলে নিই। জানি, এটা ধান ভানতে উমার গীত হচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটল উমামায়ের বিসর্জনের দিনেই। আমি থাকি-না-থাকি, উমা-মা ফিরে আসবেন, আগামী বছর—তাই তাঁকে 'পুনরাগমনায় চ' মন্ত্রে বিসর্জন দিয়েছি। অভিমানিনী সোমা-মা ফিরে আসবে না কোনদিন।

প্রতি সপ্তাহেই অন্তত দু-তিনটি সংবাদ নজরে পড়ে—অভিমানিনী আত্মহত্যা করেছে। পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই, মনে হয় আত্মঘাতীর অপেক্ষা আত্মঘাতিনীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যাটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেকেন্ডারি, হায়ার-সেকেন্ডারি, বা, বার্ষিক-পরীক্ষার সময়ে। এরা খারাপ

ফলের আশঙ্কায়, 'ফেল'-করার আশঙ্কায়, আত্মহনন করে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে জীবনে সাফল্যলাভের একটা ক্ষীণ সম্পর্ক আছে বটে; কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষীণ। বিভিন্ন পর্যায়ে—স্কুলে, কলেজে, যাদের ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে দেখেছি তাদের অনেক-অনেককেই অফিসের বড়বাবু, মাঝারি ব্যবসায় বা স্কুলশিক্ষক হিসাবে জীবন শেষ করতেও দেখেছি। অপরপক্ষে জীবনে কখনও ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়নি এমন সহপাঠী সর্বভারতীয় সুনাম লাভ করেছে। সহপাঠী সত্যানন্দ প্রামাণিক পূর্বভারতের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ অ্যানাসথিস্ট হয়েছিল—সর্বভারতীয় সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিল সে। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জিমমুকুল দত্ত বি.ই.-মিলিটারি সার্ভেয়ার হিসাবে এভারেস্টের উচ্চতা মেপে সেটা সংশোধন করেছিল। বাদল সরকার নাট্যজগতে আজ প্রবাদপুরুষ। আমার এইসব সহপাঠীর ভিতর কেউই পরীক্ষায় প্রথম-দ্বিতীয় হয়েছিল বলে তো মনে পড়ছে না। আমি নিজেও অঙ্কে একবার একশয় সতের পেয়েছিলাম। পরে ম্যাট্রিক অঙ্কে লেটার পাই এবং বি.এস.সি-তে অঙ্কে অনার্স নিই! আইনস্টাইনের স্কুল-শিক্ষক নাকি ছাত্রের অভিভাবককে লিখেছিলেন, 'ছেলেটির রচনাশক্তি ভাল, বুদ্ধিও আছে, তবে অঙ্কে কাঁচা। 'ম্যাথস' বাদে যে কোন বিষয়ে ও পারদর্শিতা দেখাতে পারবে।'

তাই ঠি, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রক তোদের হঁদুর দৌড়ে বাধ্য করেছে, তা করুক। সেটাই জীবনের শেষ কথা নয়। স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা, হয়তো বাড়ির অভিভাবক/অভিভাবিকার দল, বন্ধু-পড়শীরা বুঝিয়েছে পরীক্ষার ফলই জীবনের পরমার্থ। কথাটা—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! জীবন অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। তার সাফল্যের মাপকাঠি অন্যরকম। এই প্রপঞ্চময় জগতকে ভালবাসা, তা থেকে আনন্দ আহরণ করা—আনন্দ দেওয়া, ভালবাসতে পারা এবং ভালবাসা পাওয়া—অনেক-অনেক বড় জাতের প্রাপ্তি!

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অথবা অভিভাবকদের কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে অনেকে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়; যেমন সোমা দিল। কী অপরিসীম দুঃখের কথা! বাবা-মাকে বারণ করে দে, বলে দে যে, যে-মানুষ নিজের উপার্জনে স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম—এমনকি সখের রঙিন টি.ভি.টাও শ্বশুরের ঘাড় ভেঙে আদায় করতে চায়—তেমন নপুংসকের গলায় তোরা মালা দিবি না। হাজার টাকা দর থেকে নামতে নামতে একশ টাকা/কে.জি. দরে যদি পৌঁছায় তবু ঐ জাতির বোকা-পাঁঠা কিনিস না।

'আত্মহত্যা' ব্যাপারটা আজকাল বড় 'জল-ভাত' হয়ে গেছে। কেন বল তো? মাস চারেক আগে একদিন খবরের কাগজে একটা বিচিত্র খবর পড়লাম। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। বাড়ির গিন্নি-মা তাই খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করলেন। বাজার বসেনি, ফলে ঘরে যা ছিল তাই হল অনুপান। আলু, আর পাঁপর-ভাজা। আর ছিল দুটো ডিম। হল ডবল ডিমের অমলেট। বাবা-মা; মেয়ে বড়, ছেলে ছোট। মেয়ে নাকি বায়না ধরল ডবল ডিমের অমলেটটা গোটাই খাবে সে। মা বললেন, বাবু! তা কি-করে হয়? আমি না হয় খাব না; তিন ভাগ তো করতে হবে!

মেয়ে উঠে চলে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল। সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে!

সংবাদটা একাধিক সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশন করেছেন। ফলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিদারুণ দুঃখজনক সংবাদ! মেয়েটির বাবা-মায়ের জন্য পূর্ণ সহানুভূতি সত্ত্বেও লিখতে বাধ্য হচ্ছে—কোথাও কিছু একটা ত্রুটি হয়েছিল। মেয়েকে মানুষ করে তুলতে। কতটা অবদান স্কুলের, কতটা বাড়ির, বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীর তা জানি না—কিন্তু বাবা আর ছোট ভাইকে বঞ্চিত করে গোটা ডবলডিমের অমলেটখানা পেল না বলে যে মেয়ে আত্মহত্যা করে...

আমার নিজের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর-পাঁচেক আগেকার কথা। আমি নিজে হাসপাতাল থেকে সদ্য ফিরে এসেছি। বেশ দুর্বল। হঠাৎ রেজিস্ট্রি ডাকে একটি চিঠি পেলাম। লিখছে আমার রচনার একজন অপরিচিতা পাঠিকা। সাধারণ কাগজে—কোনায় তার নাম-ঠিকানা লেখা। ধরা যাক মেয়েটির নাম লিপিকা। ঠিকানাটা বহির্বাংলার। সংক্ষিপ্ত পত্র :

লিখেছে ওর বয়স ত্রিশ। গত বৎসর বিবাহ করেছে। এখনো বিবাহ-বার্ষিকী আসেনি। সেটা কত তারিখে হবে তা জানায়নি; তবে তারিখটা যে প্রত্যাসন্ন এটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। লিপিকা লিখেছে, সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে ভালবেসেই করেছে—বাবা-মার ব্যবস্থাপনায় নয়। কিন্তু এই সপ্তাহখানেক হল সে জানতে পেরেছে যে তার স্বামী—কর্মোপলক্ষ্যে তখন দিল্লিতে পোস্টেড—প্রাকবিবাহ-জীবনে একটি বিধবাকে ভালবাসত এবং ওদের দুজনের একটি অবৈধ সন্তানও আছে। এই সংবাদে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে লিপিকা স্থির করেছে সে আত্মহত্যা করবে। প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে। ওর স্বামী জানিয়েছে যে, ছুটি পাবে না—ওর কাছে আসতে পারবে না। লিপিকার আন্দাজ : বিধবা মেয়েটি তখন দিল্লিতেই কোথাও ছিল। সে আমাকে লিখেছিল, "কবে আত্মহত্যা করব তা স্থির করেছি, কিন্তু কীভাবে করব তা বলতে পারছি না। কারণ আমার ভাইঝি—শ্যামলী বসু আসানসোলে উষাগ্রাম হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ে—সে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। তার কাছে লুকাতে চাই যে, আমি আত্মহত্যা করেছি। কারণ সে তার পিসিকেও দারুণ ভালবাসে।... আপনাকে এ চিঠি লিখছি একটি বিশেষ কারণে। আমার এই ত্রিশ বছরের জীবনের ট্র্যাজেডিটা ডায়েরি আকারে বিস্তারিত লিখেছি। আপনাকে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেব। আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ : সেইটা অবলম্বনে একটা বই লিখবেন এবং তার এক কপি আমার স্বামীকে পাঠিয়ে দেবেন। আমাদের নামধাম বদলে দেবেন : স্বামীর নাম-ঠিকানা আমার ডায়েরিতে থাকবে। আশা করি মৃত্যুপথযাত্রীর এই অনুরোধটুকু রাখবেন।

বোঝ কাণ্ড!

আমি তৎক্ষণাৎ চিঠির জবাবটা লিখে কুরিয়ার-সার্ভিসে লিপিকাকে পাঠিয়ে দিলাম। সংক্ষিপ্ত চিঠিতে আমি ওর পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করে লিখেছিলাম, "আমি দুঃখিত! তোমার অনুরোধটা রাখতে পারব না। আমার উপন্যাসের নায়িকা ঐ অবস্থায় পড়লে হয় তার

স্বামীকে সংশোধনের চেষ্টা করত অথবা তাকে ডাইভোর্স করে নতুন করে সংসার পাতত। কিছুতেই আত্মহত্যা করত না। তুমি ইতিমধ্যে তোমার ডায়েরিটি যদি পাঠিয়ে দিয়ে থাক তাহলে আমি সেটি গ্রহণ করব। পড়ব না। রেজিস্ট্রি ডাকে আসানসোলে নবম শ্রেণীর শ্যামলী বসুকে উষাগ্রাম স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কেয়ারে পাঠিয়ে দেব। তার জানা থাকা দরকার : পিসি কীভাবে জীবনে হার মেনে নিয়েছিল। তাহলে নিজের জীবনে সে ঐ একই ভুল করবে না।"

তোমরা খুশি হবে শুনলে : প্রায় মাস-খানেক পরে লিপিকা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। এবার লেটার হেডে। সে এম.বি. বি.এস ডাক্তার—গাইনোতে ডিপ্লোমা আছে। একটা হাসপাতালে কর্মরতা। কী জানি চিঠির মাধ্যমে আমি তার গালে একটা থাপ্পড় না কষালে সে হয়তো সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ঐ সোমা ঘোষের মতো আত্মহননের পথটাই বেছে নিত। লিপিকার সঙ্গে আর আমার পত্রালাপ হয়নি। সে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েছে কি না, তাও জানি না। বলাবাহুল্য নামধাম সব বদলে লেখা। ঘটনাটা আদ্যন্ত সত্য!

মানছি, এই অনুচ্ছেদটা মূল-কাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। কিন্তু খোলামনে এই কথাগুলো না বলে শান্তিও পাচ্ছিলাম না, রে। ভূষণ রায়ের দুই অরক্ষণীয়া কন্যা আত্মহত্যা করেনি—সমাজ তাদের হত্যা করেছে। তারা তো মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে মৃন্ময়ী সামাজিক পৈশাচিকতাটা মেনে নেয়নি। তার কোনও উপায় ছিল না—আত্মহনন ব্যতিরেকে। যে-অবস্থায় পড়ে শত শত রাজপুত রমনী জহরব্রত পালন করেছেন মীনু খুড়িমা পড়েছিল সেই অবস্থায়। হয় নারীধর্ম, নয় জীবন—একটা ত্যাগ করতে হবেই। সে জীবনটাকেই বেছে নিয়েছিল।

কিন্তু, দিদিভাইয়েরা। তোরা মীনুর চেয়ে আড়াই শ'বছর এগিয়ে আছিস—বুড়ো দাদুর এই কথাটা ভুলিস না। কিছুতেই হার স্বীকার করিস না। আবার বলি : জীবন ব্যাপক! জীবন মহান! 'মনেরে আজ কহ যে/ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে।'

pathagar.net

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। অর্থাৎ রূপেন্দ্রনাথের স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তনের প্রায় দিন দশ-বারো পরের কথা। ভেবেছিলেন, দিন-তিনেকের ভিতরেই দু-খানি ঘর বাসোপযোগী করে ফেলবেন। বাস্তবে তা হয়নি। পিঠামুলি বাঁশের দেওয়াল বাঁধা, উলুখড়ের ছাউনি, ভিত ভরাট করিয়ে নিকানো, জানলা-দরজা স্বস্থানে স্থাপন করতে প্রায় একপক্ষকালই লেগে গেল। তারপর গোপনে আসতে শুরু করল মালপত্র, আসবাব। খাট-পালঙ্ক, তোরঙ্গ, তৈজসপত্র—মায় লক্ষ্মীর পট, গৃহদেবতা এবং তার সিংহাসন। পূজার নানা তৈজস—তাম্রপাত্র, ঘণ্টা, পিলসুজ,

জলশঙ্খ, শঙ্খ, কোষাকুশি—সব কিছু। কালবৈশাখী ঝড়ে যখন বন্দ্যোঘটি পরিবারের বাস্তুখানি পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে তখন পঞ্চায়েতের নির্দেশে জমিদার তারাপ্রসন্ন সেই অনুপস্থিত গৃহস্থের যাবতীয় অস্থাবর নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এটাই ছিল সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা। কোন গৃহস্থ সপরিবারে বিদেশে গেলে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব হলে পঞ্চায়েতে স্বয়ং-প্রবৃত্ত হয়ে ঐ গৃহস্থের যাবতীয় অস্থাবরের নিরাপত্তার বিধান করত। ইতিহাসে এ-কথা লেখা নেই—আর এই এতভঙ্গ বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস কেই বা লিখে রেখেছে! কিন্তু দু-একজন শিক্ষিত ভূমাধিকারীর প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ ও রোজনামচা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। জমিদারের খাজাঞ্চিবাবু তালিকা ধরে অনুপস্থিত রূপেন বাড়ুজ্জের প্রতিটি গচ্ছিত-সম্পদের হিসাব দিলেন—মায় অঙ্গমার্জনাবস্ত্র, সৌরীন্দ্রনাথের বাতিল বৌলহীন খড়মজোড়া এবং সেই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, যাতে রূপেন্দ্রজননীর অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণদ্বয়ের ছাপ নেওয়া হয়েছিল শ্মশানযাত্রার পূর্বে—রূপেন্দ্রনাথ তখন শিশু।

ঘটনাচক্রে এবার বৈশাখী পূর্ণিমা পড়েছে বৃহস্পতিবারে। তারাপ্রসন্ন বললেন, এই দিনটি শুভ! ঐ দিনেই নূতন করে গৃহপ্রবেশ কর হে রূপেন। একে পূর্ণিমা, তায় লক্ষ্মীবার। ঐ সঙ্গে সত্যনারায়ণের একটা পূজার আয়োজন করে ফেল।

মালতীও জনান্তিকে তাতে সায় দিল, তাই করুন, ঠাকুরপো। সত্যনারায়ণের সিন্নি নিতে পাঁচবাড়ির মহিলারা আসবেন। সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে এই সুযোগে।

বোধকরি মালতী মনে মনে আশা করছিল যে, সত্যনারায়ণ পূজার সিন্নি-প্রসাদ পেতে এসে প্রতিবেশিনীদের খরজিহ্বা শাণিত হবার অবকাশ পাবে না। রূপেন্দ্রনাথের বৌঠান হিসাবে গ্রাম্যনারীসমাজে সে স্বীকৃতি পাবে। শোভারাণী—দুর্গা গাঙ্গুলীর অরক্ষণীয়া মেয়েটিও নিত্যি হাজিরা দিয়ে চলেছে, সে-ও বললে, সবার প্রথমে একটা সত্যনারায়ণের পূজা লাগিয়ে দিন, রূপোদা। আপনি না হয় এ বাড়িতে ছেলেবেলায় কাটিয়েছেন রূপো-সোনা তো তার জীবনের প্রথম রাতটা কাটাবে আজ এর বাস্তুভিটার ছায়ায়।

কথাটা মনে ধরল রূপেন্দ্রনাথের। রাজি হয়ে গেলেন তিনি। একবার ক্ষীণ আপত্তি করতে গিয়েছিলেন, আর্থিক অনটনের কথা বিবেচনা করে—তারাপ্রসন্ন তাঁকে মারতে বাকি রেখেছেন। তারাপ্রসন্নের যুক্তিটাও ফেলে দেবার নয়। ঐ ধন্বন্তরী-কবিরাজের অলৌকিক চিকিৎসার আয়োজন না হলে ছয়-সাত বছর আগেই তারাপ্রসন্ন মাতৃহীন হয়ে যেতেন। যে মহিলাটির গঙ্গাযাত্রার আয়োজন সুসম্পন্ন সেই বৃদ্ধাকে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন সংসারে! আজও তিনি কাশীধামে বর্তমান। সেই অবিশ্বাস্য চিকিৎসার পর থেকেই রূপেন্দ্রনাথ হয়েছেন : ধন্বন্তরী।

রূপেন্দ্র বলেন, সে জন্য জেঠামশাই তো আমাকে যথারীতি বৈদ্যবিদ্যায় দিয়েছিলেন, তারাদা।

তারাপ্রসন্ন বলেন, জানা আছে আমার। বাবামশাই তোমাকে দিয়েছিলেন একটা গ্রামীণ চিকিৎসালয় আর একটা একবগ্গা দীঘি। এই তো? সে তো তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসাবাবদ। কিন্তু আমাকে যে প্রায় একদশককাল মাতৃহীনদশা থেকে তুমি মুক্তি দিয়েছ, তার প্রতিদান আমাকে

দিতে দেবে না? তাছাড়া, এ তো আমি তোমাকে বৈদ্যবিদ্যায় দিচ্ছি না। আমার ভগ্নী কুসুমমঞ্জরীর একমাত্র কন্যা রূপমঞ্জরী এই পূর্ণিমাতে তার বাস্তুভিটায় গৃহপ্রবেশ করবে। তাই আমি আর তোমার বৌঠান সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করেছি। তুমি বাধা দেবার কে? সব ব্যয়ভার আমার। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, এরপর আর কথা চলে না।

একটু কী-যেন চিন্তা করে তারাপ্রসন্ন জানতে চেয়েছিলেন, তুমি মহাপ্রসাদ মুখে দাও না, অথচ 'বৃথামাংস' গ্রহণে তোমার বিকার নেই! সত্যনারায়ণ পূজায় তোমার নৈতিক আপত্তি নাই তো, রূপেন?

রূপেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, না, তারাদা, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি বুদ্ধদেবকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাই বলে আমি নাস্তিক নই। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে সত্যনারায়ণকেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

তারাপ্রসন্ন অবাক হয়ে বলেন, ও আবার কী কথা? কেন?

—কারণ গ্রামীণ ভারতবর্ষে প্রধান যে দুটি সম্প্রদায়—হিন্দু আর মুসলমান—তারা ঐ দেবতার দরবারেই মিলিত হয়। 'সত্যনারায়ণে'র পরিপূরক 'সত্যপীর'। দোল-দুর্গোৎসব-দীপান্বিতার বিপ্রতীপ উৎসব গ্রামীণ মুসলমান সমাজে অপ্রচলিত—আবার মহরম, ফতেয়া-দোয়াজ-দাহম, বকর-ঈদ-এর বিপ্রতীপ উৎসব প্রচলিত নেই হিন্দু সমাজে। স্বীকার্য, রঙ দোলে অন্তত বাঙলার গ্রামে মুসলমানেরাও রঙ মাখে, মহরমে হিন্দুর ছেলে হাসান-হুসেনের দুঃখে বুক চাপড়ে কাঁদে—কিন্তু সেটা 'সত্যনারায়ণ-সত্যপীরের' মতো একসুরে বাঁধা নয়। এই লৌকিক দেবতা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখিবন্ধন করেছেন।

—কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বল তো, রূপেন। তুমি শাক্ত বাড়ির সন্তান, পাঁঠার মাংস খাও—

—না, তারাদা, বিপত্নীক হবার পর...

—জানি, আমি তার আগেকার কথা বলছি। সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করার পূর্বে তুমি আমিষ আহার করতে অথচ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করত না! তাই না? কেন?

—তুমি কী করে জানলে?

—আমি জানি, অনেকদিন আগেকার কথা—তুমি দুর্গা খুড়োর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলে। শুনেছি, তার কারণটা ঐ—'মহাপ্রসাদ' গ্রহণে তোমার আপত্তি। কারণটা কী জানি না।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, খাদ্য-খাদকের সম্পর্কটা মানুষের সৃষ্টি নয়। এটা জীবগতের অনস্বীকার্য আইন। হরিণ, গরু, খরগোশ ঘাসপাতা খায়, ঘাসপাতার প্রাণ নেই। ফলে জীবহত্যা না করে তারা জীবনধারণ করতে পারে—বনের বাঘ, সিংহ তা পারে না। এ নিয়ম প্রাকৃতিক। বিশ্ব-প্রপঞ্চ, যিনি সৃষ্টি করেছেন এ তাঁর নিয়ম। তাই মৎস্য বা মাংস-ভক্ষণে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু যাকে তোমরা 'মহাপ্রসাদ' বল, অর্থাৎ বলিদান করা পশুর-মাংস তো দেহধারণের জন্য, জৈবিক বৃত্তির জন্য খাওয়া হয় না—সেটা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে ভক্ষ্য। তাতেই আমার আপত্তি। আদিযুগে শক্তি উপাসকেরা নির্দেশ দিয়েছিলেন : মায়ের বেদীসম্মুখে বলি

দিতে হবে অন্তরের ষড়রিপুকে — 'কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য'কে। তারই প্রতীক হিসাবে বলি দেওয়া হত একটি কুষ্মাণ্ডকে। ক্রমে কুষ্মাণ্ডর স্থলে এল একটি ছাগশিশু— ষড়রিপুর প্রতীক। কালে মানুষ ভুলে গেল : কী ছিল মূল উদ্দেশ্যটা। ষড়রিপুকে বলি দেওয়া নয়, ঐ ছাগশিশুর মাংসে উদরপূর্তি করার মধ্যেই তারা মুক্তি পথ খুঁজতে থাকে। 'পঞ্চ ম-কার'-এর পঙ্ককুণ্ডে ভেসে গেল তাদের শুভবুদ্ধি, ব্যভিচারের পঙ্কিল পাপকুণ্ডে। আমার ঐ সিদ্ধান্ত এই ধর্মীয় ভ্রান্তির প্রতিবাদে।

তারাপ্রসন্ন ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, কিন্তু তোমার ঐ নীরব প্রতিবাদে কী লাভ হল সমাজের? কেউ তো তা জানতে পারবে না।

—নিশ্চয় কিছুটা লাভ হবে। এই তো, দেখ না, তোমার দীর্ঘদিনের কৌতূহল চরিতার্থ করতে তুমি প্রসঙ্গটা আজ উত্থাপন করলে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের একজনকে তো তত্ত্বটা বলার সুযোগ হল? হল না? তারপর ধর, কথাটা যদি তোমার মনে ধরে থাকে তবে হয় তো আজ রাতেই তুমি বৌঠানকে সবিস্তারে কেচ্ছাটা শোনাবে।

—'একবগ্গা' কেন 'মহাপ্রসাদ' ভক্ষণ করে না জান? সে এক আজব কাণ্ড। শোন বলি—'। কাল সকালে বৌঠান হয়তো বলবে পুঁটুরানীকে।

সাড়ম্বরে সত্যনারায়ণ পূজা সারা হল। সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে গৃহস্থ তার প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করতে যায় না; তবে সংবাদটা জানাতে হয়। সে দায়িত্ব নিয়েছিল শোভারাণী আর জীবন দত্ত। শোভারাণী রূপমঞ্জরীকে শিখিয়ে দিয়েছিল আমন্ত্রণের কায়দা : "আমার বাবামশাই হচ্ছে ভেষগাচার্য-রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা গায়ে ফিরে এসেছি। আজ রাত থেকে আমরা আমাদের সাবেক ভিটেতে আবার বসবাস শুরু করব। তাই আজ আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা হবে। আপনারা সিন্নি প্রসাদ নিতে আসবেন।"

শুনে পাঁচ বাড়ির মেয়েরা হেসেই বাঁচে না—ওমা! কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি হয়েছে। রূপোদার/রূপোকাকার/রূপো ঠাকুরপোর!

একবেলার মধ্যেই সারা গাঁয়ে 'রূপমঞ্জরী' পরিচিতা হয়ে গেল। শোভারাণী ওকে জমিদার বাড়িতেও নিয়ে গেল। তারাসুন্দরী রূপোকে কোলে করে সব মহলে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন।

পূজা কিন্তু রূপেন্দ্রনাথ নিজে করলেন না। পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত করলেন শিরোমণি-মশাইকে—যাঁকে চিরকাল জগু-ঠাকরুণ ডেকে আনতেন পূজা-পার্বণে। বার-ব্রতে। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থপূজার আয়োজনে। রূপেন্দ্রনাথ আন্তর গভীরে অদ্বৈত-বৈদান্তিক। তাছাড়া সাবেক

পুরোহিতের রুজি-রোজগারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করবেন কেন?

উঠানের মাঝখানে একটি ছোট্ট চাঁদোয়া। তার নিচে সত্যনারায়ণের সিংহাসন। উঠোনজোড়া আলপনা। শোভারাণী আর হরিমতি আলপনা দিয়েছে। আহা! আজ কাতুটা থাকলে কত খুশি হত! আর জগুপিসি!

হ্যাঁ, এতদিনে সংবাদ পেয়েছেন—সেই নারী বিদ্রোহিনী, ওঁর পিতৃস্বরূপ জগুঠাকরুণের প্রয়াণের মাসছয়েক পরে এ ভদ্রাসন ত্যাগ করে কাত্যায়নী। তার খঞ্জ স্বামীকে নিয়ে নতুন সংসার পাততে গিয়েছিল। বর্ধমান-সরকারের নায়েব-কানুনগো নগেন দত্ত মশায়ের, মাতৃশ্রাদ্ধর দান গ্রহণ করে নতুন বাস্তু বাঁধতে ওরা স্বামীস্ত্রী ভিনগাঁয়ে চলে যায়। আহা! তারা সুখে থাক। রূপেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে প্রার্থনা করেন। যাক, তাহলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে জগুপিসি একটু গঙ্গাজল পেয়েছিল মেয়ের হাতে! বৈকুণ্ঠলোক যদি আদৌ থাকে—আহা-পিসি যেন সেখানে একটু ঠাঁই পায়।

পাঁচ-প্রতিবেশীর এয়োস্ত্রী, কন্যা এবং বিগতভর্তার দল ভিড় করে এসেছিলেন সত্যনারায়ণের পূজায় সিন্নি পেতে। রূপেন্দ্রনাথকে সবাই আন্তরিক ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রটাকে ভয়ও করে। রূপোদাটা যেন কালাপাহাড়! বলে কি যে, 'মহাপ্রসাদ' মুখে দেব না! কী-অসৈরণ কতা। তা হোক, সমাজপতিরা যেখানে অন্যায় জুলুম করেন সেখানে ঐ প্রতিবাদী মানুষটাই বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় দুর্বলের পক্ষ নিয়ে। ঐ কন্দর্পকান্তি মানুষটিই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বেষ্টা-বায়েনের গর্ভবতী স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে। বেষ্টার সেই শিশুটি এখন হামা-দেওয়া ছেড়ে হাঁটতে শিখেছে। সে তো জীবন পেয়েছে ঐ রূপো-ঠাকুরপোর দয়াতেই!

ছোট্ট উঠানটিতে যেন সুন্দরীদের হাট। জমিদারবাড়ি থেকে এসেছেন তারাসুন্দরী, তাঁর ননদ পুটুরাণী, ননদের মেয়ে, নন্দদুলালের দুই সহধর্মিনী, তার ভগ্নী, ভাগিনেয়ী। কন্যা হরিমতী। মৃন্ময়ীর মা আর বৃদ্ধা পিসিমা বালবিধবা গিরিবালা। দুর্গা গাঙ্গুলীর কন্যা আর ভাইঝি—আরও কত কত বাড়ি থেকে। পুরুষেরা বসেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রূপমঞ্জরী আর শুভপ্রসন্ন একেবারে পুরোহিতের নাকের ডগায়। হাত ধরাধরি করে। আর মালতী এক গলা ঘোমটা দিয়ে প্রায় সর্বত্র।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন পীতাম্বর মুখুজ্জে।

—এই যে বাবাজীবন। অ্যাদ্দিনে গাঁয়ের কতা মনে পড়ল?

রূপেন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর পিতাকে প্রণাম করে বললেন, বহু দূর দূর তীর্থ ঘুরে এলাম, খুড়ো। পুরী এবং কাশীধামও।

—শুনেছি। তুমি একটু ইদিকে সরে আসবে, বাবা? তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কতা ছিল—

রূপেন্দ্র একটু আড়ালে সরে এসে বললেন, আপনি যা জানতে চান তা আমি মোটামুটি তারাদাকে জানিয়েছি। শোভারাণীকেও বলেছি। জানি, আপনি বা খুড়িমা আরও বিস্তারিত

pathagar.net

জানতে চান—মীনুর বিষয়ে, তাই তো—কিন্তু এখন, এই পরিবেশে...

—বটেই তো, বটেই তো! আমি কাল সকালে আর একবার আসব বরং। খুকির প্রসঙ্গ ছাড়া আরও কিছু আলোচনা করার আছে।

—বেশ তো আসবেন। সব কথাই খুলে বলব আপনাকে। শুনব।

নন্দ চাটুজ্জেও ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে—তাঁর বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে—ঘনিয়ে এলেন। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে গেলেন পীতাম্বর মুখুজ্জে। গ্রামসম্পর্কে খুড়ো-মশাইকে প্রণাম করতে হল রূপেন্দ্রনাথকে। নন্দ বললেন, চিরায়ুষ্মান হও বাবা! শুনলাম বৌমা নাকি ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে গেছেন। প্রসব হতে গিয়ে, না কী? অন্য কোনও ব্যাধিতে?

নন্দের কর্ণমূল মুখটা নিয়ে এসে রূপেন্দ্র বললেন, সেসব কথা পরে আলোচনা করব খুড়ো। সত্যনারায়ণের পাঠ শুরু হয়ে গেছে।

সত্যি কথা। শিরোমণি ঠাকুর পাঁচালী পাঠ শুরু করে দিয়েছেন। অবগুণ্ঠনবতীরা গলায় আঁচল দিয়ে যুক্ত কর হয়েছেন। পুরুষেরাও গুড়ুক সেবনে ক্ষান্ত দিয়ে শান্ত হয়ে বসেছেন। নন্দ সেদিকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, অ! তা এট্টু বাইরে এস না, রূপেন। একটা জরুরী কতা ছিল...

—জরুরী কথা? কী বিষয়ে?

—তোমার সঙ্গে নাকি একই নৌকায় একটি যুবতী বিধবা...

জনতার ভিতর থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় ধমক দিয়ে ওঠেন, আস্তে। কথা বলবেন না। ব্রতকথা পাঠ শুরু হয়ে গেছে।

রূপেন্দ্রনাথ ওষ্ঠাধরের উপর দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটা স্থাপন করে নন্দকে ইঙ্গিত করলেন।

সমাজপতি বাধ্য হয়ে নীরব হলেন।

আপাতত।

pathagar.net

একপ্রহর রাতের শিবাধ্বনি হওয়ার আগেই শেষ হল ব্রতকথা। পাঁচ বাড়ির এয়োরা এগিয়ে এল প্রসাদ নিতে এবং বিতরণ করতে। ছোট-ছোট করে কাটা কলা-পাতায় নানা ফল, লোচিকা, ব্যাঞ্জন, পরমান্ন, বাতাসা, খুর্মো, পাটালি, আর সিন্নি। প্রসাদ পাওয়ার নিয়ম হচ্ছে —বাতাবিলেবু বা আতা জাতীয় ফলের বীজ ছাড়া পাতায় কিছু পড়ে থাকবে না। বীজগুলি হাতে তুলে নিয়ে 'পাঁদাড়ে'র দিকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। আর দু-হাতে কদলীপাত্রটা লেহন করে সাফা করতে হবে। সিন্নি প্রসাদ পাওয়ার পর হস্তপ্রক্ষালনের বিধি নাই। হাতটা মাথায় মুছে ফেলতে হয়। এ-কারণে খুব সাবধানে সবাই সিন্নি-প্রসাদ গ্রহণ করে। বাতাসা বা পাটালিকে চামচ হিসাবে ব্যবহার করে।

বাঁশঝাড়ের মাথার উপর বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ উঠল আসর ভাঙতে ভাঙতে। ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। সকলেই যে-যার বাড়ি পানে রওনা দিল।

শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম। মীনুর পিসিমা অর্থাৎ পীতু মুখুজ্জের দিদি গিরিবালা একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বললেন বাব্বা! মাজাটা ধরে গেছে। আমি আর পারবনি বাপু, এতটা পথ হেঁটে যেতে।

'এতটা পথ' মানে দীঘির ও-পার। রূপেন্দ্র বুঝলেন। বললেন, বুঝেছি। তা খুড়িমাকে বলে রেখেছেন তো যে, রাত্রে আপনি ফিরবেন না?

গিরি-পিসিমা বললেন, আমি আবার তারে কী বলব? সেই তো আমারে বললে, তুমি রাতটা রূপোর ঠাঞেই থেকে যেও। মালতী বেচারি একা-একা ভয় পাবে। ওর সাথে শুয়ো।

মালতী সলজ্জে নতনেত্রে বলল, হ্যাঁ, কথাটা উনি আমার সামনেই বলেছিলেন। পিসি আর আমি ঐ পশ্চিমের ঘরটায় শোব। আপনি মঞ্জরীকে নিয়ে উত্তরদুয়ারি ঘরে বড় পালঙ্কে শোবেন।

সেই মতোই ব্যবস্থা হল রাত্রিবাসের।

সৌরীন্দ্রনাথের আমলের বিরাট সাবেক পালঙ্ক। কর্তামশাই এককালে এই শয্যাতেই শয়ন করতেন। বাপের কোল ঘেঁষে টুমটুম্ হয়ে শুয়ে পড়ল রূপমঞ্জরী। বললে, আমারে অ্যাট্টা কিছ্ছা শোনাবে বাবা?

pathagar.net

—শোনাব। যদি তুমি ভাল করে আমাকে কথাটা বলতে পার!

—'ভাল করে'? কী খারাপ বলনু আমি?

—'বলনু' নয় মা-মণি, 'বললাম' বা 'বলেছি'। তুমি লক্ষ্য করে দেখ, আমরা সবাই কী ভাষায় কথা বলি। মালতী, বৌঠান, তারাদা, শুভপ্রসন্ন কী ভাষায় কথা বলে। তোমার কোন দোষ নেই—এতদিন তুমি ঝি-চাকরদের মাঝখানে মানুষ হচ্ছিলে। শুনে শুনে তাদের কথ্যভাষাটাই বলতে শিখেছ। তোমাকে আমি লেখাপড়া শেখাব। সংস্কৃত শেখাব, ফার্সি শেখাব। তার আগে নিজের চেষ্টায় তোমাকে শুধু বাংলা বলতে হবে। ঐ শুভপ্রসন্নের মতো। আমি কী বলছি, বুঝতে পারছ, সোনা-মা?

রূপমঞ্জরী তার ছোট্ট মাথাটা ইতিবাচক ভঙ্গিতে নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

—তুমি এবার ঐ শুভপ্রসন্নের মতো ভদ্র ভাষায় আমাকে বল তো মা-মণি—যে-কথাটা একটু আগে বলেছ!

রূপমঞ্জরী সাবধানে একটা-একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল : আমাকে একটা গল্প শোনাবে, বাবা?

রূপেন্দ্রনাথ ওকে কোলে টেনে নিয়ে গালে চুমু খেলেন। বললেন, এই তো। ঠিক বলেছ! 'আমারে' নয় 'আমাকে'; 'অ্যাট্টা' নয়, 'একটা', 'কিছ্ছা' নয়, 'গল্প'। শুধু একটা ভুল হয়েছে— 'বলবে' নয়, 'বলবেন!'

...তোমরা অবাক হচ্ছ, তাই না, দিদিভাই? তোমরা শুধু 'মা'কে নয়, হয়তো 'বাবা'কেও 'তুমি' বল। আমার নিজের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিরাও তাই বলে। কিন্তু আমি বা আমার দাদা-দিদিরা শুধু বাবা-মশাই বা কাকা-জেঠাদের নয়, নিজের নিজের দাদা-দিদিকেও, এমনকি মাকেও 'আপনি' বলতাম। অষ্টাদশ-শতাব্দীতেও সেটাই ছিল শিষ্টাচার।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, আজকের এই দিনটি একজন মহাপুরুষের জন্মতিথি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদে। রাজার সন্তান তিনি।

—আপনি কি রাজপুত্তুরের গল্প বলছেন, বাবা?

চমৎকৃত হলেন রূপেন্দ্রনাথ। প্রণিধান করলেন, অতি ক্ষুরধার বুদ্ধি তাঁর আত্মজার। একবার মাত্র নির্দেশেই সে সংশোধন করে নিয়েছে নিজেকে। তার বর্ষচতুষ্টয়ের

pathagar.net

প্রাকৃতজনপ্রভাবিত বালভাষ মুহূর্তমধ্যে সংশোধন করে নিতে পেরেছে। রূপেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিকই বলেছ মা, তবে কথাটা 'রাজপুত্তুর' নয়, 'রাজপুত্র'। শোন এবার গল্পটা—

আমাদের কাহিনীর সেই ছোট্ট নায়িকাটি—যিনি বিবেকনির্দেশিত পথে পুরুষশাসিত অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে নারীজাতিকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠার ব্রত সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন—সেই অলোকসামান্যা তাঁর সপ্তপুরুষের পদরজধন্য বাস্তুভিটায় প্রথম রাত্রিযাপনের অবকাশে পিতৃদেবের কাছে প্রাকৃত ভাষায় শুনলেন এক মহা-'রাজপুত্রের' গল্প। যে-রাজপুত্র বিবেকনির্দেশে গড্ডলিকা স্রোত শামিল হতে অস্বীকার করেছিলেন। নিন্দা করেছিলেন সেই যজ্ঞবিধিকে যা অবোধপশুকে বলিদানের মাধ্যমে পরমার্থলাভের সন্ধান করত। রাজপুত্র বস্তুতঃ জ্ঞাননিধূতকল্মষ পরমবুদ্ধ। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দকে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শেষ নির্দেশ :

আত্মদীপো ভব।
আত্মশরণো ভব।।
অনন্যশরণো ভব।।*

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম মহিলা বিদ্যানিকেতন—শুধু গৌড়মণ্ডলে নয়, বোধকরি এযুগের ভারতের প্রথম স্ত্রীশিক্ষানিকেতন। বিনা আড়ম্বরে, বিনা শঙ্খনির্ঘোষে, নীরবে, নিভৃতে তার প্রতিষ্ঠা হল দামোদরতীরের এক গণ্ডগ্রাম—সোঞাই-এ। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। এ প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র স্ত্রীজাতীয়দিগের শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন। ছাত্রীসংখ্যা মাত্র আট। বহু আয়াসেও তদপেক্ষা অধিক ছাত্রী যোগাড় করা যায়নি। উপায় কী? অক্ষর পরিচয় এবং বৈধব্যযোগ যে পণ্ডিতমশাইদের মতে বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত!
আটজনের পরিচয় একে-একে দাখিল করা যাক।

সর্ববয়োঃজ্যেষ্ঠা ছাত্রীটির বয়স তিনকুড়ির ওপারে : গিরিবালাদেবী বালবিধবা—সুতরাং নূতন করে বৈধব্যযন্ত্রণার ব্যবস্থা করতে স্বয়ং যমরাজও অশক্ত। তিনি হচ্ছেন পীতাম্বর মুখুজ্জের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—মৃন্ময়ীর পিসিমাতা ঠাকুরাণী। সেই যে সত্যনারায়ণ পূজার দিন বৈশাখী পূর্ণিমায় এই বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে পদার্পণ করেছেন তারপর আর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেননি। রূপেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন এটি তাঁর হিতৈষীবর্গের গোপন ব্যবস্থাপনা। নীতু মুখুজ্জে আর তারাপ্রসন্নের যোগসাজশে গিরিবালা এই ঢং ধরেছেন : 'আমি আর চলতে পারবনি বাপু।'

* নিজেকে প্রদীপের মতো প্রজ্বলিত কর। সেই আত্মদহনকারী দীপশিখার আলোকে জীবনপথ অতিক্রম করে চল। অপরের আপ্তবাক্যে প্রভাবিত হয়ে কাজ করবে না।

রূপেন্দ্রনাথকে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানাননি। জানাতে সাহস হয়নি। কী-জানি একবগ্গা যদি বেমক্কা রুখে দাঁড়ায়। তাই তারাসুন্দরী আর মীনুর-মা গোপনে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মালতীকে। প্রকাশ্যে বলা হল : গিরিবালা ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। স্থির হল রূপেন্দ্রনাথকে লুকিয়ে পীতাম্বর দিদির জন্য আতপ চাউল গোপনে যুগিয়ে যাবেন মালতীর ভাঁড়ারে। মালতী মনে-মনে স্থির করে এসেছিল সোঞাই গাঁয়ে বাস করতে এসে শ্রী সত্যনিষ্ঠ কন্দর্পকান্তির কাছ থেকে কিছুই গোপন করবে না। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা গেল না। বুঝল, গিরিপিসি নিজে থেকে এ ভিটায় বাস করতে না এলে—একটি বিপত্নীক যুগপুরুষ এবং একজন নিঃসম্পর্কীয়া যৌবনবতী বিধবার একত্রবাস গ্রাম্যসমাজ ভালচোখে দেখত না।

তাছাড়াও একটি গুরুতর কারণ ছিল। কিন্তু মালতী সেকথা নিজের কাছেও স্বীকার করতে লজ্জা পায়। গিরিপিসি আসাতে সে ধড়ে প্রাণ পেল।

রূপেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় হেতুটার বিন্দুবিসর্গও আঁচ করেননি; কিন্তু প্রথম যুক্তিটা সহজেই আন্দাজ করলেন। স্বীকার করলেন না। বললেন, পিসি, ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, বেশ করেছেন। কিন্তু এ-বাড়িতে আপনাকে থাকতে দেব একটি শর্ত মেনে চললে। আপনাকে লেখাপড়া শিখতে হবে।

গিরিবালা আঁৎকে ওঠেন : ওমা আমি কোথায় যাব। আমার বয়স যে তিনকুড়ি পেরিয়ে গেছে রে! এই বুড়ি বয়সে তালপাতায় আঁক করব?

—না! অঙ্ক শিখতে হবে না আপনাকে। শিখবেন ভাষা। অ-আ, ক-খ। নিজে-নিজে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণখানা পড়তে হচ্ছে করে না?

এবার থমকে গেলেন পিসি : পারব?

—আলবৎ! তিনমাসের মধ্যে! যদি না পারি...

—না, না, দিব্যি-দিলেস দিস্‌নি রূপো। তুই তো জানিস না, আমার মাথায় স্রেফ গোবর! তোর পিসেমশাই বলতেন!

বিদ্যানিকেতনের বাকি সাতজন ছাত্রীর কথা বলি ; যারা সমাজপতিদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ওঁর অবৈতনিক পাঠভবনে নিত্যি হাজিরা দিতে আসতেন।

দ্বিতীয়ত তারাসুন্দরী। জমিদারের ঘরণী। তাঁর শাশুড়ি ঠাকরুণ কর্তার কাছে জনান্তিকে সাক্ষর হয়েছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। সেসব কথা আগেই বলেছি। ওঁরা দুজনে লুকিয়ে কালিদাস-ভবভূতি-ভাস পাঠ করতেন। পড়তেন ও শুনতেন। পালা করে। প্রথম যুগে শৃঙ্গার রস। ক্রমে মহাকাব্য। শেষে 'যম-নচিকেতা সম্বাদ', 'গার্গী-যাজ্ঞবল্ক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা। এ সংবাদ প্রথম দিকে গোপন ছিল, অন্তত যতদিন ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেব জীবিত ছিলেন। তারপর এ-কথা গ্রামে কারও জানতে বাকি ছিল না। কই ব্রজসুন্দরীকে তো অকাল বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি! ব্রজেন্দ্রনারায়ণ পরিণত বয়সে স্বর্গলাভ করেছেন। ব্রজসুন্দরী তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদন করে বার্ধক্যে বারাণসীধামে চলে গেছেন।

তারাসুন্দরীর কর্তার না আছে সময়, না ধৈর্য, না উদ্যম। তবে বাধাও তিনি দেননি।

মাথায় অধো ঘোমটা টেনে জমিদারগৃহিনী তাই প্রত্যহ রূপেন-ঠাকুরপোর ভিটায় হাজিরা দিতেন। বাংলা, ক্রমে সংস্কৃত শিখবেন বলে। একটু সঙ্কোচ অবশ্য ছিল। বয়সটার জন্য। রূপেন আর তারাসুন্দরী প্রায় সমবয়সী। দুজনেই ত্রিশ-বত্রিশ। তা সে বাধাও ঘুচে গেল পুঁটুরাণীর আগ্রহে। সে এসে বললে, 'তুমি দাদাকে বল বৌঠান, আমি রূপোদার পাঠশালায় পড়তে যাব। আমার তো আর ও-ভয় নেই।

না তা নেই। যমদূতগুলো আহাম্মকের বেহদ্দ। চোখ মেলে দেখল না : পুঁটুরাণী নিরক্ষরা! সিঁথের সিঁদুর মুছে মেয়ের হাত ধরে যে ফিরে এসেছিল বাপের বাড়ি।

ফলে পুঁটুরাণী হল তিনি নম্বর ছাত্রী। তার পাঁচবছরের কন্যাটি চার নম্বরের। বয়ঃপ্রাপ্তা অনূঢ়া ছাত্রী মাত্র একজন : শোভারাণী। রীতিমতো লড়াই করে সে ভর্তি হল রূপোদার পাঠশালায়। শোভারাণী সুন্দরী নয়। কুসুমমঞ্জরী বা মৃন্ময়ীর মতো চম্পকগৌর গাত্রবর্ণ থেকে সৃষ্টিকর্তা তাকে বঞ্চিতা করেছেন। কিন্তু তাই বলে স্বগ্রামের ঐ অনিন্দ্যকান্তির দিকে সে মনে মনে আকৃষ্ট হবে না কেন? না, রূপোদার শুধু রূপ নয়, শোভারাণী তার বেড়া-বিনুনী-বাঁধা যুগ থেকে দেখে আসছে ঐ গ্রাম্য বিদ্রোহীর অপরিসীম দাঢ়া। সমাজপতিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে বারে-বারে দেখেছে তাঁকে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো রুখে দাঁড়াতে। সব কিছু সে বুঝতে পারেনি, আজও পারে না—বেচারির সে শিক্ষাটাই যে হয়নি। কিন্তু এটুকু বুঝেছে যে, ঐ রূপোদাই আসলে সেই পক্ষিরাজে-চড়া রাজপুত্তুর, যার কথা সে শুনেছে বহু জোনাকজ্বলা সন্ধ্যায়, ঠাম্মার কোল ঘেঁষে বসে। প্রায় যৌবনোত্তীর্ণা ঐ অরক্ষণীয়ার মর্মবেদনাটা কি তোমরা বুঝতে পার না? স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ, লেখাপড়া শিখলে আর দুটি হাত গজায়-কি-গজায় না তা জানে না শোভারাণী। জানতে চায়ও না! কী লজ্জার কথা —তার আসল উদ্দেশ্য ঐ আজব মানুষটাকে সে রোজ কাছে থেকে বসে দু-চোখ মেলে দেখতে পাবে, তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। প্রয়োজনে এক-'ফেরো' ঠাণ্ডা জল কলসি থেকে গড়িয়ে এনে বলতে পারবে, রূপোদা আপনার তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়! খান!

এর বেশি সেই মেয়েটি আর কিছু প্রত্যাশা করে না। করতে সাহস পায় না।

দুর্গা গাঙ্গুলী সমাজপতি। কট্টর প্রাচীনপন্থী। স্ত্রীলোক সাক্ষর হবে এমন 'অসৈরণ-কথা' তিনি নিশ্চয় বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি গ্রামে অনুপস্থিত। দুই যৌবনবতী সদ্যোবিবাহিতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুনরায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থ করতে গেছেন—পুন্নামনরক থেকে নিস্তার পাওয়ার আশা নিয়ে। ফলে শোভারাণীর বর্তমান অভিভাবক গাঙ্গুলীবাড়ির সেজতরফের বড়কর্তা, অর্থাৎ দুর্গাচরণের অনুজ কালীচরণ। তিনি প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন। শোভারাণী কর্ণপাত করেনি। কালীচরণ বাধ্য হয়ে শরণ নিয়েছিলেন দ্বিতীয় সমাজপতি নন্দ চাটুজ্জে মশায়ের দরবারে। নন্দও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। শোভারাণী হাত দুটি জোড় করে বলেছিল, আমাকে বাধা দেবেন না, ফুলকাকা! তারা-বোঠান এতটা বয়সে ওঁর পাঠশালায় আসছেন, পুঁটুদি আসছেন! আমারই কী দোষ হল?

নন্দ ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, গাধার মতো কতা বলিস না শোভা! ওরা হল বারিন্দির! ওদের নিয়মকানুন সব আলাদা। ওরা কি বামুন? ওদের ছেলেমেয়ের বে-তে পাকা দেখা

হয় না, হয় 'করণ'! তাই তো তারা-ভাদুড়ীর মা লুকিয়ে লুকিয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হতে চেয়েছিল...

শোভারাণী তখনো যুক্তকর। বলেছিল, দিগ্‌গজ পণ্ডিত হোন বা না হোন তিনি সমোস্কৃত পুঁথি পাঠ করতে শিখেছিলেন। আর সেই অপরাধে কোনও যমদূতের হিম্মৎ হয়নি তাঁর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে!

—দ্যায়নি? তারা-ভাদুড়ীর মা সধবা অবস্থায় ড্যাংডেঙিয়ে সগ্যে যেতে পেরেচে? বিধবা হ'য়ে কাশীবাসী হতে হয়নি তাকে?

শোভারাণী তখনো যুক্তকর। জবাবে বলেছিল, আমিও ড্যাংডেঙিয়ে সগ্যে যেতে চাই না, ফুলকাকা। শেষ বয়সে আমিও না হয় বিধবা হতে রাজি। কিন্তু বিধবা হতে হলে একটা 'বর' তো প্রথমে যোগাড় করতে হয়ে? বাবামশাই তো নিজের বিয়ে নিয়েই সারাটা জীবন ব্যস্ত। আপনিই আমাকে তাই একটা যোগাড় করে দিন না? কানা-খোঁড়া-বুড়ো, যেমনটাই হোক। নাহলে বিধবা হব কি করে? লেখাপড়া আমি শিখবই!

নন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মুখরা মেয়েটির বাচালতায়। দাঁতে-দাঁত দিয়ে বলেন, এক ফোঁটা মেয়ে তুই! বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস্ দেখছি।

শোভারাণী এবার হঠাৎ নন্দখুড়োর ঠ্যাং থেকে এক-খামচা একটা 'পেন্নাম' উঠিয়ে নিয়ে বলে, আপনি স্নেহের চোখে দেখেন, তাই নজর হয়নি। মেঘে মেঘে দেড়-কুড়ি বয়স হয়ে গেছে আমার। কুলীনঘরে না জন্মালে অ্যাদ্দিনে তিন ছেলের মা হয়ে যেতাম।

বজ্রাহত নন্দ বলেন, ঘোর কলি একেই বলে! লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছিস? আসুক তোর বাবা ফিরে।

একগাল হেসে শোভারাণী বলেছিল, না, ফুলকাকা! উনিশ-কড়া কলি! ঘোর কলি হতে এখনো এক কড়া নাকি! সেটা হবে মেহেরউন্নিসা যখন ভর্তি হবে রূপোদার পাঠশালায়।

—কে? মেহেরউন্নিসা! মানে? সে কে?

—শোনেননি বুঝি? সে এক বেহেস্তের হুরি! রূপোদা তারেও ভর্তি করে নিতে রাজি হয়েছে! আমার মতো বুড়ি নয়। ছোট ফুলখুড়িমার বয়সী!

কথাটা মিথ্যা নয়। নন্দের শেষ ধর্মপত্নী বছর বাইশ।

তারা-পুটু-সুজাতা একুনে তিন;

শোভা-মালতী-রূপমঞ্জরী, আর গিরিবালা, হ'ল সাত। রূপেন্দ্রনাথের অষ্টম ছাত্রী একজন যবনী : মেহেরউন্নিসা! পীরপুরের মৌলবী কলিমুদ্দিন সা'র এক ভগিনী! হ্যাঁ, খবরটা মিথ্যা নয়। কুলীন ব্রাহ্মণ রূপেন্দ্রনাথ মৌলভীসা'বকে 'জবান' দিয়েছেন : তাঁর পাঠশালায় ঐ যবনীকেও ভর্তি করে নেবেন। সেই অষ্টাদশ শতাব্দী যখন সবে পঞ্চাশোর্ধ্বা! বোঝ কাণ্ড!

দুঃসাহসিকতার একটা সীমা থাকবে তো!?

কিন্তু রূপেন্দ্র নির্বিকার। বিবেকনির্দেশ তিনি মৌলভীসা'বকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। বিচিত্র ঘটনা পরম্পরা। শোন বলি :

আয়ুর্বেদশিক্ষা সমাপনান্তে রূপেন্দ্রনাথ একসময় স্থির করেছিলেন বর্ধমানের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমান হেকিমের কাছে হেকিমীবিদ্যাও শিক্ষা করবেন। হেকিমসাহেব তাঁকে

বিদ্যাদান করতে স্বীকৃতও হয়েছিলেন ; তবে বলেছিলেন শিক্ষারম্ভের পূর্বে ছাত্রকে আরবী-ফার্সি দুটো ভাষাতেই আলিম হতে হবে। রূপেন্দ্রনাথ সে জন্য সোঞাই গ্রামে ফিরে আসার পর পীরপুরের মৌলভীসা'বকে অনুরোধ করেন ঐ দুটি ভাষায় শিক্ষা দিতে। পীরপুর দামোদরের ওপারের একটি মুসলমান-প্রধান গ্রাম। মৌলভী কলিমুদ্দিন সা'ব স্বীকৃত হয়ে যান। প্রত্যহ পড়ন্ত বেলায় তিনি সোঞাই-গাঁয়ে চলে আসতেন—জুম্মাবার বাদ দিয়ে। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত রূপেন্দ্রনাথকে ঐ দুটি ভাষা শেখাতেন। তারপর রূপেন্দ্রের পিসিমা জগুঠাকরুন একগলা ঘোমটা টেনে নিয়ে আসতেন কিছু প্রসাদী। ফলমূল-বাতাসা-খুরমো-কদমা। মৌলভীসা'ব পদ্মদীঘিতে অজু করে সাম-ওয়াক্তের নামাজটা সেরে নিতেন। তারপর ঐ প্রসাদটুকু মুখে ফেলে বিদায় নিতেন। ফিরে যেতেন পারানি ঘাটে, দামোদর পার হয়ে পীরপুর গাঁয়ে।

সেসব গত দশকের কথা। তারপর ঘটনাচক্রে রূপেন্দ্রনাথের বর্ধমান যাওয়া হয়নি। হেকিমীবিদ্যা শেখাও হয়নি। তবে আরবী না হলেও ফার্সীটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন ঐ মৌলভী সাহেবের সহায়তায়।

তাই এতদিন পরে তিনি ঐ উদারচেতা মুসলমান মৌলভীসা'বকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি।

...কিন্তু ওঁর দুঃসাহসিকতার পরিমাণটা তোমরা একবার বিচার করে দেখবেন দিদিভাই? রাধানগরে যুগাবতার রামমোহন রায়-মশায়ের আবির্ভাব হতে তখনো উনিশ বছর বাকি—বর্ধমানভুক্তির একটি প্রত্যন্ত গ্রামে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য একটি বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠা করছেন—কৃত্তিবাস-কাশীরাম এবং খানকয় মঙ্গলকাব্যের লিখিত পুঁথি আর রায়গুণাকরের কিছু গ্রন্থ ব্যতীত বঙ্গভাষায় সে-সময় কোন কিছু ছিল না—আর সেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীজাতীয়ার বিদ্যালয়ের আটটি ছাত্রীর অষ্টম বিদ্যার্থী হচ্ছেন : মেহেরউন্নিসা বেগম!

যবনী!!

রূপেন্দ্রনাথ সেই আয়োজনই করেছেন। বিবেকনির্দেশে! গৌড়দেশে কথ্য ভাষা বাঙলা। মেহেরউন্নিসার মাতৃভাষাও বাঙলা—উর্দু নয়, ফার্সি নয়! কোন যুক্তিতে সেই ছাত্রীটিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে? তারাসুন্দরী-মালতী-রূপমঞ্জরীর চেয়ে ছাত্রী হবার দাবি তার কম কিসে?

কিন্তু মৌলভীসা'বই বা এমন বেয়াড়া অনুরোধ করে বসলেন কেন? তাহলে মূলকাহিনীটা মূলতুবী রেখে মেহেরউন্নিসার কিসসটাই লিপিবদ্ধ করতে হয় প্রথমে :

মেহের হচ্ছে মৌলভীসাহেবের ভগিনী। প্রায় মালতীরই বয়সী—বাইশ-চব্বিশ। সদ্যোবিবাহিতা এবং সদ্য-স্বামীত্যক্তা! হেতুটা মর্মান্তিক।

মেহেরের বুকে, তলপেটে, উরুতে শ্বেতির দাগ আছে। মুখে নেই। এই অপরাধে মেহেরের খসম সাদির সাতদিনের মধ্যেই তাকে তিন-তালাক শুনিয়ে দিয়েছে। মৌলভীসা'ব সত্যাশ্রয়ী। পাত্রের আব্বাজানকে সত্য কথা সাদির অনেক পূর্বেই নিবেদন করেছিলেন। পিতা সে বার্তা পুত্রকে জ্ঞাত করিয়েছিলেন কি না সেটা ইতিহাসের অকথিত অধ্যায়। মেহেরের

খসম-এর দাবি ওটা শ্বেতি নয়। কুষ্ঠ। বিচক্ষণ হেকিম এবং স্বয়ং রূপেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, রোগটা আদৌ কুষ্ঠ নয়, শ্বেতি। সচরাচর শ্বেতির দাগ মুখেই ফুটে ওঠে। কোন কোন ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে তা দেহের অন্যান্য স্থানে দৃষ্ট হয়। কাসেম আলী—মেহেরের খসম—সেসব কথা কানেই নেয়নি। ধর্ম ও আইন তার পক্ষে। বিবাহের যাবতীয় যৌতুক হাতিয়ে নিয়ে সে তিন-তালাক দিয়ে মেহেরকে ঘাড় থেকে নামিয়েছে। মৌলভীসা'ব দ্বিতীয়বার মেহেরের নিকার আয়োজন করেননি। খোদাতালার ইচ্ছায় তাকে এভাবে জীবনটা কাটাতে হবে। উনি কর্মসন্ধানে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন। গত বছর। আলিবর্দীর মীর মুন্সীর সঙ্গে ওঁর খাতির ছিল। একই মোক্তবে দুজনে পড়েছেন। ফলে সহাধ্যায়ী, দোস্ত। মীর মুনসী ওঁকে একটা আজব খবর দিলেন। নবাব আলিবর্দী নাকি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যবৃদ্ধি-মানসে দুটি গ্রন্থ রচনায় ইচ্ছুক হয়েছেন। একটি বঙ্গভাষে কুরান-সরীফ। দ্বিতীয়টি ফার্সিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এজন্য তিনি উপযুক্ত পণ্ডিত নিয়োগ করতে ইচ্ছুক—যাঁরা বাঙলা এবং ফার্সি দুটি ভাষাতেই আলিম। মৌলভী সা'ব কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি বিশেষ কাণ্ড—অরণ্যকাণ্ড—ফার্সিতে অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মীর মুনসির কাছে দলিলে দস্তখৎ করে অগ্রিমও নিয়ে এসেছেন। ফার্সীতে তিনি আলিম, কিন্তু বাঙলা হরফ চেনেন না। কথ্য ভাষাটা তো মাতৃভাষা—ভালো রকমই জানেন। আশা ছিল কোনও পণ্ডিতকে নিয়োগ করে হরফগুলো চিনে নেবেন—বাংলা পড়তে শিখবেন। দুর্ভাগ্য মৌলভী সাহেবের—কোনও ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঐ যবনকে বিদ্যাদান করতে স্বীকৃত হননি। মুর্শিদাবাদে নয়, কৃষ্ণনগরে নয়, নবদ্বীপেও নয়। মৌলভী সাহেবের তখন স্মরণ হয়েছিল সোঞাই গাঁয়ের সেই আজব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির কথা : একবগ্গা বাঁড়ুজ্জে!

একদিন সে ছিল ছাত্র। আজ সে নিশ্চয় রাজি হবে গুরু হতে। মৌলভী সাহেব ফিরে এলেন পীরপুরে। সাক্ষাৎ করলেন সেই ব্যতিক্রম পণ্ডিতটির সঙ্গে।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, আমার যে এখন মরবার সময় নেই। মৌলভী সা'ব।

সে কথা সত্যি। তিনি যখন শয্যাত্যাগ করেন তখনো ঋগ্বেদের ঋষির বর্ণনায় "উষো যাতি স্বসরস্য পত্নী"* সুসম্পন্ন হয়নি। ভুলকো তারা জ্বলজ্বল করছে পূর্বাকাশে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, মধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে তিনি সূর্যোদয় মুহূর্তে উপস্থিত হতেন দাতব্য চিকিৎসালয়ে। জীবন দত্তের সমভিব্যাহারে প্রতিটি রোগাক্রান্তের তত্ত্বতালাস নেন। ব্যবস্থাদি দেন। তারপর অশ্বারোহণে দূর-দূর গ্রামে রুগী দেখতে যান। ফিরে আসেন মধ্যাহ্নে। আহারান্তে বসেন স্ত্রীজাতীয়ার বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আটটি ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে। বাঙলা-সংস্কৃত-অঙ্ক। গার্হস্থ্যবিদ্যা, পূজাবিধি, শিশুপালন। যে ছাত্রীর যেটি প্রয়োজন। তারপর সন্ধ্যা সমাগমে নিজের পড়াশুনা। তাঁর সময় কোথায়?

মৌলভী কলিমুদ্দিন সা'ব হঠাৎ বলে ওঠেন, মেনে নিলাম আপনার সওয়াল! আপনার পাঠশালাতে এসে আমি বসতে পারি না। কারণ পাঁচ মেহমানের ঔরৎ এসে আপনার কাছে লিখাপড়ি শিখবেন। সেখানে আমার হাজিরা সরম-কী-বাৎ। লেকিন-উঠানের একান্তে যদি

* সূর্যপত্নী উষা স্বামীর পূর্বে আবির্ভূতা হন।

মেহের এসে বসে—মাদুর সে নিজেই নিয়ে আসবে—তাহলে তাকে কি বাঙলা হরফ শিখিয়ে দিতে পারেন না? বুঝতেই তো পারছেন, পণ্ডিতমশাই, এ বিদ্যাটা মেহের আয়ত্ত করতে পারলে আমরা ভাই বহিন দুজনে মিলে নবাব সরকারের চাহিদা মেটাতে পারব। ঐ তালাক-হুয়ী বদনাসিব লেড়কি রোজগার করতে পারবে। খেয়ে-পরে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করতে পারবে!

রূপেন্দ্রনাথ এককথায় সম্মত হয়ে গেলেন। মেহের ভাষাটা জানে—বাঙলা তার মাতৃভাষা। অক্ষর-পরিচয় সমাপ্ত হলেই সে অনায়াসে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহজ পয়ার ছন্দ পাঠ করতে পারবে। আর উচ্চারিত হলেই—অক্ষর পরিচয় থাক বা না থাক—মৌলভী সা'ব তার অর্থ বুঝতে পারবেন। হয়তো মেহেরের কাছ থেকে তিনি নিজেও বাঙলা হরফ, আ-কার ই-কার এবং যুক্তাক্ষর, চিনে নিতে পারবেন। তখন অনায়াসে কৃত্তিবাসী রামায়ণের ফার্সি অনুবাদ করতে পারবেন। নবাব আলীবর্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধনের একটি সম্প্রীতির সোপান অতিক্রান্ত হবে। হিন্দু কৌতূহলী হলে, উৎসাহী হলে জানতে পারবে কুরান-সরীফে কী লেখা আছে। মুসলমানও কৌতূহলী হলে জানতে পারবে রামায়ণ কাব্যের উপজীব্য।

দুর্ভাগ্য এ দেশের। আলিবর্দীর ঐ শুভপ্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। 1756 সালে আলিবর্দী খাঁ মহব্বত জঙ-বাহাদুর বেহেস্তে চলে গেলেন। মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আসীন হল সিরাজউদ্দৌল্লা—সপ্তদশ বর্ষীয় ইন্দ্রিয়াসক্ত অপরিণতবুদ্ধির এক কিশোর। আলিবর্দী আর তাঁর একমাত্র পত্নী শরফ উন্নিসা বেগমের শুভ প্রচেষ্টার আসান ঘটল। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ভাষায় :

আলিবর্দীকে মুর্শিদাবাদের বা বাঙলার আকবর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদ-নবাবদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতি দেখাইয়া মহাবিপ্লবমধ্যেও শান্তভাবে প্রজাপালন করিতে তাঁহার ন্যায় আর কেহই সমর্থ হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধনের নবাবী উদ্যোগের সেই বেহেস্তী মুবারকীর অবসান ঘটল; সিরাজের আমলে ঘনিয়ে এল দোজখী-ইবলিসি!

না কুরান-সরীফের বাঙলা-অনুবাদ, না রামায়ণের ফার্সি অনুবাদ; কিছুই আত্মপ্রকাশ করেনি। অথচ মোহনলাল আর মীরমদন সেই মেলবন্ধকে সার্থক করে পলাশী-প্রান্তরকে লালে লাল করে রেখে গেছে। আলিবর্দীর প্রয়াণের পর বছর না ঘুরতেই!

pathagar.net

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

আদিযুগে সেই আদিমতম স্ত্রীজাতীয়ার বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের আয়োজন হয়েছিল চারটি পর্যায়ে। আজকের দিনের ভাষায় বলা যায় সওয়া ঘণ্টার চারটি পিরিয়ড। প্রথম পাঠ সূর্য যখন মধ্যগগনে। রোগী দেখে ফিরে এসে রূপেন্দ্রনাথ বসতেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠা ছাত্রী তিনটিকে নিয়ে গিরিবালা, পুটুরানী আর তারাসুন্দরী। এঁরা শেখেন বাঙলা ভাষা। অক্ষর পরিচয় করানো হয়। রূপেন্দ্রনাথ মুখে মুখে শোনান উপনিষদের কাহিনী—গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসার ইতিকথা; নচিকেতা-সত্যকাম—উদ্দালকের উপাখ্যান। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের সার কথা। সংস্কৃত সেখানে পড়ানো হত না।

দ্বিতীয় পাঠের আসরেও তিনজন ছাত্রী : মালতী, শোভারানী এবং পুনরায় তারাসুন্দরী। এখানে বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃতও শেখানো হয়। গার্হস্থ্যধর্মের নীতিকথা, শিশুপালন, আর্তের সেবাপদ্ধতি এবং ধর্মের মূলতত্ত্ব।

তৃতীয় পাঠের আসরে, দুটি ছাত্রী এবং একজন ছাত্র—বালক ও বালিকা। রূপমঞ্জরী, সুজাতা আর শুভপ্রসন্ন। প্রথম দুজন শিখত বাঙলা, শুভপ্রসন্ন বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃত। বয়সে সে ওদের অপেক্ষা বছর চারেকের বড়।

চতুর্থ পাঠের আসর পড়ন্ত বেলায়। প্রথম যুগে সেখানে উপস্থিত থাকত মাত্র একজন : মেহেরুন্নিসা। পর্দার ওপাশে, দৃষ্টিসীমার, বাহিরে, কিন্তু শ্রুতিসীমার ভিতরে এসে বসতেন মৌলভী সা'ব। তারপর যখন দেখা গেল রূপমঞ্জরী ব্যতিরেকে আর কেউ মেহেরের সহাধ্যায়ী হতে স্বীকৃত হল না তখন রূপেন্দ্রনাথ মৌলভী সাহেবকেও পাঠের আসরে ডেকে নিলেন।

তিনচার মাসের মধ্যেই মেহের আর তার দাদা বাঙলা হরফ এবং যুক্তাক্ষর চিনে নিল। তখন মেহের সুর করে রামায়ণ পাঠ করত। পাশে নিমীলিত নেত্রে বসে শ্রবণ করতেন মৌলভীসাব। রূপেন্দ্র অপ্রচলিত শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। অলঙ্কারের ব্যাখ্যা করে দিতেন। ক্রমে শুভপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরী এসে যোগ দিল সে আসরে। কিমাশ্চর্যতঃপরম্। তারপর সেই যবনীর রামায়ণপাঠের আসরে এসে বসতে শুরু করলেন মালতী এবং গিরিবালা! পর্দার ওপাশে। দৃষ্টিসীমার বাহিরে, শ্রুতিসীমার নয়।

পাঠান্তে মেহের আল্লাতালাকে নমস্কার করে পুঁথি বন্ধ করে রাখত। ভাই-বহিন

পদ্মদীঘিতে অজু করে সাম-ওয়াক্তের নামাজটা সেরে আসতেন। গিরিবালা দুটি ছোট-ছোট কলাপাতায় সাজিয়ে নিয়ে আসতেন দেবতার প্রসাদ। ফল-বাতাসা-খুর্মো পাটালি। এস. ওয়াজেদ আলীর ভাষায়—ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশন অচ্ছেদ্যবন্ধনে চলতেই থাকত!

ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক। অর্থাৎ ব্যতিক্রম থাকে বলেই সামাজিক নিয়মকে নিয়ম বলে মানি। রূপেন্দ্রনাথ প্রথমে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তাঁর বিদ্যালয়ে কোনও ছাত্র থাকবে না—সবই ছাত্রী। একাধিক হেতুতে। প্রথম কথা : তাঁর প্রতিবাদ সমাজপতিদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। সমাজপতিরা স্ত্রীলোকদের অন্ধ সেবাদাসী করে রাখতে চায়। অসূর্যম্পশ্যার দল যেন জ্ঞানসূর্যালোকের সন্ধান না পায়। কারণ পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় 'নারী' একটি ভোগ্যপণ্য। সে বিনা প্রতিবাদে পুরুষের সেবা করে যাবে। সন্তান উৎপাদন করবে। প্রতিপালন করবে—স্বামীর দেহান্তে সহমরণে যাবে। মুসলমান সমাজে সহমরণ প্রথা নাই—তালাকপ্রথা প্রচলিত। গৃহকর্তার মর্জি হলে পাঁচ সন্তানের জননী, যৌবনোত্তীর্ণা সেবাদাসীটিকে তিন তালাক দিয়ে 'গর্দানা-পাকাড়কে নিকাল' দেওয়া যাবে। পরিবর্তে একটি নতুন যৌবনবতী 'গুড়িয়া'কে সংসারে নিয়ে আসায় ধর্মীয় বা সামাজিক কোন বাধা নাই। বিলাতে শিক্ষিত রাজীব গান্ধীর কৃপায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে নস্যাৎ করে আজও সেই ধর্মীয় আইন বলবৎ। স্ত্রীলোক যদি ভাষাজ্ঞান লাভ করে তবে সবার আগে সে যে আয়ত্ত করবে : প্রতিবাদের ভাষাটাকেই তা সে বাঙলাতেই হোক অথবা উর্দুতে। রূপেন্দ্রনাথ ঐ প্রতিবাদটাই চান। এজন্য একটি 'নারী-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নিজের ভিটেয়। তিনি জানতেন, গ্রামবাসীরা তাদের গৃহের লুলনাদের সে বিদ্যালয়ে সহজে প্রেরণ করতে স্বীকৃত হবে না। কিছুটা কুসংস্কারের প্রভাবে, কিছুটা সমাজপতিদের আতঙ্কে কিছুটা বা স্বার্থান্ধ হয়ে। অপরপক্ষে পুত্র-পৌত্রাদিদের প্রেরণ করতে চাইবে রূপেন্দ্রনাথের চতুষ্পাঠীতে। ফলে বালিকাদিগের সঙ্গে কিছু বালককে ভর্তি করাতে স্বীকৃত হলে, জৈবিক নিয়মে, বিবর্তনের পরিচিত সূত্রে, একদশকের ভিতরেই কোণঠাসা ছাত্রীরা হয়ে যাবে বিলুপ্ত প্রাণী; ছাত্ররা জাঁকিয়ে বসবে। ওঁর বালিকা বিদ্যালয় মিশে যাবে গৌড়দেশের অগণিত চতুষ্পাঠীতে—শুধুমাত্র ছাত্রসমন্বিত বিদ্যায়তন।

দ্বিতীয় কথা : পুরুষছাত্র একই শ্রেণীতে বিদ্যাভ্যাস করলে অনেক প্রাচীনপন্থী পরিবারকর্তা সে-কারণেই হয়তো বাড়ির মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে স্বীকৃত হবেন না। রূপেন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে।

তাহলে ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যতিক্রমটি কেন?

ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। মহিলা-বিদ্যানিকেতনের ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে। রূপেন্দ্র যখন থাকবেন না তখনো যেন ঐ বিদ্যালয়টি চালু থাকে। আজকের অজাত ললনাকুল ভবিষ্যতেও যেন সোঞাই গাঁয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে পায়, সেখানে তারা বাণীবন্দনার অধিকার লাভ করবে।

মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালেই রূপেন্দ্রনাথ গ্রামের জমিদারকে প্রশ্ন করেছিলেন, তারাদা, শুভপ্রসন্নের তো আট বৎসর বয়স হয়ে গেছে, ওকে কোনও গুরুগৃহে প্রেরণ করছ না কেন? তোমাকে জ্যেঠামশাই অবশ্য কোনও চতুষ্পাঠীতে পাঠাননি; কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। তোমাকে যথারীতি শিক্ষা দিয়েছেন নিজেই।

তারাপ্রসন্ন স্বীকার করেছিলেন, না ভাই, রূপেন। কিছু সংস্কৃত স্তব-স্তোত্র আমার মুখস্ত আছে বটে—বাঙলায় কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র অথবা মঙ্গলকাব্য পড়তে পারি; কিন্তু ঐ দেবনাগরী-হরফে ক্রমাগত হোঁচট খাই। বড় বড় সমাসবদ্ধপদ দেখলে পুঁথি বন্ধ করে দিই। দোষ আমারই। বাবামশাই হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষকতার বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন মায়ের উপর। আমি শুধু জমিদারী সেরেস্তার কাজটুকু শিখেছি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি তোমার পুত্রের ক্ষেত্রে কী করতে চাও? আমার মতো সে গুরুগৃহে যাবে, না তোমার মতো শুধু জমিদারী সেরেস্তার কাজটুকুই শিখবে?

তারাপ্রসন্ন প্রতিপ্রশ্ন করেন, হঠাৎ এ-কথা কেন রূপেন?

—বিশেষ কারণ আছে বলেই জানতে চাইছি। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি শুভ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ঠিক মতো গুরু পেলে ও কালে মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

—হ্যাঁ। বাচস্পতিমশায়ও একদিন সেকথা আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, সোঞাই গাঁয়ের কাছে-পিঠে কোনও চতুষ্পাঠী নেই। আর আমার পুত্রসন্তান তো মাত্র একটিই। শুভর মা ওকে দূরে কোন গুরুগৃহে পাঠাতে রাজি নন।

তখন রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনার কথা খুলে বলেছিলেন। তিনি সোঞাই গাঁয়ে একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর সেই সাবেক যুক্তি : হিন্দুসমাজের পতনের দ্বিবিধ হেতু! প্রথম কথা : সমাজপতিরা সমাজের আধখানাকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা-অন্ধকুসংস্কারে ঢেকে রাখতে চাইছে। স্ত্রীলোকদের শিক্ষাদানে, তাদের মুক্তিতে, তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় কূপমণ্ডুক সমাজপতিদের দৃঢ় আপত্তি। দ্বিতীয় কথা : একটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে 'জল-অচল' বলে দূরে সরিয়ে রাখা। যুগাবতার শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয় ব্যাধিটা নিরাকরণের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—যখন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন—বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সমান অধিকারে নামগানের আসরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু স্ত্রীজাতীয়ার মুক্তির কথা আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেননি। রূপেন্দ্রনাথ সোঞাই গ্রামে সেই

নারী-স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করে যাবেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কোন পুত্রসন্তান নেই—হবার সম্ভাবনাও নেই। রূপমঞ্জরীকে তিনি গার্গী-মৈত্রেয়ীর মতো শিক্ষিতা করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কিন্তু রূপমঞ্জরী কালে সংসারী হবে, স্বামীর সহধর্মিনী হবে, স্বামীর গ্রামে জীবন অতিবাহিত করতে যাবে। এটাই প্রত্যাশিত, নিজের স্বার্থে, বিদ্যালয়ের স্বার্থে যদি তিনি রূপমঞ্জরীকে চিরকুমারী করে রাখেন তাহলে স্বর্গে বসে কুসুমমঞ্জরী মর্মাহতা হবে।

রূপেন্দ্রনাথ শুভপ্রসন্নকে ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের একমাত্র ব্যতিক্রম—যাবৎ বয়ঃসন্ধিকাল। তারপর শুভপ্রসন্নকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে দূরদেশের কোন গুরুগৃহে—ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে, অথবা কৃষ্ণনগরে শঙ্কর তর্কবাগীশের মহাবিদ্যালয়ে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আরণ্যক অধ্যাপক মহাপণ্ডিত বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত স্বীকৃত হন। মোটকথা, দু-তিন বছর গুরুগৃহে বাস করে উপাধিলাভ করে সে ফিরে আসবে সোঞাই গাঁয়ে। এবার সে শিখবে আয়ুর্বেদ। রূপেন্দ্রনাথ নিজে যখন থাকবেন না, জীবন দত্ত যখন থাকবে না, তখনো সোঞাই গাঁয়ের চিকিৎসালয় চালু থাকবে।

আর চালু থাকবে : ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যানিকেতন।

হ্যাঁ, সেই মহীয়সী অলোকসামান্যার নামেই হবে বিদ্যালয়। যিনি কূপমণ্ডুক সমাজের নির্দেশকে ছেঁড়া-কাগজের ঝুলিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে করেছিলেন সারস্বতসাধনা। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে?' প্রশ্নের জবাবে যিনি বলতে পেরেছিলেন : মনসা!

তারাপ্রসন্ন এককথায় রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে।

তোমার সব প্রস্তাব আমি মেনে নিচ্ছি, রূপেন। তুমি সোঞাই গাঁয়ে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কর। শুভপ্রসন্নকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম। চতুষ্পাঠীর যাবতীয় ব্যয়ভার আমার। কিন্তু একটিমাত্র শর্তে : ওটা 'বালিকা' বিদ্যালয় হবে না। হবে চতুষ্পাঠী।

রূপেন্দ্রনাথ অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন।

—হাসছ যে?

—মনে হচ্ছে, আমি যেন একটা বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে এসেছি তোমার দরবারে আর তুমি তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছ একটিমাত্র শর্তে। বিবাহে বর থাকবে, বরযাত্রী থাকবে, বরকর্তা থাকবে—আসর-বাসর-রন্ধনচৌকী-ছাঁদনতলা ফুলশয্যা সব; সব, থাকবে—শুধু একটি জিনিস রাখা চলবে না : কনে!

তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন, তুমি বুঝছ না, একবগ্গা! তুমি স্ত্রীলোকদের নিয়ে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে গ্রামপঞ্চায়েত তোমাকে ক্ষমা করবে না। নিশ্চিত একঘরে করবে।

—দেখা যাক গ্রাম-পঞ্চায়েতের হিম্মৎ!

—তুমি চিরটাকাল একবগ্গাই রয়ে গেলে, রূপেন!

pathagar.net

সেই যেদিন শোভারানী তার ফুলকাকাকে এক দামোদর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তার পরেই।

দীর্ঘদিন ধরে সোঞাই গাঁয়ের অন্যতম প্রধান সমাজপতি মনে মনে ফুঁসছিলেন ঐ একবগ্গা ছোঁড়াটার উপর। ছেলেটার সব সময় কেমন যেন 'গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল' ভাব। দুর্গাদার মতো মানী সমাজপতির মুখের উপর ছেলেটা বলে দিয়েছিল, আপনার বাড়িতে 'মহাপ্রসাদ' পেতে যেতে পারব না; তবে হ্যাঁ, 'বৃথামাংস' হলে কবজি ডুবিয়ে সাঁটতে পারতাম! কী আস্পর্ধা! এসব দুর্বিনীত কালাপাহাড়কে 'হেঁটোয়-কাঁটা-মুড়োয়-কাঁটা' করে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত। দুর্গাদা তখনই বলেছিল ছেলেটাকে একঘরে করতে। নন্দ স্বীকৃত হননি। উনি চান, চণ্ডীপণ্ডপে ষোলো আনার ডাক দিয়ে অপরাধীকে একবারই ধরে আনা হবে—যখন তার পালাবার আর কোনও পথ থাকবে না। এক কিস্তিতেই মাৎ।

ছোকরা বারে-বারে পাঁকাল মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে গেছে। নেহাত বরাত-জোরে। সে-বার গাঁ-সুদ্ধ মানুষ একমত হল কেষ্টার রাঁঢ়কে সহমরণের চিতায় তুলতে হবে—মায় জমিদারের সেই ভুল-করে লালপাড়-শাড়ি দেওয়ার ঘটনাকে কায়দা করে তারাপ্রসন্নকে পেড়ে ফেলেছিলেন—হঠাৎ কোথা থেকে ঘোড়ায় চেপে এসে হাজির হল ঐ কালাপাহাড়। এসেই নিদান হাঁকল : কেষ্টার বেধবা পোয়াতি। কোন মানে হয়? বহু বহু দিন পরে গাঁয়ে একটা জমকালো সহমরণের আয়োজন হয়েছিল। পাঁচ গাঁয়ের মানুষজন ভিড়ু করে দেখতে এসেছিল হিন্দুধর্মের মহিমা! দিল ছোকরা সব কিছু ভেস্তে।

এতদিনে ঐ দুর্বিনীত ছোকরাকে কব্জা করার একটা নিশ্চিত সুযোগ পাওয়া গেছে। এক নম্বর : একবগ্গা ত্রিবেণী থেকে নিয়ে এসেছে থাম্ খারা একটা ডাঁটো-খাটো বেধবাকে! জেনে-বুঝে যে, তার ভিটেতে জগুঠাকরুণ, কাতু বা তার বউ নেই। তাহলে তার মানেটা কি দাঁড়ালো? রূপো-ছোঁড়া তো আগে থেকে জানত না যে, নীতু মুখুজ্জের দিদি ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওর ভিটেয় এসে আশ্রয় নেবে! তাহলে? তুই হচ্ছিস কুলীন ঘরের বামুনের বেটা! মন চাইলে তো পাঁচ-সাতটা অগ্নিসাক্ষী-ময়না পুষতে পারিস—অবশ্য আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে হিম্মৎও থাকা চাই—তা নয়, এক ছামুতে বেধবা মেয়েছেলে পোষা।

কিন্তু এমন রগরগে অভিযোগটা ধোপে টিকলো না। দ্যাখ-না-দ্যাখ পীতু মুখুজ্জের দিদি ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে একবগ্গার ছামুতে এসে আশ্রয় নিল।

আসল ঘটনা তো তাই? নাকি বড় খোকা যা বলছে তাই সত্যি? পীতু মুখুজ্জে কায়দা করে বালবিধবা দিদিটিকে ঘাড় থেকে নামিয়েছে? একবগ্গাকে একটা নলচের আড়াল সরবরাহ করতে? কিন্তু পীতুর স্বার্থটা কি? ঐ একবগ্গা হারামজাদাই তো পীতুর ডবগা মেয়েটাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে দুর্গাদার নাকের সামনে সংযুক্তাহরণ করেছিল! তাহলে?

তারপর ধর গিয়ে একবগ্গার ঐ পৈশাচিক বেলেল্লাপনা! পাঁচবাড়ির সধবা-বেধবা, ছুঁড়ি-বুড়িকে নিয়ে দুপুরে-মাতন! কী? না মেয়েছেলের চতুষ্পাঠী! বাপের জন্মে শুনেছ তোমরা? কী হবে তোদের লেখাপড়া শিখে? বারোহাত কাপড়ও তোদের কাছে মোছলমানের লুঙ্গি—কাছা দিতে পারিস না—কী হবে দস্তখৎ করতে শিখে? 'সগ্যের অপ্সরী'দের মতো পিঠে কি এক জোড়া করে ডানা গজাবে? ফুরুৎ করে উড়ে দাঁড়ে গিয়ে বসবি? ঠিকই করেছে বড়খোকা বউ-এর পিঠে আস্ত চ্যালকাঠ ভেঙে।

বড়খোকার ধর্মপত্নী—অর্থাৎ নন্দ চাটুজ্জের মেজ পুত্রবধূ বিশুর-মা আবদার ধরেছিল তারা জেঠিমার মতো সেও রূপোদার পাঠশালায় নাম লেখাবে। লজ্জা-সরমের বালাই নেই। বিশু-এখনো তোর বুকের দুধ খায়, তুই পাঠশালায় ভর্তি হবি? বেশ করেছে বড়খোকা বউকে ঠেঙিয়ে।

ঠিকই বলেছেন শিরোমণি মশাই : গৃহস্থবধূরা 'বিদ্যেধরী' হলে বাস্তবে 'ব্যাপিকা' হয়ে উঠবে। রন্ধনাদি গৃহকর্মে তখন আর তাদের মন থাকবে না। পতিসেবা দূর-অস্ত, পুত্রকন্যাদের মলমূত্রাদি ধৌত করার কাজও স্বামীদেবতার স্কন্ধে চাপিয়ে দেবে। এ সর্বনাশ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দরকার! না হলে সোঞাই গ্রামে আজ যে ব্যভিচার শুরু হচ্ছে তাতেই ক্রমে গোটা হিন্দুসমাজে ধ্বস নামবে।

সমাজপতি নন্দ ঘরে-ঘরে গিয়ে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বড়খোকা-ছোটখোকা যুবকদলের মতামত গ্রহণ করেছে। বাচস্পতিমশাই অথবা ঘোষালখুড়োর মতো দু-একজনকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরলে গোটা গ্রাম এককাট্টা! এ সর্বনাশ শুরুতেই রুখতে হবে। একবগ্গা যদি তার জিদ্দিবাজি ছাড়তে রাজি না হয় তবে নবাব-সরকারে শিকায়েদ করা হবে।

বড়খোকা, কালু, গজেন প্রভৃতি নব্য যুবার দল অবশ্য ভিন্ন মন পোষণ করে। তাদের মতে একবগ্গা ঠাকুর মেনে নেয় ভাল, না হলে তার ঘরের চালায় আগুন দিয়ে বাপ-বেটিকে জীয়ন্তে পুড়িয়ে মারাই উচিত!

এই যখন অবস্থা, তখন শোনা গেল চরমতম বেলেল্লাপনার খবরটা—বারুদের স্তূপে যেন আগুনের ফুলকি : একবগ্গার পাঠশালায় ভর্তি হতে চলেছে এক মোছলমানের নিকা করা ডবকা ছুঁড়ি! রমজানের মাসটা শেষ হলেই!

এবার নন্দ নিজেই বললেন : ঠিকই বলেছিলি তোরা। ধম্মে সইবে না। দে, রূপো-বাঁড়ুজ্জের ঘরের চালায় আগুনই ধরিয়ে দে!

pathagar.net

অনেকেরই আশঙ্কা ছিল একবগ্গা আসবে না। তাকে ধরে বেঁধে আনতে হবে। দেখা গেল, তাঁদের আশঙ্কা অমূলক। নির্ধারিত সময়ে কাঁধের উপর উড়ুনিটা চাপিয়ে জীবন দত্তকে সঙ্গে করে রূপেন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন চণ্ডীপগুপে। 'ষোলো আনার ডাকে'। এটাই ছিল সেকালীন বিধান। তারাশঙ্করের 'চণ্ডীমণ্ডপ' উপন্যাসে তার বর্ণনা আছে। সেটা অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ! গ্রামে সরকার নিয়োজিত চৌকিদার আছে। প্রহরে প্রহরে সে হাঁকাড় পাড়ে —'হুঁ-শিয়ার'। সিঁদেল চোরদের হাত থেকে গৃহস্থকে সজাগ রাখতে। সেই চৌকিদারটিই পৃথক বেতন পায় পঞ্চায়েতের তরফে। পঞ্চায়েত-সমাজপতিদের হুকুম হলে সে পাড়ায়-পাড়ায় ঢেঁড়া বাজিয়ে জানান দেয়—কবে, কখন চণ্ডীমণ্ডপে সমাজপতিরা সমবেত হবেন, কে বাদী, কে প্রতিবাদী। সচরাচর সেটা হয় শুক্লপক্ষে সন্ধ্যার পর, তেঁতুল বটের বাঁধানো চাতালে। ছোট-খাটো অভিযোগ থাকলে বাদী-প্রতিবাদী বা সাক্ষী ছাড়া সমাজপতিরা দু-তিনজন আসেন। বাদীর অভিযোগ শোনেন। প্রতিবাদীর কৈফিয়ত শ্রবণ করেন। প্রয়োজনে সাক্ষীদের জবানবন্দীও নেওয়া হয়। তারপর সমাজপতিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অপরাধীর শাস্তির বিধান করেন।

চুরি-চামারি, জোর করে অপরের ক্ষেতে ধান-কাটা অথবা অনধিকার প্রবেশ। 'পরস্ত্রীকাতরতার' অভিযোগ এভাবেই সমাজপতিরা মিটিয়ে দেন। খুন, জখম, ডাকাতি হলে চৌকিদার কোতোয়ালকে খবর দেয়। নবাব-সরকারের তরফে তখন কাজী অপরাধীর বিচার করেন। কিন্তু গ্রামবাসীর ভিতর কেউ যদি বড় জাতের অপরাধ করে—যাতে কোতোয়ালকে সংবাদ প্রেরণ অপ্রয়োজনীয় অথচ সামাজিক অপরাধটা রীতিমতো গুরুতর, তখন হয় : 'ষোলো-আনার ডাক'।

সে-ক্ষেত্রে পন্তিয়াস পীলেত যেভাবে যীসাস-এর বিচার করেছিলেন সমাজপতিরা ঠিক সেভাবেই গ্রামের সাধারণ মানুষকে বলেন, তোমরা দু-পক্ষের কথাই শুনলে। এবার বল আসামী দোষী, না নির্দোষ!

জনগণ তখন 'জুরী'। তাদের রায় শুনে সমাজপতিরা নির্ধারণ করতেন আসামী দোষী না নির্দোষ। দোষী হলে কী শাস্তি দেওয়া হবে তাও নির্ধারণ করতেন ঐ সমাজপতিরাই।

pathagar.net

এই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রামীণ বিচার-ব্যবস্থা।

জনগণের আদালত।

চণ্ডীমণ্ডপে জনসমাগম বড় কম হয়নি। ধন্বন্তরি-বাবাকে ভালবাসে গাঁয়ের সাধারণ মানুষ। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি সকলকেই ওষুধপত্র বিতরণ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমাজপতিরা কী অভিযোগ এনেছেন তা অধিকাংশ লোকেই জানে না। সকলেই কৌতূহলী। শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। জ্যৈষ্ঠ মাস। আলোয় চারদিক ফুটফুট করছে। রূপেন্দ্রনাথ জীবন দত্তকে সঙ্গে করে সহাস্যবদনে এগিয়ে এসে বললেন, কী ব্যাপার নন্দ খুড়ো? আমার বিরুদ্ধে কে কী অভিযোগ এনেছে, বলুন? আমি কৈফিয়ত দিতে একপায়ে খাড়া হয়েছি!

কথার সঙ্গে সঙ্গে তেঁতুলবটের বাঁধানো চাতালে গাঁথা তেলসিঁদুরে রাঙা প্রস্তরখণ্ডে দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিয়ে কপালে ঠেকালেন।

নন্দ বললেন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই, বাবাজী। লোকজন এখনো আসছে। বাচস্পতিদা এখনো এসে উপস্থিত হননি। তুমি বস এখানে।

নির্দেশমতো চাতালের একান্তে উপবেশন করলেন রূপেন্দ্রনাথ। স্বভাববশে পদ্মাসনে।

একটু পরে বাচস্পতিমশাই এসে গেলেন। সমাজপতিদের মধ্যে তিনিই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পদধূলি নিয়ে জানতে চাইলেন, বাতের ব্যথাটা আর চাগায়নি তো, খুড়ো?

—না বাবা, ধন্বন্তরি! রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে।

শিরোমণি বলে ওঠেন, সবাই এসে গেছেন মনে লাগে। ঘোষালদা, চক্কোত্তি খুড়ো, বাচস্পতিমশাই,—হ্যাঁ সবাই এসেছেন। এবার বল, নন্দভায়া, রূপেন বাঁড়ুজ্জের বিরুদ্ধে সমাজের অভিযোগটা কী?

নন্দ নড়ে-চড়ে বসলেন। বললেন, অভিযোগ তো একটা নয় যে, এক কথায় মিটে যাবে। একে একে বলি। কিন্তু অভিযোগটা দাখিল করার আগে আমি কিছু তথ্য যাচাই করে নিতে চাই। জানা কথাই, তবে প্রথমে কবুল করিয়ে নিলে সুবিধা হবে। বাবা রূপেন, তুমি কি বছর-দু-তিন আগে বর্দ্ধমানের নগেন দত্তের বজরায় চেপে পুরীধামে তীর্থ করতে গেছিলে?

রূপেন্দ্র বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

—এবার বলতো ভায়া, সেই বজরায় কি এ গাঁয়ের সমাজপতি শ্রীদুর্গা গাঙ্গুলী আর তাঁর ধর্মপত্নী মীনু, মানে আমাদের গাঁয়ের পীতাম্বর মুখুজ্জের কন্যা মৃন্ময়ীও গেছিল?

রূপেন্দ্রনাথের ভ্রূ-যুগলে বিরক্তির কুঞ্চন দেখা গেল। গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি একটা তথ্য বিস্মৃত হয়েছেন, খুড়ো। এটা কোন খোশগল্পের আসর নয়। গ্রামপঞ্চায়েত আমাকে আসামী হিসাবে তলব করেছে এবং আমি হাজির হয়েছি। আপনি প্রথমেই আমাকে বলুন : বাদী কে? আমার বিরুদ্ধে কী তাঁর অভিযোগ? এই তথ্য দুটি পেশ করার পরেই সমাজপতি হিসাবে আপনার অধিকার বর্তাবে আমাকে সওয়াল করার। কী বাচস্পতিকাকা? আমি কি পঞ্চায়েত-নিয়মবিরুদ্ধ কিছু দাবি করছি?

pathagar.net

বাচস্পতি কিছু বলার আগেই নন্দখুড়ো বলে ওঠেন, বাদী হচ্ছে দুর্গা গাঙ্গুলী, যার বউ পুরীতে বেমক্কা চুরি গেছল!

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, সেক্ষেত্রে আমার প্রথম দাবি : চণ্ডীমণ্ডপে বাদীকে উপস্থিত করুন। তাঁর যা অভিযোগ তিনি ব্যক্ত করুন। তারপর আমার বিচারের প্রশ্ন উঠবে।

নন্দ বললেন, এ তো তোমার অন্যায় আবদার, রূপেন। সবাই জানে দুর্গাদা এখন গাঁয়ে নেই। তাকে আমি এখন কী করে হাজির করব?

বাচস্পতি বললেন, সে-ক্ষেত্রে এ অভিযোগের বিচারটাও মুলতুবি থাকবে, নন্দ, যতদিন না দুর্গা গাঁয়ে ফিরে আসে।

নন্দ রুখে ওঠেন, কিন্তু দুর্গাদা আমাকে নিজমুখে বলেছে...

বাচস্পতি তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন : না। তা হয় না। বাদী যেখানে অনুপস্থিত সেখানে বিচার হতে পারে না।

নন্দ বললেন, বেশ। তাহলে মীনুর কেচ্ছাটা মুলতুবি থাক। দুর্গাদা ফিরে এলে তার ফয়সালা হবে। আমি দু-নম্বর অভিযোগের কতা বলি। এবার আমি নিজেই বাদী। রূপেন তার নিজের ভিটেয় পক্ষকাল হল একটা আর্জব চতুষ্পাঠী খুলেছে। সেখানে নাকি ছাত্র থাকবে না, বেবাক্ ছাত্রী! ইতিমধ্যেই নানান বয়সের সাত-আটটি স্ত্রীলোককে ও পাকড়াও করেছে। তার মধ্যে সধবা-বেধবা-অরক্ষণীয়া-পুঁচকে সব রকম চিড়িয়াই আছে। দুর্জনে একথাও বলছে যে, সেখানে নাকি একটি মোছলমান মেয়েছেলেও বৃদিন পরে আসবে। বামুনের ভিটেয়! বামুন-কায়েত-জল-অচল যবনী সব এক পংক্তিতে! জাত-ধম্মো বলতে আর কিছু রইলে না! কী রূপেন? আমি কি মিছে কথা বলছি?

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। সত্য কথা। তবে চতুষ্পাঠী নয়। এখানে চতুর্বেদের চর্চা আদৌ হবে না। এটি হবে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি 'মহিলা বিদ্যানিকেতন'। মহিলাদের এখানে অক্ষর পরিচয় করানো হবে। ছাত্রীরা প্রয়োজনমতো শিখবে শুধু বাঙলা ভাষা অথবা বাঙলা ও সংস্কৃত। এছাড়া শেখানো হবে মহিলাদের গার্হস্থ্যধর্ম, রোগীর সেবা, শিশুপালন, স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি।... আর হ্যাঁ, ঐ কথাটাও সত্য। রমজানমাসের বাকি কটা দিন পার হলে একটি মুসলমান মহিলাও আমাদের বিদ্যাপীঠে বাঙলা ভাষা শিখতে আসবেন।

নন্দ বললেন, বাবা রূপেন! এমন আজব কতা আমরা বাপের জন্মে শুনিনি। তুমি বল তো, গৌড়দেশে, অথবা গোটা আর্যাবর্তে আর কোথাও এমন আজব বিদ্যাপীঠ কি একটিও আছে, যেখানে শিক্ষক ব্যতিরেকে আর কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই, শুধু সুন্দরী রমণী—মানে, বৃন্দাবনলীলার প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে প্রশ্ন করছি আমি।

জবাব দিতে কিছু বিলম্ব হল রূপেন্দ্রনাথের। তবু নন্দ চাটুজ্জের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে জবাবে বললেন, না, আমার জ্ঞানমতে মহিলা-বিদ্যাপীঠ আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানি না।

—সেক্ষেত্রে, ভূ-ভারতে যে জিনিস নেই—হিন্দুধর্মে যে বস্তুটি সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয়ার অক্ষর-পরিচয়—সে জাতীয় বৃন্দাবনলীলার কথা তোমার উর্বর মস্তিষ্কে কী-ভাবে গজিয়ে উঠল, বাবা একবগ্গা?

রূপেন্দ্র প্রণিধান করলেন যে, প্রতিবাদ না করলে নন্দর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাত্রা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হতে থাকবে। অথচ তিনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ, সমাজপতি! তাই এবার বাচস্পতি-মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, প্রশ্নকর্তার ভাষা ও বাচনভঙ্গিতে আমার দৃঢ় আপত্তি আছে, বাচস্পতিকাকা। পঞ্চায়েতের আহ্বানমাত্র আমি এসেছি। আমি কী করছি, কেন করছি কার স্বার্থে করছি, তা জানাতে আমি প্রস্তুত ; কিন্তু কোনও অর্বাচীন প্রশ্নকর্তার অশালীন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না! আমার এই অভিযোগ সম্বন্ধে আপনার বিচারের পর এ প্রশ্নের জবাব দেব।

নন্দ বুঝতে পারেন, একবগ্গা ঘুরিয়ে তাঁকে অর্বাচীন বলল। কিন্তু তিনি কিছু বলতে ওঠার পূর্বেই বাচস্পতি তাঁকে থামিয়ে দিতে বলে ওঠেন, তুমি থাম, নন্দ। ওকে বুঝিয়ে বলতে দাও : ও কী করতে চাইছে, কেন করতে চাইছে, কার-স্বার্থে করতে চাইছে। ও বলুক।

রূপেন্দ্রনাথ তখন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে। প্রাক-মুসলমান যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্ত্রীলোকদের বিদ্যাদানের যে ব্যবস্থা ছিল, বৌদ্ধধর্মে যে 'থেরিগাথা' রচিত হয়েছিল তা বুঝিয়ে বললেন। স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে বৈধব্যযোগ সে সম্পর্কহীন সে-কথা মৈত্রেয়ী থেকে ব্রজসুন্দরীর উদাহরণ দাখিল করে প্রমাণ করতে চাইলেন। সোঞাই, গ্রামবাসীকে তিনি নিজ-নিজ পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে তাঁর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত 'ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যানিকেতনে' প্রেরণ করতে অনুরোধ করলেন। না—গুরুদক্ষিণা কিছু দিতে হবে না। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

নন্দ এবং শিরোমণি ওঁর বক্তৃতার মাঝখানে দু-তিনবার বাধাদানের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাচস্পতি-মশায়ের হস্তক্ষেপে তা প্রতিহত হল। উপসংহারে রূপেন্দ্রনাথ বললেন। নন্দ খুড়ো জানতে চেয়েছিলেন ভূ-ভারতে বর্তমানে যা নেই তা কেন প্রবর্তন করতে চাইছি আমি। জবাবে আমি বলব—চিরটাকাল যা বলে এসেছে সেটাই যে বাঞ্ছনীয় তা সবসময় ঠিক নয়। এক সময়ে আদিম মানুষ অগ্নি-প্রজ্বলন-প্রক্রিয়া জানত না, কৃষিকার্য জানত না। যে যুগাবতার প্রথম সে-কাজ করেছিলেন তিনি সমাজের ক্ষতি করেননি—উন্নতিই করেছেন। অগ্নি প্রজ্বলিত করে, কৃষিকর্মের প্রবর্তন করে।

নন্দ ফাঁক বুঝে হঠাৎ বলে ওঠেন, তুমিও বুঝি তেমনি একজন যুগাবতার?

রূপেন্দ্রনাথ নন্দ খুড়োর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন : নন্দ-খুড়ো! আপনি ভূ-ভারতে সোঞাই গাঁয়ের একবগ্গা দীঘির মতো কোনও সংরক্ষিত পুষ্করিণী দেখেছেন? আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে আন্ত্রিক-রোগ প্রবলভাবে চালু আছে অথচ একবগ্গা দীঘি থেকে যারা পানীয় জল সংগ্রহ করেন সেসব পরিবার থেকে আন্ত্রিক

রোগ সম্পূর্ণ বিদূরিত? নন্দ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই বাচস্পতি বললেন, এ ব্যাপারে নন্দর মতামত নিষ্প্রয়োজন। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। রূপেন বাবাজী সোঞাই গাঁ থেকে আন্ত্রিক রোগ...

কথার মাঝখানে নন্দ বলে ওঠেন, আপনি এভাবে বারে-বারে আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারেন না। সমাজপতিরা এ বিচারসভায় সবাই পর্যায়ক্রমে কথা বলবেন। এটাই প্রথা।

বাচস্পতি সামলে নেন নিজেকে। বলেন, বেশ তো, বল না নন্দ, কী বলতে চাও?

নন্দ এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, আজ্ঞে না, বাচস্পতিদা বক্তৃতা দেবার অভ্যেস আমার নেই, তা আমরা কেউ দেবও না। তবে আমি গাঁয়ের ইতর ভদ্র সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। রূপেন বাঁড়ুজ্জের ঐ মেয়েছেলের চতুষ্পাঠী—যাতে হিন্দু-মোছলমান একসাথে অ-আ-ক-খ শিখবে—তা আমরা বরদাস্ত করব না। হতে দেব না। বিশ্বেস না হয় তো আপনি সবাইকে শুধিয়ে দেখুন। সবাই এ বিষয়ে একমত!

বাচস্পতি রূপেন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন, আশা করি এতে তোমার আপত্তি নেই, রূপেন? তোমার বক্তব্য তুমি বলেছ—গাঁয়ের পঞ্চজন তার অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন কি না জানি না; কিন্তু সংখ্যাগুরু মানুষের সিদ্ধান্ত তুমি নিশ্চয় মেনে নেবে। কী বল?

রূপেন্দ্র বললেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু তার পূর্বে আপনি নিশ্চয় আসামীকে তাঁর শেষ বক্তব্যটা পেশ করার অনুমতি দেবেন?

—তোমার আরও কিছু বলার আছে?

—তা আছে, বাচস্পতিকাকা।

—তবে বল?

রূপেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে বললেন, আমার এই 'ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যানিকেতন' প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে রায়দানের আগে আপনাদের একটি কথা আমি নিবেদন করতে চাই। আমার গুরুদেব ত্রিবেণীর মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-মশাই এবার আমাকে সকন্যা সোঞাই গাঁয়ে প্রত্যাবর্তনে বাধা দিয়েছিলেন। তাঁকে বর্ধমানরাজ প্রায় হাজার বিঘা নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেছেন। গুরুদেবের বাসনা সেখানে একটি আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। আমাকে তিনি অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন একশত তঙ্কা মাসিক বেতনে। তদ্ভিন্ন বিনামূল্যে আমাকে বাসস্থান এবং সংবৎসরের চাউল প্রদান করা হবে। আমি সেই লোভনীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে সোঞাই গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছি। দুটি হেতুতে। প্রথম কথা : আয়ুর্বেদবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাকে যখন আমার স্বর্গত পিতৃদেব গুরুগৃহে প্রেরণ করেন তখনি তিনি আদেশ করেছিলেন : 'ফিরে এসে এই সোঞাই গ্রামেই তুমি গ্রামবাসীর চিকিৎসা করবে। এ গ্রামে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই।' তাঁর আদেশ আমি শিরোধার্য করেছিলাম। অক্ষরে অক্ষরে এতদিন পালন করে এসেছি। দ্বিতীয় কথা : আপনারা রাজি হন বা না হন আমি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবই।

বাচস্পতি বলেন, সোঞাইবাসীর অধিকাংশ মানুষ যদি তাতে আপত্তি জানায়, তদসত্ত্বেও?

রূপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন, চণ্ডীমণ্ডপে বর্তমানে শতকরা শতভাগই পুরুষ। মহিলা —যাঁদের স্বার্থে আমি বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, তাঁরা এখানে অনুপস্থিত, কাকা।

নন্দ বলে ওঠেন, অন্তঃপুরচারিনীরা কোনদিনই চণ্ডীমণ্ডপে এসে তাদের মতামত জানায়নি। জানায় না। এটাই প্রথা।

—সেই প্রথাটাই আমি পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। তবে এটাও জানি আমি জোর করে আমার ভিটেয় ঐ বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আপনারা আমার ঘরের চালায় আগুন ধরিয়ে দেবেন।

—সেটাও জান? বাঃ তাহলে আর বেহুদ্দো কপচাচ্ছ কেন?

—আপনাকে বলছি না, নন্দ-খুড়ো। আমি সোঞাইবাসীকে উদ্দেশ করে বলছি : তোমরা যদি চাও, আপনারা যদি চান, তাহলে পিতৃআদেশের বন্ধন আর আমার থাকবে না। ঠিক যেভাবে একদিন পিতার মুখাগ্নি করেছিলাম, সেইভাবেই আমার বাস্তুভিটার চালায় স্বয়ং অগ্নিসংযোগ করে গ্রাম ত্যাগ করে আমি ত্রিবেণীতে ফিরে যাব। সেখানে আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করব এবং জেনে রাখুন, সেখানে একটি মহিলা বিদ্যানিকেতনও প্রতিষ্ঠা করব! আপনাদের তাতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হবে এইমাত্র। পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ত্রিবেণীতে লোক পাঠাতে হবে। সর্পদংশনের ক্ষেত্রে অবশ্য ওঝা ডাকতে হবে। ত্রিবেণী থেকে আমার পক্ষে সর্পদংশনের চিকিৎসা করতে আসা সম্ভবপর হবে না।

সভায় পক্ষিপালকপতনের নিস্তব্ধতা।

রূপেন্দ্রনাথ এবার বাচস্পতিমশায়ের দিকে ফিরে মৃদু হাসলেন। বললেন, গ্রামবাসীকে আমার যা বলার ছিল তা বলেছি, বাচস্পতিকাকা। আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে কিছু রুগী এখনো মরতে বাকি আছে। তাদের কাছে যেতে হবে এবার। তবে আমার শিষ্য জীবন দত্ত আপাতত এখানে থাকল। তার মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেবেন, 'ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যানিকেতনটা' আমি কোথায় প্রতিষ্ঠা করব—সোঞাই গ্রামে, না ত্রিবেণীতে।

জীবন এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এবার বলল, আপনি আবার গ্রাম ত্যাগ করে গেলে, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাব, গুরুদেব।

রূপেন্দ্র বললেন, তোমার সিদ্ধান্তটি নন্দ-খুড়োকে জানিয়ে দিও জীবন। সেক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি উঠে যাবে। নন্দ-খুড়ো আর পাঁচজন সমাজপতির সঙ্গে যুক্তি করে স্থির করবেন—ওখানে কোন দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে; ওলাবিবি, মনসা না শীতলা! চিকিৎসকের অভাবে ওঁরাই তো শুধু ভরসা!

রূপেন্দ্রনাথ চলবার উপক্রম করতেই ভিড়ের ওপাশ থেকে খনখনে মহিলাকণ্ঠে কে যেন বলে উঠলেন, এট্টু ডেঁরিয়ে যা, বাবা রূপেন!

রূপেন্দ্রনাথ থমকে গেলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন মৃন্ময়ীর বৃদ্ধা পিসিমা : গিরিবালা। দু-পা এগিয়ে এসে তিনি বাচস্পতিমশাইকে সম্বোধন করে বললেন, কতাটা আমি তোমারেই বলতে চাই, ঠাকুরপো!

—বলুন! বলুন! আপনি কখন এলেন?

গিরিবালা বললেন, রূপেন দেবতা। রাগ-অভিমানের বাইরে। তাই ও কারেও শাপ-শাপান্ত করতে পারবেনি, আমি জানি। কিন্তু সে যদি তোমাদের বিধেন শুনে নিজের হাতে নিজের ভিটেয় মুখাগ্নি করে গাঁ-ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে বন্দ্যঘটি বংশের সাতপুরুষের বেমহ্ শাপ অনিবায্য! সেই মহাভারতের জন্মেঞ্জয়-পরিক্ষিতের বেত্তান্ত! তা বেমহ্শাপের ফলটা কোন সমাজপতি মাথা পেতে নিচ্ছেন সেটা আগে থির হোক।

হঠাৎ নন্দ চাটুজ্জের দিকে ফিরে তিনি পুনরায় খনখনে গলায় বলে ওঠেন, কি গো নন্দ-ঠাকুরপো? তোমার গলাটাই এতক্ষণ বেশি শোনা যাচ্ছিল, মনে লাগে। তা তক্ষকসাপের বিষটুকু তুমিই সপরিবারে হজম করতে রাজি আছ তো? চণ্ডীমণ্ডপের ঐ তেলসিঁদূরমাখা পাতরখানা ছুঁয়ে আগে কবুল খাও দিনি। তারপর তোমার সমাজপতিগিরি কর!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

pathagar.net

পরিশিষ্ট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর *সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—৮৯* পুস্তিকার লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৫৮ বাঙ্গলা অব্দে। তখন তার মূল্য ছিল 60 ন.প.; পরে দ্বিতীয় সংস্কারটি প্রকাশিত হয় ১৩৭০ অব্দে ২.৫০ দামে। চতুষ্পাঠীর যুগে তিনজন বিদুষী মহিলার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন। বইটি দীর্ঘদিন আউট-অফ-প্রিন্ট। আমাকে শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় এককপি সংগ্রহ করে উপহার দিয়েছিলেন ১৩৯৫-তে। ঐ দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকা থেকে চতুষ্পাঠীর যুগে দুই বিদুষী মহিলার কাহিনী এখানে পুনর্মুদ্রণ করে দিলাম: হটী এবং হটু বিদ্যালঙ্কার। এঁদের দুজনের বাস্তব জীবনকাহিনীর উপাদানে আমার "রূপমঞ্জরী" গ্রন্থের প্রণয়ন প্রচেষ্টা:

।।ক।। হটী বিদ্যালঙ্কার

নব্যন্যায়ের শেষ পরিণতিকালে শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ যখন বঙ্গদেশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান, সেই সময়ে "অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, হটী বিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন।" বঙ্গদেশে—বিশেষ করিয়া রাঢ়দেশে হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

হটী ছিলেন রাঢ়দেশের কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁহার পিতা এক কুলীন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। অধিকাংশ কুলীনকন্যার ন্যায় বিবাহের পর হটীকেও পিত্রালয়ে দিন কাটাইতে হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; কন্যাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা করেন। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে বিধবা হয়, তখনকার দিনের এই ধারণা কুসংস্কারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই; হটীও কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরে বিধবা হন। অল্পদিন পরে তাঁহার পিতারও পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। পিতৃবিয়োগের পর হটী দুরবস্থায় পড়িলেন। সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি স্মৃতি ব্যাকরণ ছাড়া নব্যন্যায়েও পারঙ্গম হইয়া উঠেন। অবশেষে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া হটী অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী হইলেন; দেশ-বিদেশ হইতে আগত বহু ছাত্রকে তিনি নব্যন্যায় পড়াইতে সুরু করিলেন। এই সময়ে তিনি "বিদ্যালঙ্কার" এই উপাধিতে ভূষিতা হলেন। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল আর

একাল' পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন :—"হটী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যাবতী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা। ইহাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্যের ন্যায় বিদায় লইতেন।"

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়। শ্রীরামপুর-মিশনের উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৮০৬-৭ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁহার 'হিন্দু' গ্রন্থের ১ম খণ্ড রচনা করেন, তখন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু: অক্টোবর ১৮০৭) ও হটী বিদ্যালঙ্কার উভয়েই জীবিত; তিনি ইহাঁদের দু-জনেরই কথা স্বীয় গ্রন্থে* লিখিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। সেকালে একজন সহায়সম্বলহীনা বাঙালী বিধবা বারাণসীর মত বিদ্যাকেন্দ্রে গিয়া অধ্যাপনা দ্বারা বিপুল যশের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, এ কথা ভাবিয়া বাঙালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। হটী বিদ্যালঙ্কারের পিতৃদেবের নাম পাওয়া যায় না। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। রাজনারায়ণ লিখেছেন "বৃদ্ধবয়সে কাশীতে টোল করিয়া..." এ থেকে আন্দাজ করেছি তাঁর মৃত্যু প্রায় সাড়ে তিন-কুড়ি বছর বয়স হয়। তা সত্য হলে হটীর জন্মবৎসর আন্দাজ 1745 এর কাছাকাছি [প্রসঙ্গত আমার কাহিনীর কল্পিত নায়িকার জন্মবৎসর 1744]

'হটী' কখনো কোন বাঙালী মেয়ের নাম হিসাবে আর কোথাও পাইনি। শব্দটা *চলন্তিকা* বা *সংসদ অভিধানে* নেই। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রামাণ্য অভিধানে অবশ্য 'হট' শব্দের কিছু প্রাচীন যুগ প্রচলিত অর্থের হদিস দিয়েছেন। 'হট' সেখানে এইসব শব্দের সমার্থ হিসাবে ব্যবহৃত: দ্রোহবুদ্ধি, বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিবাদ এবং চলিত-বাঙলায় 'জিদ্দিবাজি।' উদাহরণ হিসাবে হরিচরণ উদ্ধৃত করেছেন এই শতাব্দীর ঊষাযুগে প্রণীত *দুর্গাপঞ্চরাত্রি* (কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত) "আজি হবে এ সঙ্কট, তেঁই হর বৈলা হট।" তাই আন্দাজ করছি 'হট' শব্দটিকে 'জিদ্দিবাজি'-র সমার্থ ধরে নিয়ে বালিকাবয়সে বিদ্যালঙ্কারের পিতৃদেব এই নামকরণ করেন! নিঃসন্দেহে, 'ডাক-নাম'। তাঁর ভাল নামটা হারিয়ে গেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পিতৃবিয়োগের পর হটী দুরবস্থায় পড়িলেন। সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করেন।" যুক্তিটা মেনে নিতে পারিনি। সংসারে বীতরাগ হয়ে কাশীযাত্রা করলে তিনি সেখানে বিদ্যালঙ্কার হয়ে চতুষ্পাঠী খুলে বসতেন না। কূপমণ্ডূক সোঞাই গ্রামপ্রধানদের দুর্ব্যবহারে ঐ চিতাভ্রষ্টা বিধবা দেশত্যাগ করেছিলেন বলে মনে হয়।

মনে রাখা দরকার 1810 সালে যখন হটীর মহাপ্রয়াণ হয় তখনও রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের (1828) প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারেননি এবং মাইকেল, ভূদেব, রাজনারায়ণের মন্ত্রগুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও মাতৃক্রোড়ে—এক বৎসরের শিশুমাত্র!

---

* *Account of the Writings, Religion, and Manners of the Hindoos*
Vol. I, Jan. 1811, pp. 195-96

।।খ।। হটু বিদ্যালঙ্কার

হটু বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ব্রাহ্মণকুলসম্ভূতা। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার ব্রাহ্মণেতর সমাজেও যে বিদুষী মহিলা একেবারে বিরল ছিলেন না, তাহার প্রমাণ—রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিদ্যালঙ্কার। রূপমঞ্জরীর পিতা যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে নিজের একমাত্র কন্যার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ছাত্রদের সহিত একত্রে গুরুগৃহে বাস করিয়া রূপমঞ্জরীর বিদ্যা অর্জন, চিরকুমারী থাকিয়া তাঁহার অক্লান্তভাবে জ্ঞানের সাধনা—এই সমস্ত কাহিনী রূপকথার মত বিস্ময়কর মনে হয়। শুধু সাহিত্য ব্যাকরণ শাস্ত্রাদি নয়, জটিল বৈদ্যকশাস্ত্র পর্যন্ত অধিগত করিয়া রূপমঞ্জরী যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বাংলার নারীসমাজে বাস্তবিকই তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই প্রতিভাশালিনী মহিলার চিত্তাকর্ষক জীবনকথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

রাঢ় প্রদেশে বর্ধমান জেলাতে কলাইঝুটি নামে একটি পল্লীগ্রামে, বাঙ্গলা দ্বাদশ শতাব্দীতে, নারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। সুধামুখী নামে এক রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলেরই অকালে কালপ্রাপ্তি ঘটে। অবশেষে বাঙলা ১১৮১ (অর্থাৎ 1775 খ্রিস্টাব্দে) কি ৮২ সনে তাঁহাদের এক কন্যাসন্তান জন্মে। পিতা মাতা মড়াঞ্চে সন্তান বলিয়া কন্যাকে হটু বলিয়া ডাকিতেন—কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম রাখিয়াছিলেন রূপমঞ্জরী। রূপমঞ্জরী কিরূপ রূপবতী ছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি যে গুণবতী ছিলেন, তাহা আমরা বেশ বলিতে পারি।

বালিকা বয়সে রূপমঞ্জরীর ওরফে হটুর মাতৃবিয়োগ হয়। তখন নারায়ণ দাসই তাহার মাতৃ-পিতৃ উভয় স্থানীয় হইলেন। নারায়ণ দাসের ঘরে সুধামুখী গৃহিণী নাই—বার্ধক্যের অবলম্বন পুত্র সন্তান নাই। নারায়ণ দাস যেমন রূপমঞ্জরীর মাতৃ-পিতৃ স্থানীয় হইয়াছিলেন, রূপমঞ্জরীও তেমনি তাঁহার পুত্র-কন্যা স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণব নারায়ণ দাসের বিষয়কর্ম কিছু ছিল না, তাঁহার অবসরকাল কাটে না। সংসারের একমাত্র বন্ধন কন্যাকে অবসর কাটানোর উপায় করিয়া লইলেন,—হটুকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। হটুর বেশ প্রখরা বুদ্ধি ছিল; তিনি যা কিছু শিখাইতেন, সে তাই টপ টপ করিয়া শিখিয়া ফেলিত। কন্যার এরূপ মেধা-শক্তি দেখিয়া পিতা অধিকতর আগ্রহের সহিত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন,—প্রতিবেশী পরিজনেরা হটুর বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাহাকে ব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিল। স্ত্রীলোকে বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবা হয়, যে দেশে এরূপ কুসংস্কার, সেই দেশের লোকে হটুর পিতাকে কেন এরূপ সদুপদেশ দিয়াছিল, বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, হটুর যখন ১৬।১৭ বৎসর বয়স, তখন নারায়ণ দাস তাহাকে নিকটবর্তী কোন গ্রামে এক বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখিয়া আইসেন। বৈয়াকরণিক জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন,—তাঁহার এক টোল ছিল। ষোড়শবর্ষীয়া রূপমঞ্জরী সেই টোলের ছাত্রদের সঙ্গে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এখানেও আর এক দেশাচারবিরুদ্ধ ঘটনা দেখা

যাইতেছে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী অবিবাহিতা রহিয়াছে,—পুরুষের সঙ্গে একই বিদ্যাগারে শিক্ষা লাভ করিতেছে। জানি না, বৈষ্ণবসন্তান বলিয়া এরূপ হইয়াছিল কি না। কিন্তু রূপমঞ্জরী কেবল এই গুরুগৃহে নহে,—আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া নির্মল, নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—তিনি মৃত্যু সময় পর্যন্ত কুমারী ছিলেন, অথচ নীচতম শত্রু পর্যন্তও তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দিন একটি কথাও বলিতে অবসর পায় নাই।

তিনি যখন গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন জন্য বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্বগ্রামে গমন করিলেন। পিতার সৎকারান্তে আবার গুরুগৃহে ফিরিয়া গেলেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার নামক এক অধ্যাপকের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সাহিত্য অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি পিতামাতার প্রেতঃকৃত্য সম্পন্ন জন্য গয়াধামে গমন করেন,—তথা হইতে কাশীধামে যাইয়া কিছু কাল বাস করেন। কাশী বাস কালে তিনি দণ্ডীদের নিকট নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতেন। এইরূপে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি জন্মভূমি রাঢ়দেশে প্রত্যাবৃত হইলেন,—দেশে আসিয়া "হটু বিদ্যালঙ্কার" নামে অভিহিত হইলেন।

কিন্তু কেবল বিদ্যালোচনাতে তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না;—নারীর কোমল হৃদয়ের স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণে জন-সেবা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে সরগ্রাম নিবাসী সাহিত্য-গুরু গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের নিকট আবার গমন করিলেন। তাঁহার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি এরূপ সুখ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, অনেকে আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, চরক, নিদান প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে আসিত;— অনেক খ্যাতনামা কবিরাজ চিকিৎসা সম্বন্ধে সময় সময় তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

দু-একটি বিষয়ে ইহাঁর একটু ক্ষেপামি ছিল। তিনি বেশভূষা অনেকটা পুরুষের মত করিতেন। রমণী-সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ কেশের উপর তাঁহার তত শ্রদ্ধা ছিল না,—মাথা মুড়াইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত শিখা রাখিতেন; পুরুষের মত করিয়া উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন।

বাঙ্গলা ১২৮২ (অর্থাৎ 1875 খ্রিস্টাব্দের) সনের ১৫ই পৌষ তারিখে প্রায় এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাধারমণ দাস নামে এক ব্যক্তিকে তিনি পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তিনি আজও জীবিত আছেন,—আমাদের এই "হটু বিদ্যালঙ্কারের" গৃহেই তিনি বাস করেন। সুতরাং কাল্পনিক গল্প বলিয়া চিরকুমারী রূপমঞ্জরীর কথা উড়াইয়া দেওয়ার যো নাই। বঙ্গদেশের—বাঙ্গালীর অধঃপতনের চূড়ান্ত সময়ে রূপমঞ্জরীর ন্যায় বিদুষী রমণীর ইতিবৃত্ত শুনিলে প্রাণে কতই না আনন্দ হয়!...এরূপ রমণী যে, সমাজে—যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সমাজের ও সেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।"

(গগনচন্দ্র হোম: "হটু বিদ্যালঙ্কার"—'সখা,' আগস্ট ১৮৯০)।